বিশ্বমানবের লক্ষ্মী-লাভ

বিশ্বমানবের লক্ষ্মী-লাভ

এ-কেলে কথকতা

সুরেন ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা
বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ, ২১০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ .. বৈশাখ, ১৩৪৭

মূল্য—১৷৷০

মুদ্রাকর—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

ধর ! ধর !

ওগো ঘরে-বাইরের নাতি-নাতনীরা !

অনেক মজার জিনিষ জুটিয়ে এনেছি, সব ধরো—

লক্ষ্মণ যেমন ফল ধরেছিল, ও রকম বোকার মতো নয়—

পড়বে, ভাববে, আমোদ ক'রবে ব'লে।

তোমাদের মা-বাপেরা একটু গম্ভীর হ'য়ে পড়েছেন,

তাই, চুপি চুপি বলি, সাবধানের মার নেই !

কানটা যদি আমার দিকে রাখো,

আমার কথা শোনার সুবিধে ত হবেই,

ও দিক থেকে মলানির ভয়টাও কম থাকবে !

তোমাদের

দাদা

প্রকাশকের নিবেদন

এই গ্রন্থ যখন প্রেসে ছিল গ্রন্থকার তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সেই জন্য তিনি গ্রন্থে যথোচিত সংশোধন, ইচ্ছা সত্ত্বেও করে' যেতে পারেন নি। গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে প্রকাশকের মত নিরপেক্ষ।

প্রকাশক

ভণিতা

ভূগোল নামে আমাদের ছেলেবেলায় যা প'ড়তে হ'ত, তার বেশীর ভাগই ফর্দের মতো ছিল—রাজ্যের ফর্দ, সহরের, সমুদ্রের, নদীর, পাহাড়ের, মরু-ভূমির ফর্দ। আর ছিল অঙ্কের ঘটা,—দেশের প্রসার, সহরের ভিড়, নদীর লম্বাই, পাহাড়ের খাড়াই,—রকম-বেরকমের অঙ্ক, সাংখ্য প্রদর্শনী বল্লেও হয়! এ সব তথ্য এমন ভাবে ধ'রে দেওয়া হ'ত, যেন চিরকাল ঐ ছিল, আজও আছে, বরাবরই থাকবে। এক কথায়, জগতের জঙ্গমত্ব লোপাট ক'রে দিয়ে পৃথিবীর চেহারা একটা স্থাবর পিণ্ডের মতো দেখানো হ'ত।

কিন্তু আমাদের আমলটুকুর মধ্যে কী হের-ফের না দেখা গেল! কত রাজ্যের রাজা কালের কবলে প'ড়লো, রক্ত-স্রোতের তোড়ে কত সীমানার অদল-বদল হ'ল। কোথাও বা কাটা-খালের জলে মরু উদ্ধার পেলো, কোথাও নদী শুখিয়ে লোকালয় উজাড় হ'তে চল্লো। সমুদ্রে সমুদ্রে যোগ করা হ'ল, মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ বাড়তে থাকলো; যান বাহনের গতি বেড়ে গেল ত কাছাকাছি ঘেঁষার মতি রইলো না। দেখে শুনে সেয়ানা হবার পর সে-কেলে ভূগোলের পাতা ওল্টালে কোন্ অতীতের পুঁথির মতো লাগে।

কাজেই আজকালকার শিক্ষা-ব্যাপার হয়েছে রকমারি। কোন্ দেশে কত সহর আছে জানিয়ে দিলেই কথা ফুরোয় না; সে সে জায়গায়

লোকে জটল্লা ক'রলো কেন, নগর-পল্লীর মরণ-বাঁচনের ধারা কেমন, তাতে দৈবের হাত কতখানি, মানুষ নিজেই বা কি ক'রতে পারে,—নানান আলোচনা এসে পড়ে। তেমনি এখানে ওখানে পাহাড়গুলো পাশা-পাশি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দেখিয়ে দিলেই কৌতূহল মেটে না; কিসের ঠেলায় ওরা সার বেঁধে আকাশ ফুঁড়ে উঠলো, ওদের গায়ে কিরকম অক্ষরে পৃথিবীর ইতিহাস টোঁকা আছে, সে লিখন্ কেমন ক'রে পড়ে,—শিক্ষার আসনে যিনি বসেন তাঁকে এমন কত কি খবর যোগাতে হয়।

মানুষের শিক্ষা বলো, চেষ্টা বলো, তার প্রথম উদ্দেশ্য লক্ষ্মী-লাভ। "প্রথম" বলছি কেন, না সচ্ছলতার ব'নেদের উপর দাঁড়াতে না পারলে, আরো উপরের দিকে হাত বাড়ানোরই যো থাকে না। কিন্তু উদ্দেশ্য যাই হোক, তাঁকে পাবার লালসে লোকে যে-রকম ঠেলা-ঠেলি কাড়া-কাড়ি বাধায়, তাতে লক্ষ্মীকে দেশ-ছাড়া কেন, পৃথিবী-ছাড়া করার যোগাড় ক'রেছে। দোষ শুধু এ যুগের নয়, মন দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, কোনো দেশে কোনো কালে লক্ষ্মীকে সুস্থির হ'য়ে তিষ্ঠতে দেওয়া হয় নি। সাধে চাঞ্চল্য-রোগ তাঁর ধাতে ব'সে গেছে!

ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের সত্যযুগে তাঁদের সাধনায় পাওয়া অধ্যাত্ম-তত্ত্ব আজও জগতের সম্পদ ব'লে মানা হয়। কিন্তু লক্ষ্মীকে আটক রাখার কথা তাঁরা ভাবেন নি, তাই তাঁদের প্রচার-করা বাণী চিদাকাশেই উড়ে বেড়াচ্ছে, কর্ম-দেহ নিয়ে ধরাধামের লক্ষ্মী-শ্রী বিধান ক'রে উঠতে পারলো না।

ত্রেতার ক্ষত্রিয়-রাজারা একমাত্র ভারতে প্রকট হন নি, পৃথিবীময় বিকটভাবে তাঁরা দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। "পুরুষ-সিংহ" উপাধি পাবার যোগ্যপাত্র হ'লেও, সাম্রাজ্যনেশায় তাঁদের উদ্যোগ বরাবর এমনি উদ্ভ্রান্ত

যে, হতভাগা প্রজাদের শ্রী-সমৃদ্ধি বারে বারে নষ্ট বৈ পুষ্ট হ'তেই পেলো না।

এক রকমের বাহাদুরী দেখিয়েছেন দ্বাপরের বৈশ্য কর্তারা, য়ুরোপে যাঁরা বিরাজ করেন। ওঁদের লোভ ত রাবণের চুলোর মতো জ্বলতেই আছে। সে-লোভের খোরাক যোগাবার কাজে ওঁরা ব্রাহ্মণের বিজ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব, দুটোকেই জুড়ি জুতে লাগিয়ে রাখতে পেরেছেন। মাঝে মাঝে যুদ্ধের যে-আগুন জ্বলে ওঠে তার ঝল্সানি খেয়েও ওঁদের হুঁস হ'ল না, আসছে বারের অগ্নিকাণ্ডে পিল্‌পিল্ ক'রে ঝাঁপ দেওয়াটা বাকি। ইতিমধ্যে গো-বেচারীর আড্ডা যেখানে যত ছিল, তা লুটপাট ক'রে একএকটি কুবের হ'য়ে উঠলেও, লক্ষ্মী-লাভের হিসেবে ওঁদের নাম খরচের খাতায় লিখতে হয়।

রইল শূদ্র, যাঁদিকে ভাষায় বলে শ্রমিক। ঘোর কলি ঘনিয়ে আসায় এবার লক্ষ্মী-আবাহনের পালা পড়েছে তাঁদের। গত ক'বার অবতার হয়েছেন এক-একটি ক'রে জীব, নৃসিংহের বেলা নাহয় জোড়া জীব। গতিক যেরকম, এবার বুঝি মানব-সঙ্ঘের বৃহৎ কলেবরে ভগবান অবতীর্ণ হ'তে ইচ্ছে ক'রছেন। এবার শ্রমিকের রাজত্বের পালা। ধনীর দিন ফুরিয়ে আসার আভাস চারদিকেই পাওয়া যাচ্ছে। রুষ-দেশে শ্রমিক-প্রধান তন্ত্র দেখতে দেখতে গ'ড়ে উঠছে। হয়ত সেখানে স্বয়ং কল্‌কি এসে পড়েছেন বা,—সেই USSR-এর * মূর্ত্তি ধরে, যাঁদের সঙ্ঘ-বদ্ধ উদ্যমে পুরোনো মানব-সমাজের যত আধ-মরা সংস্কার-বিকার, আচার-বিচার, সমস্ত ঝেঁটিয়ে ফেলে আগামী সত্য-যুগের জমি পরিষ্কার ক'রে রাখা হচ্ছে।

সে যাই হোক, এইটুকু ঠিক যে, লক্ষ্মীকে অচলা ক'রে রাখতে না

* রুষ-মহাদেশের সমবেত সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র-সঙ্ঘ।

পারলেও, USSR তাঁর প্রসাদ-বিতরণের এলোমেলো-পণা কাটিয়ে ওঠার হিকমৎ বার করেছেন। ধাত যাবে কোথায়, এঁদেরও এলাকার মধ্যে লক্ষ্মী অস্থির হ'য়ে ঘুরে বেড়ান, কখনো দিতে ভোলেন, কখনো বা বেশি ঢালেন ; কিন্তু এঁদের 5-year-plan * যখন যেখানে যতখানি পায়, কুড়িয়ে গুছিয়ে নিয়ে তা থেকে সবাইকার দরকার বুঝে পরিবেশন করে। তা ছাড়া, ভক্তের আওড়ানো মন্ত্র অনেক সময় দেবী কানেই তোলেন না, কিন্তু এঁদের নাছোড়বান্দা বৈজ্ঞানিক তন্ত্রের পেড়াপিড়ি তিনি অত সহজে এড়াতে পারেন না।

সেকালের কথকঠাকুরেরা যে সব পুরাণ-কাহিনী বলতেন, তার চেয়ে লক্ষ্মী-ছাড়া নারায়ণের চির-বিরহ ঘোচাবার জন্যে USSR-এর যে নতুন ধরণের যজ্ঞ চলছে, তার গল্প কম মনোহারী বা হিতকারী হবে না, এই আশায় নারায়ণ (বলতে বিশ্বমানবের যিনি অন্তর্যামী নিয়ন্তা) নরোত্তম (বলতে যাঁরা গুরু-স্থানীয়) আর দেবী সরস্বতী (বলতে যে প্রজ্ঞার কৃপায় গুরু-বাণীর মর্ম হৃদয়ঙ্গম হয়, মনে মনে তাঁদিকে নমস্কার ক'রে আমি ভণতে বসে গেছি। পুণ্যবান না হ'লেও কারো শুনতে মানা নেই। ইতি

সুরেন ঠাকুর

---

* পঞ্চ-বার্ষিক অর্থ উৎপাদন, সংগ্রহ ও বিলি ব্যবস্থা।

নির্ঘণ্ট

বিশ্ব-মানবের লক্ষ্মী-লাভ

প্রথম পালা

দরিদ্র-নারায়ণের মোহ-ভঙ্গ

বেদের গল্প

যুরোপে-এসিয়ায় পৃথিবীর ষষ্ঠাংশ-জোড়া প্রকাণ্ড রুষ-মহাদেশে যুগান্তর হওয়ার আগে, তার প্রায় সাত ভাগের এক ভাগ ছিল মরু, তাও বাড়তেই চলেছিল। মরু বলতে জন-শূন্য জল-হীন বালি ধূ ধূ করার ছবি মনে আসে। আসলে, কিন্তু, দৃশ্যটা তত ফাঁকা নয়। USSRএর কথা যখন হচ্ছে, তখন রুষের মধ্যে সব চেয়ে লম্বা-চওড়া "কারা-কুম" (কালো বালি) মরুর কথাটাই ধরা যাক।

উপরে ত বালি, কিন্তু কিছু দূর খুঁড়লে তলার ভিজে মাটি বেরিয়ে পড়ে। ও দেশের বর্ষা হয় বসন্ত-কালে, সে সময় বালির উপর এখানে-ওখানে কাঁটা-ঘাস, ডাঁটা-সার সরু-পাতার গাছ, এ রকম কিছু কিছু উদ্ভিদ গজায়। চেপ্টা-গড়নের ঝাঁকড়া পাতার বাহার দিতে গেলে গাছের ঘড়া ঘড়া জল খাওয়া লাগে, এমন জায়গায় তা ত জোটে না। ঢেউ-খেলানো বালির খোঁদলে বর্ষার জল জমে, তাতে দেখা দেয় পাঁকের মাছ; আর উপরে কিল বিল-করে বেলে সাপ। মাছগুলো কাদার মধ্যে থেকে মুখ বাড়িয়ে সোজাসুজি হাওয়ার নিশ্বেস টানতে শিখেছে, আর সাপগুলো বালিতে সাঁত্‌রে বেড়ানো অভ্যেস করেছে। মরু-জীবিকে মরু-

ভূমির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। যেমন উট, কাঁটা খেয়ে জল না-খেয়ে চালিয়ে দেয়; বেলে রঙের সিংহকে তার খাদ্য-সম্বন্ধীদের ঠাওর হয় না, নইলে তারা পালিয়ে বাঁচতো, সিংহ অনাহারে ম'রতো।

মানুষের মধ্যে, ঘুরঘুরে তুর্কী-বেদের দল বসন্ত-বর্ষার মর্সুমে এই কারাকুমে তাদের ঘোড়া ভেড়া চরাতে এসে স্ত্রী-ছেলে-পিলে নিয়ে ছাপ্পর বেঁধে থাকে; এক অঞ্চলের ঘাস-গাছড়া ফুরিয়ে গেলে হ'ঠে বসে; শেষে গর্মি পড়ায় সবুজের পালা সাঙ্গ হ'লে, লটবহর গুটিয়ে দক্ষিণের পাহাড় পানে ধাওয়া করে।

সম্রাটের আমলে এই কারাকুমের ভিতর দিয়ে প্রথমে জল যাবার নহর, তার পর এক রেল-লাইন চালিয়ে দেওয়া হয়। ব্যাপারখানা কি? হঠাৎ বুঝি রাজার বা উজিরের মরু-বাসীর পিপাসার কথা মনে পড়ায়, প্রজা-বাৎসল্য উথ্‌লে উঠলো?—তা নয়। মরুর ও-পারে মধ্য-এসিয়ার বড় বড় নদীর ধারে যে-সব জাঁকালো সহর, ফলন্ত-ক্ষেত-বাগান আছে, সেখানকার ভাল ভাল জিনিষ আমদানীর সহজ উপায় চাই, তারি এই আয়োজন।

জল না হ'লে ইঞ্জিন চলে না; রেল-গাড়ি না দৌড়লে লম্বা পথ ফুরোয় না,—আগেকার দিনে বোগ্‌দাদের খলিফাকে রূষের সেরা খরমুজ সর্বরাহ করতে হ'লে এক একটি ফল বরফ-ভরা সীসে-মোড়া আলাদা বাক্স-বন্দী ক'রে উটের পিঠে মরু পার করতে তিন তিন মাস লেগে যেত।

আর একটু কথাও আছে। রেল-পথে যখন-তখন ইচ্ছে-মতো গাড়ি-গাড়ি পল্টন পাঠাতে পারলে দেশটাকে বেশ সহজে শাসনে রাখা যায়।

যা হোক রেল-গাড়ি চল্লো, মরুদেশ সম্রাটের তাঁবে এলো,—তা' হ'লে

বেদেরা অন্তত তাঁর প্রজা হওয়ার গৌরবটা ত পেলো?—মোটেই তা নয়। এমন হতভাগা প্রজার উপর রাজাগিরি ফলাবার সখ মহামহিম রুষ-সম্রাটের ছিলই না—উল্টে তাদের জ্বালায় রাজ-আমলারা অস্থির। জলের নহর পেয়ে দু'ধারে তারা ভিটে তুলে বসবাস ফাঁদে আর কি! সম্রাটের মোসাহেবের দল তাক ক'রে ব'সে ছিল, রেল-ধারে খাল-ধারে জমিদারী পত্তন করবে, প্রজা দিয়ে ফসল ফলাবে, কারখানা চালাবে, তাদিকে দুটি দুটি খেতে দেবে, মোটা টাকা পৌছবে জমিদারের খাজানায়। কিন্তু বেদেরা কায়েম হ'য়ে জুড়ে বসলে সব মাটি। তখন তাদিকে উচ্ছেদ করার ঝামেলা পোয়াবে কে?

হুকুম জারি হ'ল—"নিকালো!"

আমলায় ধরে আনতে বল্লে পেয়াদায় বেঁধে আনে,—রাজ-কায়দার এ ধারা তো জাহির আছেই। সদর সেনাপতি সে-দিকের সেনা-নায়ককে পত্র দিলেন—"য়োমুদে (তুর্কী বেদে)রা খাল ধারে যেখানে যেখানে আড্ডা করেছে, পল্টন চড়াও ক'রে তাদিকে সরিয়ে দেবেন।"

কশাক-পল্টনের সরদারকে ডাকিয়ে সেনা-নায়ক বল্‌লেন—"সওয়ার নিয়ে রাজার হুকুম তামিল ক'রে এস, দেখো যেন একটাও বাকি না থাকে।"

এক সার কশাক-সওয়ারের ভীষণ চেহারা দূর থেকে দেখেই ত বেদেদের আক্কেল গুড়ুম। যে পারলে সে ঘর-বাড়ি পরিবার জিনিষ-পত্র ফেলে, ঘোড়ায় চেপে মার টেনে দৌড়! কিন্তু তাতে কি রেহাই পায় —অক্ষরে অক্ষরে হুকুম মানতে না পারলে সেপাইয়ের ইজ্জৎ থাকে কৈ? তার উপর ষণ্ডা গুণ্ডা হ'লে যা হয়, হঠাৎ খুন-চাপা রোগে ধরে। কাজেই তেজী ঘোড়া ছুটিয়ে একদল সওয়ার পলাতক বেদেদের টাট্টুগুলোকে তেড়ে ধরলো, আর পাশাপাশি দৌড়তে দৌড়তেই চমৎকার হাত-সাফাই

দেখিয়ে তলোয়ারের এক এক কোপে এক এক বেদের মাথা ওড়ালো। ওদিকে, ছাপ্পরের আশ-পাশে যে সব ছেলে-বুড়ো-স্ত্রীলোক পড়ে ছিল, আর এক দল গিয়ে তাদিকে সাবাড় করলো।

কথাটা বিশ্বাস করা একটু শক্ত—না ?

কিন্তু বিখ্যাত রুষীয় লেখক M. Ilin* সম্রাটের মোহর-বসানো হুকুম-নামার নম্বর তারিখ ধরে দিয়েছেন—নং ১১৬৭, ৬ই জুন, ১৮৭৩। তা ছাড়া, ভেবে দেখতে গেলে, নিরীহের উপর চোটপাট ক'রে বাহাদুরী নিতে কোন্ পেশাদার বীর কবে কোথায় নারাজ হয়েছে ?

চাষার গল্প

ফসল-ক্ষেতে ফলবাগানে রেলগাড়ি ক'রে জল যোগাতে হলে জমির বিঘে-পিছু আস্ত এক ট্রেণ জলের টাঁকি দরকার হ'তো,—ভাগ্যিস্ তা করতে হয় না। তবে রেলেরই মতো বাঁধা পথে জল আসা-যাওয়ার চক্কর খায়। আসার লাইন আকাশের ভিতর দিয়ে—সাগর থেকে ডাঙা ; ফেরং লাইন মাটির উপর দিয়ে,—ডাঙ্গা থেকে সাগর। ফিরতি পথে, নদী বেয়ে যাবার সময়, জলে বিস্তর মাল বোঝাই থাকে,—এঁটেলমাটি, রকম বেরকমের নুন, কিছু কিছু ধাতু, প্রাণীর দেহ-পুষ্টির কাজে লাগে এমন অনেক জিনিষ ; শেষে এগুলোকে সমুদ্রে ঢেলে দিয়ে, মেঘ হ'য়ে, জল আকাশ-পথে হাল্কা চলে আসে। ঐ মাল যদি সব-কে-সব সমুদ্রে ফেলা যেতো,

* প্রথম দুই পালায় বলা অনেক বৃত্তান্ত এই লেখকের Men & Mountains বই থেকে নেওয়া।

তাহলে ডাঙ্গার জমি ক্রমশ অসার হ'য়ে, প্রাণী বাঁচিয়ে রাখার অযোগ্য হ'য়ে পড়তো। কিন্তু গাছের কল্যাণে ধরিত্রীর সে দশা ঘটতে পায় না।

গাছ করে কি, জল সমুদ্রে যাবার সময় তাকে নিজের মধ্যে একক্ষেপ ঘুরিয়ে এনে দেশের মাটির তেজ বজায় রাখে। এই যে ব্রাঞ্চ লাইন, মাটি —গাছ, গাছ—মাটি, এর ভিতর দিয়ে জল চলার সময় গাছ নানা রকম ক্রিয়া করতে থাকে।

এক তো, মালে-বোঝাই জল থেকে নিজের শিকড় গুঁড়ি ডালপালা ফুল বীজ তৈরী করতে যা যা লাগে তা টেনে নেয়; পরে নিজের মূল-ডাঁটা-পাতা-ফল অন্য প্রাণীর সেবায় লাগায়; শেষে, বড়-গাছ পাতা ঝরিয়ে, ছোট গাছ আস্ত মরা-দেহ দিয়ে, মাটির জিনিষ মাটিকে ফিরিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে, পাতার প্রশ্বাসের ভাপ হাওয়াটাকে ভিজিয়ে ঠাণ্ডা রাখে, নইলে রোদে-তাতা মরু-বালির উপরকার বাতাস ঝাঁজিয়ে গিয়ে যেমন হয়, তাই হ'ত,—আকাশে মেঘ জমতেই দিতো না, এলেও বর্ষাতো না, যদি বা অল্পসল্প জল ঝরতো তা মাঝ পথেই শুখনো হাওয়ায় খেয়ে নিতো, জমিতে পৌছ্‌ত না।

গাছের আর এক ক্রিয়া এই—বৃষ্টির মুষলধার অবাধে মাটির উপর পড়লে তাতে গর্ত হয়ে যায়, পড়া-জল তোড়ে গড়াতে থাকলে উপরকার সারালো মাটি কেটে নিয়ে চলে, কাটা খোয়াইয়ের ভিতর দিয়ে সব জলটা হুড়মুড় ক'রে নদীতে নেমে পড়ে, কারো কোনো কাজে লাগার জন্যে দুদণ্ড কোথাও তিষ্ঠয় না। গাছ থাকলে আকাশের জলকে এ রকম ছ্যাব্লামি করতে দেয় না—বৃষ্টির চোট্‌ নিজের মাথায় নিয়ে, জলটাকে কতক পাতার ডগা দিয়ে, কতক গুঁড়ির গা বেয়ে, আস্তে আস্তে নামিয়ে ফেলে, তাকে ঝরা পাতার লেপ চাপা দিয়ে, রোদে শুখিয়ে যেতে দেয় না, তাড়াতাড়ি গড়াতে দেয় না, তলে তলে গম্ভীর চালে নদীতে পৌছে দেয়।

তাই বড় গাছের বন থাকলে দেশে অনাবৃষ্টি হতে পায় না, ভাল জমি ক্ষয়ে মরুভূমি হ'য়ে দাঁড়ায় না।

রুষে ভারি ভারি জঙ্গল ছিল, যাতে প্রজারা কাঠ-কাঠরার কুঁড়ে বেঁধে থাকতো; কুড়োনো কুটোকাটার জ্বালে রান্না করতো, শীত কাটাতো, বনের ফাঁকে ফাঁকে জানোয়ার চরাতো, কিছু ফসলও লাগাতো। সেই জঙ্গলের উপর লোভ লাগলো উপর-ওয়ালাদের।

রব উঠলো—"বেটাদের যেমন বুদ্ধি ভোঁতা, তেমনি নজর ছোট, খালি নিজেদের খুচরো এটা ওটা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, দেশ-হিতৈষণা কাকে বলে তা জানেও না; দেশের এত বড় লাভের সম্পত্তি জংলী প্রজারা কি না বে-কায়দা আটকে রাখতে চায়।"

ফলে প্রজাদের স্বত্ব ছুটে গেল, জঙ্গল সব বেঁটে দেওয়া হল জমিদারদের মধ্যে। সে বেচারীদের ত সদাই খাঁকৃতি, বাড়িটা· গাড়িটা আসবাবটা-আসটা পুরোপুরি না রাখলে মানই থাকে না, আরামটুকু ত পরের কথা। তাই, যেমন-তেমন ক'রে জঙ্গল কাটলে আখেরে লোকসান, সে কথা জানা থাকলেও, মস্ত মস্ত পুরোনো গাছের দাম, আবাদী জমির উপস্বত্ব, এ সব নগদ আদায় হাত পা গুটিয়ে ব'সে খোয়ানো কি তাদের প্রাণে সয়? পরের ভাবনা পরে যারা আসবে তারা ভাববে।

জঙ্গল কাটতে কাটতে গাদা-করা কাঠের দাম প'ড়ে গেল, আবাদ বাড়াতে বাড়াতে জলের দরে রাশ রাশ ফসল বাজারে ছাড়তে হ'ল, তখন প্রভুরা ক্ষান্ত হ'লেন। কিন্তু তার মধ্যেই দেশের দফা হ'ল নিকেশ, পড়ে গেল অনাবৃষ্টির পালা। প্রথমটা চার পাঁচ বছর অন্তর, শেষে তিন বছর দু'বছর অন্তর, দুর্বৎসর ঘনিয়ে আসতে লাগলো।

ফসল অজন্মা ব'লে রাজা ত প্রজাকে ছাড়ে না—"চুক্তি অমান্য করা, তা কি হয়!"

ও দিকে স্বাধীনভাবে চাষের অধিকার পেতে যে-সেলামী লাগে তাই কুলোয় না, প্রজায় খাজনা দেবে কোত্থেকে, খাবেই বা কি? শেষে স্ত্রী ছেলেপিলে আত্মীয়-বাড়ি রেখে, তারা দলে দলে মজুরী খাটতে বেরলো।

অনেকে গেল সহরে। সেখানে দশ-জন-থাকা ঘরে বিশ-ত্রিশ-জন ঠাসা-ঠাসি ক'রে থেকে রোগ বাধালো, রোগ ছড়াতে লাগলো, কর্তারা আতঙ্কে সারা! যারা টিঁকে রইলো তারা শেষে পুলিশের গুঁতোর চোটে ফের বাড়ি-মুখো হ'ল।

আর অনেকে গেল, পথে ভিক্ষে করতে করতে, প্রদেশের পর প্রদেশ ছাড়িয়ে, সেই সাইবীরিয়ায়। বাড়িতে থাকলে ত ঠায় মরণ, যে দেশে খাটবার লোকের অভাব, সেখানে যদি খোরাক জোটে। কারো কারো কাজ জুটলো বটে, যাদের কপালে তা না হ'ল তারা ফিরতি বেলা রাস্তার ধারে হাড় ক'খানি রাখলো; দু'দুবার রক্ত-মাংসের শরীরে ঐ অফুরন্ত পথ কি খালি-পেটে পার হওয়া যায়?

গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে আক্ষেপ প্রকাশ হ'ল—"প্রজাদের এ কি দেশ-ছাড়া পাগ্‌লামীতে পেয়েছে? জমিদারদের যে সর্বনাশ, ঠিকে লোক দিয়ে চাষ করাতে হ'লে খরচ বেড়ে যাবে কত!" ভেবেচিন্তে সাব্যস্ত হ'ল—"গ্রামে গ্রামে অক্ষমদের জন্যে দাও কিছু দানা পাঠিয়ে।"

উকীলে আমলায় তা থেকে নিজের নিজের তোলা নেবার পর, রাজ্যের আবর্জনা দিয়ে ওজনে পূরিয়ে যা পৌঁছে দিলে সেটা এত রকমের মিশল যে, দানা ছাড়া কোনো নামের মধ্যে তাকে আনা যায় না; আর পরিমাণে এত কম যে তাতে জন-পিছু দিনে এক ছটাকও হয় না।

সক্ষমদের পক্ষে হুকুম হ'ল আলাদা—"ভিক্ষে বৃত্তির প্রশ্রয় দিলে চরিত্র নষ্ট হবে। তৈরী করো কতকগুল রেলের রাস্তা, তাদের সকলকে কাজে লাগিয়ে দাও।"

কিন্তু কুলীর সর্দার অভিযোগ জানালো—"হুজুর, এ সব নিখাকী মজুর নিয়ে করবো কি ? পায়ে বল নেই, টল্‌তে টল্‌তে আসে ; হাতে জোর নেই, কোদাল ওঠেই না।"

উত্তর এল—"বটে, কাজে ফাঁকি দেবার ফন্দি! বদমাশগুলোকে চাব্‌কে লাল ক'রে ধ'রে বেঁধে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।" আর আইন জারি হ'ল—"ভিটে ছেড়ে প্রজার যাওয়াই নিষেধ।"

প্রজার সে ভিটেকে ভদ্রাসন বল্লে ঠাট্টা করা হয়। জঙ্গলের কাঠ কাটা দূরে থাক্, প্রজার কাঠকুড়োনো পর্যন্ত বারণ,—কুড়ুলের আওয়াজ কোথাও শোনা যাচ্ছে কি না, সেদিকে কান পেতে জমিদারের সওয়ার সারাদিন ঘুরছে। অগত্যা, ডাঁটা-লতা-পাতা জড়িয়ে কোনো রকমে দেওয়াল-খাড়া-করা খড়ের ছাউনি-দেওয়া তাদের ঘর। তবু মানুষ-থাকার ঘরগুলো ওরি মধ্যে একটু মজবুত, জানোয়ারদের ঘরের পল্কা দেওয়ালে বাইরের জল-বাতাস একেবারেই রোখে না, আর গোরুর খাবারের অনাটন হ'লে চালের খড় প্রায়ই নেমে আসে। এ অবস্থায় দারুণ শীতের সময় যত গোরু-শুয়োর সব মানুষ-থাকা ঘরে না ঢোকালে তারা বাঁচে না। এতে স্বস্তি-স্বাস্থ্যের যা হাল হয় তা কি বর্ণনার অপেক্ষা রাখে ?

আর প্রজাদের খাবার ? দুর্বৎসরে যে দানাটুকু জোটে তা ভেঙে রুটি হওয়ার কাছ দিয়েও যায় না, কাজেই ছাই-পাঁশ মেশানো সে দানার সঙ্গে জংলী ঘাস-পাতা থেঁৎলে পেট-ভরানো চেহারার রুটির মতো একটা কিছু দাঁড় করাতে হয়,—যা শুঁখ্‌লে কুকুর বেড়াল মুখ ফেরায়, মুরগীকে খাওয়ালে মারাই পড়ে,—প্রজারা পেটের জ্বালায় বমি চেপে তাই গেলে। তার উপর কাঁচা জ্বালানীর চিড়-বিড়ে ধোঁয়ার তাড়সে ওদের চোখের মাথা খাওয়া যায়, বয়স না যেতেই প্রায় অন্ধ।

গাঁয়ে থাকলে না খেয়ে মরা, গ্রাম ছাড়লে মার খেয়ে মরা, এই এমনেও গেছি অমনেও গেছি অবস্থায় ওরা মরিয়া হ'য়ে চুরি-ডাকাতি, জমিদার-বাড়ি-জ্বালানো আরম্ভ করলে। তখন সদর থেকে পল্টন এসে গুলি চালিয়ে সব ঠাণ্ডা করে দিলে।

সহরে কি অবস্থাপন্ন দয়ালু লোক কেও ছিল না?—ছিল বৈ কি। দুর্ভিক্ষে কি সকলের লোকসান? ভেজাল-দেওয়া জিনিষ চড়া-দামে বেচে কারো বড় বাড়ি হয়, কারো নগদ টাকা জমে। তখন দয়া করারও ফুরসৎ আসে। থিয়েটার-রে, কনসার্ট-রে, কতরকমের আমোদ-প্রমোদের আয়োজন ক'রে গ্রামবাসীদের জন্যে টাকা তোলা হ'ল; উচ্ছিষ্ট দিয়ে সুরুয়া তৈরি ক'রে সহরের পাড়ায় পাড়ায় কাঙ্গালী বিদায়ের ধূম লেগে গেল। কিন্তু তাও বলতে হয়, হাজার বদান্য হলেও লোকে কি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধৈর্য রাখতে পেরে ওঠে? খেতে পাই না, খেতে পাই না, ঐ এক-ঘেয়ে চীৎকার শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা, মনে ঘাটা প'ড়ে যায়।

তবুও সেই খাই খাই, রোজই খাই খাই, অবুঝ প্রজাগুলো সামান্য খাওয়াটা বাঁচাটার জন্যে কি ক্ষ্যাপানটাই ক্ষেপেছিল!

দুর্গতি-নাশন যজ্ঞারম্ভ

মনে হতে পারে বোবা সাক্ষীর জবানবন্দী হয়ই না। কিন্তু রুষের প্রজাকে পেয়াদায় নীরবে যা সওয়ালো, তার বিবরণ নারায়ণের নথীর মধ্যে ঠিক উঠে গেল। তবে কি না, তিনি শেষ নাগের নরম পিঠের উপর

দিব্যি হেলান দিয়ে বোধ করি একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলেন, তাই সে সব কথা‚ বিচার আমলে আসতে কত দিন যে লেগে গেল তার ঠিকানা নেই। কি নরের, কিবা নারায়ণের, আদালৎ দেখি সব এক ছাঁচে ঢালা, তাদের গড়িমসি চালের আর শেষ পাওয়া যায় না।

পরে অবশ্য বোঝা গেল, কোনো অবসরে রায়টা চুপি চুপি দিয়ে রাখা হয়েছিল।

লাখ কথা লাগে নি, এক কথার সে রায়—"বিপ্লব!"

তাও কিন্তু অনেক-কাল নথীর মধ্যেই চাপা প'ড়ে রইলো। অবশেষে ডিক্রি জারি হ'ল ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে।

জারির দিনটা কি বিশ্বমানবের একটা পরবের মধ্যে দাঁড়াবে?

দেখা যাক। জানা যাবে USSR-এর যজ্ঞ আর একটু এগোলে।

ডিক্রির মোট কথা এই—এ রাজা, সে উজীরের দোষ নয়, কুব্যবস্থার দোষেই মানুষ দুরবস্থায় পড়ে। যে জিনিস সকলের তাকে "আমার" "আমার" ব'লে টানা-টানি, বিনা-শ্রমে পরের শ্রমের ফল-ভোগের চেষ্টা, এতেই পাপ; পাপ করা, পাপের প্রতীকার না করা, দুয়েরই পরিণাম মৃত্যু। বুদ্ধি-বৃত্তি অনুসারে মানুষের দেবার ক্ষমতা কম-বেশী; কিন্তু শরীর মনকে সুস্থ রাখবার জন্যে খাওয়া-পরার দরকার সকলের পক্ষে সমান। অতএব যার যতদূর ক্ষমতা সকলে উৎপাদন করুক, উৎপন্ন ফল সবাইকে যথাযথ ভাগ করে দেওয়া হোক। এই নিয়ম পালন করলে-পর সমবেত চেষ্টার ফলন কারো পক্ষে অকুলন হবে না। শ্রমিক প্রজা, শ্রমিক রাজা, শ্রমিক ছাড়া আর পক্ষই নেই, এ রকমটা হ'লে রাজা-প্রজার, ধনী-দরিদ্রের, বিবাদ ভঞ্জন হবে, সু-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটার যা মূল কারণ সেই লোভের লোপ হবে। দৈবের উপর নির্ভর করা ছেড়ে দিয়ে নর-নারী দেবতাকে নিজের বশে আনতে পারলে

তারা নরোত্তম পদ লাভ করবে, তখন অভাব বা অসাধ্য কিছু থাকবে না।

এ রায়ের জোরে আশা হয়, লম্বা লম্বা তিন যুগের ভোগ ভুগে, মানুষের ধর্ম-বুদ্ধির জড়তা এবার হয় ত কাটবে। আর কিছু না হোক, গল্‌তিটা কিসে কিসে হয়েছিল, সেটুকু কলির শেষে USSR-এর কাছে ধরা পড়েছে ব'লে মনে হয়।

প্রকাশ হয়েছে যে, নারায়ণীকে দ্বৈত-রূপে দেখাটাই যত নষ্টের গোড়া। সরস্বতীর ত ভুবন-ভোলানো রূপ, চকিতেমাত্র তাঁর যে দেখা পায়, সে থ হয়ে যায়, লক্ষ্মীর দিকে আর চায় না। আবার লক্ষ্মীকে অবহেলা করলে সরস্বতী অন্তর্ধান হন, অন্তত বাম হ'য়ে থাকেন। এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে মানুষ এত দিন হাবুডুবু খাচ্ছিল।

USSR বুঝতে পারলেন, নারায়ণীকে একেশ্বরী জেনে সম্বর্দ্ধনা না করলে তিনি নারায়ণকে ধরা দেবেন না। আমরা ও আল্মা*-মায়ের দৌলতে সরস্বতীকে একটু আধটু চিনে নিয়েছি। শুধু "ফুল নে মা" ব'লে আদর কাড়তে গেলে তিনি গলেন না; গাধা-খাটুনি খেটে হদ্দ হ'লেও তিনি টলেন না; রসে কষে ঠিক-মতো মিলিয়ে নিবেদন না করলে তিনি দক্ষিণ-মুখ ফেরান না, যাকে বলে "প্রসাদ" তা মেলে না। তাই USSR সরস্বতীর দুই বরপুত্র কবি-মনীষীর আশ্রয় নিয়ে তাঁর খাতির রাখলেন, আর উভয়কে কর্মী বানিয়ে লাগিয়ে দিলেন লক্ষ্মীর আরাধনায়। বুদ্ধিটা খেলিয়েছেন ভাল, স্বীকার করতে হয়।

পুরাকালে আরাধনা বলতে ঠিক-কে-ঠিক মন্ত্র উচ্চারণ করা, মান্ধাতার আমলের যত কিছু তুক-তাক কোনোটি বাদ না পড়া, এই বোঝাতো; মাঝে বোঝাতে লাগলো ভক্তি-বিলাসের ঘটা—স্তব গান,

* Alma-mater—ইলম্ দাতা মাতা।

বাতি ফুল-চন্দনের বাহার ; হালে বোঝায় ভাল মনে সমানে খেটে চলা, পদে পদে দুর্গতির নিদান-জিজ্ঞাসা, দফে দফে জানা বা খুঁজে-পাওয়া ওষুধ প্রয়োগ, এই উপায়ে সাধারণের সেবায় প্রত্যেকের সাগ্রহ সাধনা,—যার মধ্যে কোনো দেবতার নাম বা চিন্তা না করলেও, বিনা-নিমন্ত্রণে সব দেবতারা এসে রমণ করেন।

এই ভাবে USSR মহা-সমীকরণ যজ্ঞ ফেঁদেছেন। তাই দেখে পৃথিবীর যত রাজা-রাজড়ার মেজাজ যে-রকম খিঁচ্‌ড়েছে, এর নাম "রাজসূয় যজ্ঞ" দিলেও চলে। আকাশ বাতাস মাটি জল রোদ বৃষ্টিকে, নানা প্রাণীকে, তার উপর নিজের মনকেও, মানুষের-মতো-মানুষের জীবন-ধারণের উপযোগী ক'রে আনা, এই হ'ল এ যজ্ঞের এক এক অঙ্গ। অঙ্গগুলি ক্রমশ ভালয় ভালয় উৎরে গিয়ে যজ্ঞ পূর্ণ হ'লে তখন পৃথিবী মাতার বিশ্ব-মানব-ধারিণী নাম সাজবে।

যজ্ঞ ব্যাপার চলছে কেমন, তা বিচার করতে হ'লে কোন্ কোন্ কথা বুঝতে হবে, মনে রাখতে হবে, সে সব কথা পালায় পালায় ক্রমশ বলা যাবে।

দ্বিতীয় পালা

পঞ্চভূতের বশীকরণ

মাটির কথা

সূর্যের প্রতাপে পরাস্ত ম্রিয়মান মরু-বেচারা ধূলোয় গড়াগড়ি যায়,—এ বর্ণনাটা ভুল। মরুটা রাক্ষস, লক্‌লকে জিভ বাড়িয়ে ভাল জমি চেটে খেয়ে নিজের সামিল করতে চায়। বাতাসের সাহায্যে বালির আক্রমণের নমুনা এ দেশেও দেখা যায়। সমুদ্রতীরের বাড়িতে পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে এসে বাইরের বালি হাতার মধ্যে ঢিবি হয়ে ওঠে। বালির উপর দিয়ে রাস্তা পাকা ক'রে বাঁধলেও তার চিহ্ন বজায় রাখা দায়। কণারকের মস্ত বড় সূর্য-মন্দিরটাই বালি চাপা পড়েছিল। কাঠিয়াওয়াড় থেকে বালি উড়ে এসে রাজপুতানাকে মরুময় ক'রে তুলেছে। বালি-চলা রুখতে না পারলে, বাতাস যেদিকে বয়, সে-দিকে মরু এগোয়।

শুধু ভূমি নিয়ে মরু নয়, মরুর মধ্যে উপরের হাওয়াটাকেও ধরতে হয়—হাওয়াই বা বলছি কাকে, সে-যে অদৃশ্য আগুন! মরু-বালি যদি চলে বিশ পঞ্চাশ মাইল ত মরু-বাতাসের দৌড় হাজার মাইল। যখন ভরা গর্মিতে, সূর্যের-মারা অগ্নিবাণ ঠিক্‌রে, বালিটা ঝাঁ ঝাঁ করে, তখন উপরকার হাওয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিপাক খেয়ে যুদ্ধযাত্রায় বেরোয়—একা চললে "লূ," বালি-কণা উড়িয়ে নিলে "আঁধি।" মধ্য-এসিয়ার লূ লেগে রূষের অপর পারের উক্রেন প্রদেশে ক্ষেতের শস্য শুখোয়। দক্ষিণ থেকে আঁধি

এলে রুষ চাষারা বলাবলি করে "ইরানীরা কাপড় ঝাড়ছে।" এই আঁধি রুষের ফলবাগান ছুঁয়ে গেলে গাছের পাতা কুঁকড়ে ডগা লট্‌কে যায়।

প্রকৃতি নিজেই বালিকে দমাবার চেষ্টা ক'রে থাকে। হাওয়ায় উড়ে, জলে ভেসে, পায়ের কাদায়, পাখীর ময়লায়, নানা উপায়ে ঘাসের গাছের বীচি তুনিয়াময় চলা-ফেরা করে। কিন্তু বালির মধ্যে শিকড় গেড়ে গজিয়ে ওঠার বিঘ্ন অনেক। অকালে অস্থানে পড়লে বীচি শুখিয়ে যেতে পারে; যথাস্থানে পড়লেও বাতাসে সরিয়ে ফেলতে পারে, বালিচাপা দিতে পারে।

কারাকুমের "কান্দিম" নামের এক রকম লতানে ঘাস কি ক'রে নিজের কাজ উদ্ধার করে, তার কথাটাই বলি। এ ধরণের ঘাস বা আগাছা আমাদের বেলে-জায়গায়ও দেখা যায়।

কান্দিমের বীচি ছোট্টো ফাঁপা গোলার মতো, তার গা-ময় কাঁটা। সে শুখনো বালির উপর প'ড়লে হাওয়ার সঙ্গে গড়িয়ে বেড়ায়, যতক্ষণ না রস জোটে। বাতাস যদি বালি ঝেঁটিয়ে এনে তাকে চাপা দেবার যোগাড় করে, হালকা বল্‌টা ফুরফুর ক'রে বালির আগে আগে উড়ে চলে। রসা জায়গায় পৌছলে কাঁটাগুলো গেঁথে যায়, বীচি আর ন'ড়ে বেড়াতে পায় না। সে অবস্থায় যদি চাপা পড়ে তখন কান্দিমে-বালিতে লাগে রেশা-রেশি—বালির ঢিবি বাড়ে ত ঘাসও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। কান্দিমের গাঁঠে-গাঁঠে শিকড়, উপরের চাপ সত্ত্বেও সে তাই দিয়ে তলার বালিকে আষ্টে-পিষ্ঠে বেঁধে ফেলে। পরে কোনো সময় জোর বাতাস উঠে উপরের ঢিলে বালি সরিয়ে ফেললে, শিকড়ে বাঁধা ডুমো ঢিবিটা ঘাসের গোচ্ছা মাথায় প'রে জ'মকে বসে থাকে।

এ ধাঁচার ঘাস আরো আছে যারা বালিকে হার মানাবার অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসে। তবে কি না, এরা হারিয়ে নিজেরা হারে;

বাড় বাড়ে, কিন্তু বংশ রাখতে পারে না। তার কারণ, একবার পুরোনো পাতা ঝরাতে আরম্ভ করলে সেগুলো প'চে বালির উপর একটা সারালো আস্তরণ বিছিয়ে দেয়, যাতে ক'রে বর্ষার জল তাড়াতাড়ি শুখোনো বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার উপর অন্য গাছের বীজ লাগার সুযোগ পায়, শিকড় নামায়, গাছিয়ে ওঠে, শেষে ঝাঁকড়া পাতার আওতায় মারে সেই আগেকার ঘাসের দলকে। ক্রমশ বড় গাছের জঙ্গল ফলাও হ'লে আবহাওয়া বদলে গিয়ে মরু উদ্ধার পেয়ে যায়।

মরু-দমনের ইতিহাসটা যদিও দু' কথায় ব'লে ফেলা গেল, কিন্তু আসলে ঘটনাগুলো পর পর ঘটতে সময় লেগে যায় যুগপরিমাণ। মানুষের কিন্তু অত তর সয় না, নিজের আয়ুর মধ্যে কাজ সারতে না পারলে ফলটা ভোগে আসবে কার?

তারো উপায় আছে। রুষের মরু-রেল-লাইনের কোনো কোনো স্টেশনে দেখা যায়, কুলীরা যাত্রীদের কাছে কত রকম বিদেশী ফল তরকারী বিক্রী করতে আনে। তবে কি সেখানে কোনো কৃষিতত্ত্ববিদের আস্তানা?—না, সেখানে যাদুকরও থাকে না। রেলের সঙ্গে সঙ্গে কি না জলও চ'লে এসেছে, তাই স্টেশনের কর্মচারীরাই ইচ্ছেমতো ফল ফলাতে পারে। মরুর চেহারা তড়িঘড়ি ফেরাতে, মানুষের উপযোগী করে তুলতে, জলই সহায়।

মহাভারতের যুদ্ধ আঠারো দিনে কাবার হয়েছিল। ইংলণ্ডের ইতিহাসে একশ' বছরের যুদ্ধেরও খবর আছে। মানুষে-মরুতে হাজার হাজার বৎসর ধরে যুদ্ধ চলেছে। সেদিন মধ্য-এসিয়ার বালির নীচে কতকগুলি ভাঙা-চোরা জল-চলার বাঁধানো নহর বেরিয়েছে, যা একজন মার্কিন পণ্ডিত অনুমান করেন, দশ হাজার বছর আগেকার তৈরী। তখন ত যন্ত্র-পাতি বড় একটা ছিল না, দূরের পাথর মজুরের হাতে পিঠে

মাথায় করে এনে বসাতে হয়েছিল, তাতে কর্তাদের চাবুকের সাহায্যও তারা কিছু পেয়ে থাকবে। এমন আরো কত পুরা-কীর্তির অবশিষ্ট জায়গায় জায়গায় পাওয়া যায়। এত কষ্টে গড়া জিনিস মানুষে নষ্ট হতে দেয় কেন?

তাতে প্রকৃতির হাত কিছু থাকতে পারে, কিন্তু মানুষের নিজের দুর্বুদ্ধি নির্বুদ্ধিতা আসলে দায়ী।

রাজাদের দিগ্বিজয় কাহিনী বেশ চটকদার ক'রে লেখা হয়, কিন্তু তলিয়ে দেখলে তাদের কার্য-কলাপ মোটেই মনোরম নয়। তারা বেরতো কোনো সুদূর ধনের লোভে লোভে, মাঝপথে বাধা পেলে হন্যে হ'য়ে উঠতো। যোদ্ধার সাজ-সজ্জা ছাড়িয়ে ফেল্লে ভিতরে বেরিয়ে পড়ে নিছক গুণ্ডা, বিপক্ষকে যেমন-তেমন ক'রে কাবু করা বৈ সে কিছুই বোঝে না। সে জানে জলের নহর ভেঙে দিলে মরুবাসী রাজা একেবারে কাবু। তখন তার এলাকার ভিতর দিয়ে লুটপাট ক'রে চ'লে গেলেও তাকে নিরুপায় হয়ে সইতে হবে; পরে প্রজা বাঁচুক মরুক বিজয়ী বীর তার থোড়াই তোয়াক্কা রাখে। পুরোনো কীর্তি-নাশের এই এক কারণ।

আর এক কারণ হচ্ছে কর্ম-কর্তার নিজের আহাম্মকী। জমির রকম না বুঝে জল হুড়মুড় ক'রে এনে ফেল্লেই ত কাজ হয় না, আশ-পাশের চেয়ে জমি যদি নীচু হয় তবে ত ম'জে হেজে গিয়ে বসবাসের বার হ'য়ে যায়। তখন তৈরী নহরের মায়া কাটিয়ে স'রে পড়া ছাড়া গতি থাকে না, শেষে মরা নহরের উপর খাঁড়ার ঘা দেবার ভার পড়ে প্রকৃতি-দেবীর উপর।

আচ্ছা, সেকালে না হয় মানুষের সুবুদ্ধির উদয় হয় নি, বিদ্যেও গজায় নি, তাই তাদের প্রাণ-পণ অধ্যবসায় সত্ত্বেও পৃথিবীর অনেক

জমি পতিত হয়েই রইলো। কিন্তু তার পরে ত ছটফটে রাজাগুলো যে-যার রাজ্যে থিতিয়ে ব'সলো, বিজ্ঞান ও হাজির হ'ল মানুষের খিদ্‌মৎ করতে; তবু কেন যে-মরু সেই-মরু খাঁ খাঁ করছে?

ইমারৎ যত উঁচু, ভিত তার মতো-মতো চওড়া না হলে যা হয়, মানুষের সেই রকমের দশাটা হয়েছে—তার হৃদয় উদার না হ'তেই বুদ্ধিটা বেজায় চ'ড়ে গেছে। মানুষে মানুষে ভালবাসার টান না থাকলে বুদ্ধিকে বাগ মানাবে কি দিয়ে? তাই মাঝে মাঝে হাল-ছাড়া বিজ্ঞানের কেরামতি দেখে অবাক হ'তে হয়—দুঃখ না হ'লে হাসি পেতো।

সবে সে দিন খবরের কাগজে পড়া গেল মার্কিন-দেশে দর বাড়াবার জন্যে হাজার হাজার বস্তা গম পুড়িয়ে ফেলার অদ্ভুত কাণ্ড!

য়ুরোপেরও একটা গল্প বলি। ১৯৩৪ সালে জর্মানীর বিজ্ঞানের ঠেলায় গমের এমনি ফলন হ'ল যে, দেশের লোকে খেয়ে শেষ করতে পারে না, পাঠিয়ে দিলে দিনেমার-গোরুকে খাওয়াতে। সেখানে আবার গোরু এত বেড়ে গেল যে, গো-খাদক জাতেও তার সদ্ব্যবহার ক'রে উঠতে পারলো না, কলে পিশে তাদের হাড়ে-মাসে পিণ্ডি পাকিয়ে ওলন্দাজ শুয়োরের খাবার ব'লে চালান গেল। সেখানে শুয়োর বংশের বাড়াবাড়ি আরম্ভ হওয়ায়, শুয়োরখেকোরও হ'ল অরুচি, শুয়োর মেরে সার দিতে লাগলো নতুন আবাদী জমিতে,—যাতে আবার বোনা হ'ল গম। বলিহারি যাই চক্করের বাহার—

সার দিয়ে বেড়ে যায় গম
গোরুতে খায় সেই বাড়তি গম
বাড়তি গোরু দিয়ে খাওয়ালো শুয়োর
ক্ষেতের সার হ'ল বাড়তি শুয়োর

আবার বেড়ে যায় গম—
টাক্‌ডুমাডুম্‌ডুম !

ভেদ-বুদ্ধিই হয়ে আসছে মানুষের কাল। যে-যার নিজের দিকে টানাটানির চোটে যা উৎপন্ন হ'তে পারতো তা হয় না, যা হয় তাও ফেলা-ছড়া যায়।

১৯২৭ সালে লেখা এক জর্মন পণ্ডিতের মন্তব্য চুম্বক ক'রে দিলে আয়েবটা ফুটে উঠবে—"মরুকে উর্বর করার চেষ্টায় সমূহ বিপদ। জমি নিয়ে ফসল নিয়ে হবে কাড়াকাড়ি, বাধবে শেষটা লড়াই। এক জায়গার আবহাওয়ার না হয় উন্নতি করা হ'ল, আর এক জায়গায় তাতে উল্টো ফল হতে পারে, তারা করবে চেঁচামেচি, সেও গড়াবে যুদ্ধে। দূরের লোকের কথা ছেড়েই দাও, প্রতিবাসীর বাড় দেখলে প্রতিবাসীরাই খুনোখুনি লাগিয়ে দেয়।"

আর এক কথা, "এ উপকার করতে যাওয়া চলে না," "ও অভাব মোচন করা পোষায় না"—আজকালকার রাজনীতির এ সব বুলির মানে আর কিছু না, যে কর্তৃপক্ষ এ রকম কাজে হাত দেবে তাদের ঘরে কিছু আসবে না। কর্তার ইচ্ছে কর্ম, কর্তার লাভই লাভ। চল্‌তি তন্ত্রে সকলের সমৃদ্ধি বলে কোনো জিনিষই নেই।

নারায়ণকে ভাল না রাখলে নর-নারীর মঙ্গল নেই, এ সোজা কথা আজকাল যেন একটা অদ্ভুত রহস্যের মতো শোনায়—লোকে আঁৎকে, কিম্বা হেসে ওঠে। অথচ, এই কথাটুকু না বোঝায়, দুনিয়ার তিন ভাগ মানুষ আধ-পেটা খাচ্ছে, অনেকের তাও জুটছে না। এ দিকে বিজ্ঞানীরা বলেন, নতুন বিদ্যে-সাধ্যি কিছু না খাটিয়েও পৃথিবীর জল-স্থল থেকে মিলে-মিশে করলে যা উৎপন্ন হতে পারে, তাতে পৃথিবীর লোক চারগুণ বাড়লেও তাদের খাওয়া পরা চলতে পারে।

USSR ঠিকই বুঝেছেন। যা কিছু যোগাড় আছে, বা হ'তে পারে, সে সবের হিসেব ক'রে দরদ দিয়ে পরিবেশন করাই আসল উপায়।

সে জন্যে USSR দলে দলে বিশেষজ্ঞ কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। কেও দেখছেন মাটির উপরের ব্যবস্থা,—চলতি ফসল পূরো ফলানো, অন্য ভাল ফসল আনানো, কেও খুঁজছেন প্রকৃতির গচ্ছিত ধন মাটির তলা থেকে কোথায় তোলা যায়; কেও আসমানের জল নামিয়ে আনবার ফন্দি আঁটছেন, কেও জমিনে জল চারিয়ে দেবার ফিকির ঠাওরাচ্ছেন; কেও বা সূর্যের তেজ, আগুনের তাপ খাটিয়ে শক্তি সঞ্চয়ের মৎলব ফাঁদছেন; দিন নেই, রাত নেই, আপনা-ভুলে তাঁরা জন-গণের হিত-চিন্তায় লেগে আছেন,—এর-ওর-তার টাকা লাভের আশায় নয়, সমবেত সমাজের কল্যাণ-কল্পে এ সাধনা।

একেই বলা যায় যোগ। শুধু বিশেষজ্ঞের কেন, সঙ্ঘের সকলেরই চিত্তের ভাবনা, হৃদয়ের বেগ যেন রাশ টেনে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে নিজের চার দিকে ক্রমান্বয় চক্কর না খেয়ে সমাজের সমৃদ্ধিতে তারা নিজের বৃদ্ধি বোঝে, সে উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করার উৎসাহ পায়, সকলের ভাবী-উন্নতির জন্যে প্রফুল্ল মনে নিজের বর্তমান কষ্ট স্বীকার করতে পারে।

তাতেই ভরসা হয়, হাজার বৎসরের দাপাদাপিতে যা হয় নি, এঁদের পাঁচ-পাঁচ-বছরের সুসম্বদ্ধ চেষ্টায় তা হয়ে উঠবে—মরুকে এঁরা মাটি ক'রে ছাড়বেন।

জলের কথা

ব্যবস্থা ক'রে জল আনতে লাগাতে পারলে মরু-ভূমিকে ফলন্ত করা যায়, এ কথাটা নতুন নয়; জল আনার চেষ্টাও অনেক দিনের, তাও ত দেখা গেল। এক জোট হ'য়ে সব রকম বিদ্যে খাটানোটাই নতুন; আরো নতুন তার উদ্দেশ্য—সঙ্ঘ-বদ্ধ মানুষের উপকার, যে সঙ্ঘের মধ্যে জাতি-ভেদ নেই, যার মূল-মন্ত্র মানলে কোনো সমাজের তার মধ্যে ঢুকতে মানা নেই।

স্বর্গে-মর্ত্যে পাতালে, জল ত সর্বত্র। আকাশে জলের অদৃশ্য ভাপ উঠে মেঘ-কুয়াশা হ'য়ে দেখা দেয়। সমুদ্র ছাড়া, মাটির উপরের জল থাকে জমির খাঁজে নদী, গহ্বরের ভিতর হ্রদ, পাহাড়ের উপর বরফ হ'য়ে। মাটির তলার জল কোথাও চুঁয়ে চুঁয়ে ধীর স্রোতে চলে, কোথাও গুহায় গর্তে স্থির থাকে। কেমন ক'রে এই সব জলকে মানুষের দরকার মতো হাজির করা যায়, USSR-এর সেই ভাবনা।

স্বাভাবিক উৎস বাদে, পাত-কুয়ো, নল-কুয়ো, বাঁধা ইঁদারা, এই সব হ'ল পাতালের জলে পৌঁছে তাকে উপরে টেনে আনার মামুলী রাস্তা। মরুর মধ্যে কোনো জায়গায় উৎস থাকলে তার কাছে মানুষ বসতি ক'রে আসছে, আশ-পাশে কিছুদূর পর্যন্ত নিজের খোঁড়া কুয়ো ইঁদারা দিয়ে চাষের কাজ চালাচ্ছে, এই ত সেকেলে বন্দোবস্ত। কিন্তু কুয়োর উপর কুয়ো বাড়িয়ে জলের যোগাড়ে মরুকে ঝাঁঝরা ক'রে ফেলা,—এ কালের সে পন্থা নয়।

বাঁধানো নহরে-আনা জল পেলে, মানুষের পক্ষে যান-বাহন নিয়ে

মরু পারাপার করার উপায় হয় বটে, কিন্তু সে জল দুধারের জমির কতটুকুই বা ভেজাতে পারে, তেপান্তর বালির ভিতর দিয়ে বড় জোর একটা উর্বর রেখা টেনে যায়। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া রূষের মরুর আবাদ কি তার উপর নির্ভর ক'রে চলতে পারে? কাজেই নহর বাড়ানোর চেষ্টাও বড় একটা চলছে না।

তবে জাহাজে ক'রে জল আনা হবে না কি? তামাসার ভিতর এক এক বার সত্যি কথা থেকে যায়। কাশ্যপ সাগরের এক কোলের ধারে মরুর মধ্যিখানে Krasnovodsk ব'লে এক সহর আছে—বাংলা অক্ষরে লিখলে যার নাম উচ্চারণের অস্থবিধে বাড়বে বৈ কমবে না—সেখানে নোনা জলের ছড়াছড়ি, খাবার মতো এক ফোঁটাও মেলে না। কাজেই সাগর জলের নুন বাদ দিয়ে পানীয় জল কলে তৈরী ক'রে নিতে হয়। কল বিগড়ে গেলে, মেরামৎ না হওয়া পর্যন্ত সাগর পার থেকে জাহাজে জল আনে; ইতিমধ্যে খাবার জল টাকায়-সের বিকোয়! তাই ব'লে কেও কি মনে করবে, মাঝ-মরুতে জল পৌঁছে দেবার এটা এক উপায়?

বরফ-পাহাড়ে অফুরন্ত জল জমাট বেঁধে আছে। প্রকৃতির দেখা-দেখি ঐ জলের ভাগ নদী দিয়ে দরকার মতো আনতে পারলে একটা উপায়ের মতো উপায় হয় বটে—ভগীরথ-ইঞ্জিনিয়র যে-কৌশলে গঙ্গার ভাগীরথী শাখাকে বাংলা দেশের ভিতর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছিলেন। USSR ঐ ধরণেরই পথ ধরেছেন। তাঁদের দৃষ্টি-শক্তি ঋষি-তুল্য না হ'লেও, তার অভাব ভূতত্ত্ব-পুরাতত্ত্ব চর্চা দিয়ে পূরণ ক'রে নিয়েছেন।

আরো স্থবিধে হয় যদি যে-ক্ষেপে জোলো হাওয়া সাগর থেকে ডাঙ্গার উপর দিয়ে পাহাড় পর্যন্ত চলে তার জলের বোঝা এখানে-ওখানে ইচ্ছে-মতো খসিয়ে নিতে পারা যায়, তাহ'লে আনা-নেওয়ার পথ বল, সময়

বল্, ঝঞ্ঝাট বল, অনেক বেঁচে যায়। খাণ্ডব-দাহের সময় অর্জুন ইন্দ্রের প্রচণ্ড বর্ষণ আটক রেখেছিলেন; বিজ্ঞানীরা দেবরাজের বারিধারা চুরি করার চেষ্টায় আছেন। আকাশের সে গল্প পরে হবে; এখন ভূতলের কথা চলুক।

একবার .ভূচিত্রকে বায়স্কোপে চড়িয়ে সচল করার কল্পনা করা যাক, যাতে ক'রে ভূগোল-ইতিহাসের খেলা মানস-চক্ষে এক সঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে। তবে, যে সব ঘটনা ঘটতে এক-আধ যুগ লাগে সে-গুলোকে এক নজরে দেখে নিতে হ'লে ছবির কলটাকে বেজায় তাড়াতাড়ি চালাতে হবে।

বিজ্ঞানী মহলে একবার কথা উঠেছিল, মার্কিন মহাদেশ ধীরে, অতি ধীরে, এসিয়ার দিকে ঘেঁষে আসছে। কথাটার সত্যিমিথ্যে নিয়ে মাথা বকিয়ে লাভ নেই, আমাদের নাতির নাতির আমলেও ধরাছোঁয়ার মতো কিছু দেখা যাবে না। কিন্তু আমাদের বায়স্কোপে এ কল্পনার ছবি চাপালে মহাদেশ-দুটোর পরস্পরের ঘাড়ে পড়াটা এ পালার মধ্যে দেখে নেওয়া যেতে পারে। আবার উল্টো দিকে ঘোরালে এ রকম কাছে ঝুঁকে আসার কারণটাও আর এক বিজ্ঞানীর কল্পনায় প্রকাশ পাবে। তিনি মনে করেন, ঘটনাটা সেই পূরা কল্পের যবে জাঁকালো কোনো জ্যোতিষ্ক অতিথির টানে পৃথিবীর একমাত্র পুত্র, চাঁদ, মায়ের কোল ছিট্‌কে বেরিয়ে, প্রশান্ত মহাসাগরের অতল গহ্বরে আপন স্মৃতি রেখে যায়। এই বিপুল ক্ষত ক্রমশ জুড়ে আসাটাই দুই মহাদেশের ক্রমশ কাছাকাছি আসার কারণ। এ সব কল্পনার উপর ঝোঁক না দিয়ে ভবিষ্যতে ঠোকাঠুকির ফলটা বরং আলোচনা করা যাক।

বিপরীত দিকে চলতি দুই ট্রেন ধাক্কা খেলে যেমন মাঝের গাড়ি গুলো খাড়া হ'য়ে ওঠে, মহাদেশের বেলা তেমনি দেখা যাবে, যে-কিনারা

দুটো ভীষণ ঠাসে ঠেকবে, তাদের তলায় স্তরে স্তরে যে সব পাথরের ভিত আছে তারা চচ্চড় ক'রে বেঁকে চুরে ঠেলে উঠবে, মধ্যিখানের সমুদ্রের তলায় যা কিছু চুণ বালি শামুক ঝিনুক সব মাথায় নিয়ে এক সার পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এইরকমেই একটা ধাক্কায় জন্মেছিল হিমালয় শ্রেণী—এখনো তার চূড়োয় চূড়োয় জলচর শামুক ঝিনুকের খোলস পাওয়া যায়; মাটির ঢাকা খ'সে গিয়ে তার ভিতরকার স্তর বেরিয়ে পড়লে পাথর গুলোর দুমড়ে খাড়া হওয়ার চেহারা স্পষ্ট দেখা যায়।

ডাঙ্গায় ডাঙ্গায় ঠেকতেই মাঝে যে জল ছিল তা দুদিকে ছিট্‌কে বেরোবে। দুধারে ডাঙ্গার জমিটা চাপের চোটে কুঁচ্‌কে ঢেউ খেলিয়ে যাবে, আলুর ক্ষেতের মতো দাঁড়ার পর খাল, খালের পর দাঁড়া। কোথাও জলের নীচে থেকে মাটি জাগবে, কোথাও জল চড়ে এসে মাটি তলাবে। এরকমেরই ঘটনায় কোনো সময় হয়ত Atlantis দেশ তলিয়ে গিয়েছিল; লোহিত সাগর মাঝে চড়ে এসে আরবে আফ্রিকায় বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে; ওলন্দাজদের দেশ নামিয়ে দিয়ে তাদিকে ত্রাহি ত্রাহি শব্দে বাঁধ বাঁধিয়ে রেখেছে।

এই ভাবেই সমুদ্র পরশুরামকে কোঙ্কন-কেরল দেশ দান করেছিল, আর যাদব কুলের রাজধানী কেড়ে নিয়েছিল।

পাহাড় খাড়া হ'লে তার উপর বৃষ্টি হবে, বরফ পড়বে, খাঁজে খাঁজে ঝরণা নেমে আসবে, জল নীচে পৌঁছে স্রোতা হয়ে জমির ঢাল ধ'রে ধ'রে চলতে থাকবে। গাছ যে রকম গুঁড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে ডাল-পালা ছড়ায়, নদীর বাড় ঠিক তার উল্টো,—শাখা-প্রশাখা নানা দিক থেকে একস্রোতে জুটলে পর, শেষে গুঁড়ির মতো ভরা নদী জেঁকে ওঠে। প্রথম দিকটা, যাকে নদীর ছেলেবেলা বলা যেতে পারে, নদীতে নদীতে শাখা কাড়াকাড়ি খেলা চলে, একই স্রোতা একবার এর দিকে একবার

ওর দিকে যায়। কিছুদূর এগিয়ে, যে-নদী অনেক শাখা নিয়ে দলে পুরু হয়, সে বুক ফুলিয়ে চলে, নয়ত একহারা হ'য়ে সরু থাকে।

পাহাড় থেকে মাটি বয়ে নিয়ে আসার সময় তারি পলি ফেলতে ফেলতে নদী দুধারের জমি তাজা রাখে, কিন্তু বুড়ো বয়সে পলির ভারে সে নিজের পথ নিজেই আটক করে, তাই তখন একবার এ পাড় একবার ও পাড় ঘেঁষে তাকে ট'লতে ট'লতে চলতে হয়। এই অবস্থা হয়েছে আমাদের বুড়ী পদ্মা-নদীর, যে জন্যে সে আজ এক পারের গ্রাম ভেঙে অপর পারে চড়া ওঠায়, কাল চড়া কেটে গ্রামের ধারে মাটি ফেলে। শেষকালে নদী সমুদ্রের ভিতর যে-সব সার ঢালে তাতে প্রচুর ঝাঁজি সেওলা জন্মায়, সেগুলো মাছে খায়, মাছকে আবার মানুষে খায়। আগাগোড়াই নদী মানুষের সেবক।

কারাকুমের ভিতর দিয়ে চলেছে আমু-দরিয়া নদী, সেটা উত্তর-পশ্চিম রোখে চলতে চলতে মাঝে উত্তর দিকে মোড় নিয়ে আরল সাগরে গিয়ে পড়েছে। অনেক কাল আগে এই নদী বরাবর পশ্চিম মুখ ধ'রে কাশ্যপ সাগরে পড়তো, তার চিহ্ন দেখা যায়। পুরানো চীন ফারসী গ্রীক পুঁথি মিলিয়ে জানা গেছে যে, পাঁচ ছ' শতাব্দী অন্তর এই আমু-দরিয়া একবার এ পথ দিয়ে একবার ও পথ দিয়ে চ'লে আসছে। এখনকার পথটা ১৫৭৫ সালে ধরেছিল, আবার দু'তিন শ' বছর পর কাশ্যপ সাগরে তার ফিরে যাবার কথা।

আরল সাগরের পথে শুধু বালি, নদীর জল পেয়ে তাতে ফসল ফলালেও, নদীর ধারে সহর গ'ড়ে ওঠার সুবিধে নেই। কিন্তু আমু-দরিয়া পশ্চিম-মুখে চলতে থাকলে, গন্ধক, পাথর-তেল, আরো কারবারের উপযোগী অনেক জিনিষ পথে পড়ে। এই সব থাকায় আগের বারে যে সহরগুলো উঠেছিল তার টুক্‌রো-টাক্‌রা আজও বালির মধ্যে প'ড়ে

আছে। এ পথটাই যদি মানুষের বেশী উপকারী, তবে অতশত বৎসর পর যা ঘটবে, তাকি দু'তিনটি 5-year plan-এর মধ্যে এগিয়ে আনা যায় না ?

তাহ'লে ভাবতে হয় আমু-দরিয়াটা অমন দু-মনা নদী কেন।

হয়েছে কি, বোখারা সহরের কাছাকাছি এসে, আমু-দরিয়া পড়েছে একটা দাঁড়-জমির মুখে। সেখান থেকে দুইরোখে দুই খাল জমি চলেছে। নদীটা এখন উত্তরমুখী খাল ধ'রেছে, তাই থেকে বোঝা যায় এ খালটাই বেশী নীচু। এক ঘড়া জল গড়ানে জায়গায় ঢাল্লে দেখা যায় ধারাগুলি বেছে বেছে কেমন সব-চেয়ে নাবী ঢাল ধ'রে চলে। যদি মাটি চাপা দিয়ে কোনো একটা ধারার পথে বাধা দেওয়া যায়, তখন সেটা অগত্যা কম নীচু পথই নেয়। এই মাটি চাপা দেওয়ার কাজটা নদী পলি ফেলে নিজেই করে।

নদীর ধর্মই হ'ল পতিত-উদ্ধার,—নীচুকে উঁচু, শুষ্ককে সজীব, অহল্যাকে* সীতারণ† উপযুক্ত করা। এই ব্রতপালনে আমু-দরিয়া চলতি পথটাকে ক্রমশ ওঠাতে থাকে ; শেষে যখন তলার সঙ্গে সঙ্গে জল ও বেশী উঁচু হয়ে ওঠে, তখন পতিত-পাবনী অন্য পথটায় গড়িয়ে পড়েন।

ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো আমু-দরিয়ার পালা ক'রে এ পথ ও পথ ধরার এই কারণ।

পথ বদলা-বদলির হিসেব যদি বোঝা গেল, তাহ'লে যে পথ চাই সে পথে নদীকে চালাবার উপায়ও ধরা প'ড়লো। পশ্চিম-মুখী খালের চেয়ে নদীর জল উঁচু হ'য়ে উঠলেই সে কাশ্যপ সাগরের দিকে চলবে,—এই না ? আচ্ছা বেশ, তবে পলি-পড়ার পথ চেয়ে বসে না থেকে, বাঁধ বেঁধে

*যে জমি শুখিয়ে শক্ত হওয়ায় তাতে হল (লাঙ্গল) চলে না।

† লাঙ্গলের ফলা।

জলটাকে তুলে ধরলেইত হয়! ইতিহাসে ভূগোলে তথ্য খোঁজার পারিশ্রমিক এই সহজ উপায়টি USSR পেয়ে গেল।

তবে কিনা, ভাবলেই ভাবনার কারণ জোটে। নদীর কাশ্যপ সাগরে যাবার পথের মধ্যিখানে এক প্রকাণ্ড গাড়া আছে, যেটা নদীর জলে ভ'রে গেলে একটা মস্ত বড় হ্রদ হবে—আগে তাই ছিল, তার লক্ষণ পাওয়া যায়। এ পথে নদী চালালে এই গহ্বর ভরা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকতে হবে, পরে ওপার দিয়ে নদী বেরিয়ে চ'লতে কত বৎসর যে কেটে যাবে তার ঠিকানা নেই। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হলে খাদের ভিতর দিয়ে দুই পাড় বাঁধাই ক'রে নদীকে ওপারে আস্ত পৌঁছে দিলে তবেই পাঁচ সাত বছরের মধ্যে ওর কাশ্যপ-সাগর সঙ্গম ঘটবে। তখন সেই **Krasnovodsk** সহরে আর জাহাজে ক'রে খাবার জল আনা লাগবে না।

কাশ্যপ সাগর রুষের মহা উপকারী জলাশয়—শুধু পূব-দক্ষিণের লূ আঁধি থেকে অপর পারের উর্বর প্রদেশের ফসল বাঁচিয়ে রাখে ব'লে নয়, সমস্ত রুষ-রাষ্ট্রের আদ্ধেক মাছ সর্বরাহ করে। তবে মুস্কিল হয়েছে কি, এ সাগর আর সাগর নেই, হ'য়ে গেছে হ্রদ। যে সময় ভারতবর্ষের মাথায় হিমালয় পাহাড়ের সার ঠেলে ওঠে, এ ঘটনাও সে সময়কার। বার সমুদ্রের সঙ্গে যে যোগ ছিল, তা বন্ধ হওয়া অবধি এর জমা-খরচের হিসেব গোলমাল হ'য়ে গেছে।

সাগর জলের খরচের মধ্যে—যে-ভাপ হওয়ায় টেনে নেয়; জমার মধ্যে —যে-জল নদীগুলো ফিরে আনে। সব-সমুদ্র সব-নদী ধরলে জমা-খরচের মিল থাকে, জল মোটের উপর কমেও না বাড়েও না; সমুদ্রে সমুদ্রে যোগ থাকায় এক সময় কোথাও বেশ'-কম হ'লে স্রোত চ'লে ঠিক ক'রে দেয়।

কিন্তু হ্রদ যদি আপনাকে আপনি সমান না রাখতে পারে, তাহলে ক্রমশ শুখোয়। হাওয়া ত জল টানতে কসুর করে না, যত ফলাও পায় তত টানে। জলের সে ক্ষয় সমুদ্র থেকে পূরণ না হওয়ায় যে ক'টি নদী ভিতরে এসে পড়ে তারাই ভরসা। জল যেমন কমে, হ্রদের প্রসারও কমে, তাতে হাওয়ার জল-টানার ক্ষেত্রও কমে। শেষে উবে-যাওয়া জলে নদী-আনা জলে সমান সমান হ'লে, হ্রদের একটা লেভেল দাঁড়িয়ে যায়।

কাশ্যপ সাগরের হয়েছে সেই দশা। এক-ঘ'রে হবার পর থেকে শুখোতে শুখোতে আসল সমুদ্রের লেভেল থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাত নেমে গেছে, এখনো অল্পে অল্পে নামার দিকেই চলছে। কিন্তু আর ক'মে গেলে জল এত নোনা হবে যে, ভাল মাছ আর টিঁকবে না; ধারে যে সব বন্দর আছে তা থেকে জল স'রে গেলে তারা কাজের বার হ'য়ে যাবে; রুষের বাসিন্দারা নানান ফেরে প'ড়বে। তাই USSR-এর রায় বেরিয়েছে—"কাশ্যপ সাগরকে জল খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।"

পূব-দিক থেকে আমু-দরিয়াকে আবার এনে ফেলার কথা ত বলা হয়েছে। পশ্চিম দিকে আপনি এসে পড়ছে মস্ত লম্বা বল্গা নদী। এমনিতেই বড়-সড় হ'লেও এর জল আরো বাড়াবার প্রস্তাব হচ্ছে। এ ধার ও ধার থেকে শাখা টেনে নিয়ে তা কতক হ'তে পারতো, কিন্তু জাঁকালো ভাবে কাজটা না করলে USSR-এর উপযুক্ত হবে কেন?

রুষের যে অংশ য়ুরোপের মধ্যে পড়ে, তার উত্তর সীমায় শ্বেত-সাগর আর উত্তর-মহাসাগর; দক্ষিণ সীমায় কাশ্যপ-সাগরের মাথা, আজব-সাগর আর কৃষ্ণ-সাগর। এ প্রদেশের মাঝামাঝি পূব-পশ্চিম লম্বা এক অধিত্যকা আছে, যার থেকে দক্ষিণ-মুখী বল্গা নদী পূব ঘেঁষে কাশ্যপ-সাগরে পড়ে, আর ডন-নদী পশ্চিম দিয়ে আজব-সাগরে গিয়ে পড়ে। এই নদী

দুটো আঁকতে-বাঁকতে এক জায়গায় অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়েছে, সেখানে খাল কেটে যোগ ক'রে দিলে, ডনের অনেক জল বল্গার ভিতর দিয়ে কাশ্যপ সাগরকে দেওয়া যায়।

কিন্তু রোসো! তাতে উদোর গাঁট কেটে বুদোর পকেট ভারি করা হবে না ত?

না, সে ভয় নেই। নদীর জল ক'মে গেলেও আজব সাগরের তত যায় আসে না, কারণ সে সত্যিকার সাগর, কৃষ্ণ সাগরের ভিতর দিয়ে বার সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ আছে।

তা যেন হ'ল কিন্তু যে জমি ডন-নদীর জলের উপর নির্ভর করে তার কি হবে?

সে ভাবনাও করা হ'য়েছে। জমা খরচ খতিয়ে দেখা গেছে, ডনের বিস্তর ফাল্‌তো জল আছে, যা আসল কাজে না লেগে বাজে বন্যায় লোকসান হ'য়ে যায়। তবুও আজব-সাগরের বড় বড় চিংড়ি কাঁকড়ার খোরাকের ক'মতি না পড়ে, সেটা মনে রেখে ডনের জল নেওয়া হবে।

মাথা যদি ঘামানোই হ'ল, তবে একা ডন-নদী নিয়েই বা কেন? ঐ প্রদেশে আরো কত নদী আছে। ছোটগুলি ছেড়ে দিলেও, মাঝের সেই উঁচু ভূমির উত্তর দিয়ে ডুইনা-নদী শ্বেত-সাগরে, আর পেটচোরা নদী উত্তর-মহাসাগরে চলেছে। অন্য ডাঙ্গার মতো অধিত্যকার জমিও দাঁড়ে-খালে ঢেউ-খেলানো। তবে দাঁড়াগুলো কোথাও পাহাড়ের মতো, কোথাও বা উঁচু মাঠ হয়ে রয়েছে; লম্বা টানা খালে স্রোতা বইছে, চওড়া গহ্বর বিল হয়ে আছে। এই রকমারি অবস্থার সুযোগ নিয়ে, কতক কেটে, কতক বেঁধে যদি দু'একটা বড় গোছের হ্রদ তৈরি করা যায়, যাদের সঙ্গে লক-গেট দিয়ে উত্তর-বাহিনী দক্ষিণ-বাহিনী যত ছোট বড় নদী সব যোগ করা থাকে, তাহলে কৃষ্ণ-সাগর থেকে শ্বেত-সাগর পর্যন্ত প্রায় দেড়-হাজার

মাইল লম্বা এক জল-পথের জাল তৈরী হয়, যাতে ক'রে বাণিজ্যের উপর ব'সে লক্ষ্মী অনায়াসে রাষ্ট্রের এপার ওপার চলা-ফেরা ক'রতে পারবেন।

তা বাদে 5-year-plan চালাবার কেমন সুবিধে হবে ভাবো দেখি!

কয়েদীর মতো মাটিতে-শিকল-বাঁধা চাষা, আকাশ পানে হা-পিত্যেশ ক'রে চেয়ে-থাকা চাষা,—এদের দিন আর থাকবে না। USSR-এর যাদু-কাঠির পরশে চাষা হ'য়ে উঠবে নানা বিদ্যেধর ইঞ্জিনিয়ার। এ-গেট খুলে সাগরে জল ভরো, মাছ বাড়াও; ও-গেট খুলে মরু ঠাণ্ডা করো, ফসল বাঁচাও; সে গেট বন্ধ রেখে প্লাবনের জড় মারো—একাধারে সে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের প্রতিনিধি হয়ে এমন সব হুকুম জারি করতে থাকবে।

এ রকমের বিরাট উদ্যম আমাদের ছন্ন-ছাড়া দেশে সম্ভব হ'লে, তাতে যদি সিকিম-ভোটানের মাঝখানের দুয়ার দিয়ে তিব্বতের নানা নদীর উদ্বৃত্ত জল সাহেবগঞ্জের কাছ বরাবর গঙ্গায় আনা যেতো, তাহলো অন্তত বাংলার নদীগুলো আজ শুখিয়ে মরতে বসতো না।

নদীকে এধারে ওধারে চালাতে হ'লে বাঁধ বাঁধাই সেরা উপায়। কিন্তু-যে দেশে উঁচু নীচু, শক্ত নরম হরেকরকমের জমি, সেখানে অনেক দেখে শুনে এ কাজ করতে হয়। বালির বাঁধের বিপদ ত জানাই; তলায় মরা পাথর আছে কি না তাও দেখা দরকার, নইলে ধ'সে যাবার ভয়; নীচের মাটি যদি ফোঁপ্‌রা থাকে জল চুঁইয়ে বেরিয়ে গিয়ে কাজ নষ্ট। তা ব'লে, বাঁধ মজবুত হলেই যে ঝঞ্ঝাট মিটলো, তাও নয়।

মনে কর, এক বাঁধ-বিৎ ঘাড়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে অনেক খুঁজে পেতে নিরাপদ জায়গা পেয়ে মিস্ত্রী-মজুর আনার উদ্যোগ করছে, হেন কালে লম্বা-পুঁথি বগলে মাছবিৎ এসে বচসা লাগালে—

"কি করা হচ্ছে ?'

"বাঁধ বাঁধছি, মশায়।"

"এখানে বাঁধ ?"

"আজ্ঞে, তলা পরখ করেছি, ঠিক আছে।"

"রেখে দিন আপনার তলা! মাছের কি হবে তাই ভাবুন। পেটে ডিম নিয়ে যে মাছ উপরে উঠছে, তাদিকে এখানে আটকে দিলে ডিম পাড়বে কোথায়, পোনাই বা বাড়বে কোথায় ? নদী নিয়ে ছেলে খেলা করলে জীবের প্রাণ যাবে।"

"আচ্ছা, অত কথায় কাজ কি, আমাদের দুজনেরই মনের মতো জায়গা দেখা যাক।"

ঘোরাঘুরি ক'রে যদি তা পাওয়া গেল, তখন কাগজের তাড়া হাতে চাষবিৎ এসে খেঁকিয়ে উঠলো—

"বলি, এখানে জল উঁচু ক'রলে বর্ষার সময় তল্লাট হেজে যাবে যে! তখন দেশে কত হাজার বস্তা ফসল ঘাটতি হবে, সে খবর কি রাখতে নেই ?"

"বেশ, বেশ, আপনি না হয় ঠিক জায়গা বাৎলে দিন"—

এই বলে তাঁর সঙ্গে রফা হতে না হ'তে, হাঁ হাঁ ক'রে হাজির হ'ল নাবিক—

"কর্তারা বাজে তর্ক করেন কেন ? এখানেই বা কি, ওখানেই বা কি, বিনা-গেটের বাঁধ যদি তোলেন, নৌকো পার হবে কেমনে ? জল-পথে মাল চলা বন্ধ হলে ঢোলাই খরচে সব খেয়ে নেবে যে!"

নানা-বেত্তা সঙ্কট দেখে অবশেষে সমবায়ী উপস্থিত হয়ে সদরে তার করলেন—"এদের সবাইকে সভা ক'রে বসানো হোক, নইলে কাজ এগোবে না।"

আমাদের মন-গড়া এ টেলিগ্রামের অপেক্ষা না ক'রেই আলাদা বিদ্যের বিশেষজ্ঞ দলকে USSR এক সঙ্গে পরামর্শ করিয়ে কাজে হাত দিয়ে থাকেন। সে পরামর্শ-সভা কি বৃহৎ ব্যাপার! একটা বড় হলেও সবাইকে ধরে না। তাতে ক্ষতিই বা কি? তারা তো মুখে মুখে তর্ক করে না, যে-যার তথ্য সাজানো, যুক্তি দেখানো, আঁক কষা, সবি লিখে হয়, শেষে নেতারা যে কাজের জন্যে যা দরকার তাদের রিপোর্ট থেকে সংগ্রহ ক'রে ব্যবস্থা করেন।

বিষয়-মোহে জড়ভরত দেশে যেখানে জমির স্বত্ব এক পক্ষের, জলের স্বামীত্ব অপরের; যেখানে একই নদীর কতকটা এক কর্তার তাঁবে, বাকিটা ভিন্ন-এলাকায়; যে-যার অধিকার নিয়ে মত্ত, কেও কাওকে পোছে না, কেউ কাওকে রেহাই দেয় না; সেখানে এমন সব-দিক-দর্শী কল্পনা করাই মুস্কিল, কাজে আনা ত দূরের কথা।

USSR-এর বিরাটরাষ্ট্রে তাঁরা ক্ষিতি-পতি, সিন্ধু-পতি, প্রজাপতি সবই। ভর্তা-পাতা-সর্বসুখদাতা হ'য়ে তাঁরা যে-ভাবে পতি-ধর্ম পালনে উঠে-প'ড়ে লেগেছেন, তার তারিফ না ক'রে থাকা যায় না।

আকাশের কথা

ঘর ব'লতে আমরা বুঝি, মাথার-উপর চাল, চার পাশে দেয়াল; চীনেরা বলে মাঝের ফাঁকটাই আসল। আকাশ ফাঁকা, তাই মহান। তাই ব'লে শূন্য ব্যোমকে ভূতের দলে ফেলার মানে কি হ'তে পারে? তাকে ভূতের খেলা-ঘর বল্লে বরং মানাতো।

যাঁরা গগনে বিহার করেন, তাঁদের মধ্যে আগে মনে উদয় হন সূর্য— তাঁকে ধরে দেবতার দলে,তাঁর রশ্মিকে ভূতের মধ্যে, যে ভূত দিয়ে প্রকৃতি-মাতা প্রাণশক্তি গড়েন ; তাঁর আজকালকার ছেলেরাও পিছ্‌-পাও নয়, তারা এ ভূত দিয়ে তৈরি করে কলের শক্তি।

স্বাভাবিক অবস্থায় যাকে বলে জলের ভাপ, চাপের মধ্যে জন্মালে তাকেই বলে স্টীম, সে অবস্থায় তাকে জল থেকে বার করতে তাপও লাগে বিস্তর। বিজ্ঞানীদের চেষ্টা চলেছে, আতসী কাঁচের ভিতর দিয়ে গুচ্ছের সূর্য-কিরণ জড়ো ক'রে তাদের মিলিত তাতে জলকে স্টীমকরা। স্টীম একবার হ'লে তা দিয়ে ইচ্ছেমতো যে-কোনো রকমের কল চালিয়ে নেওয়া যায়, এমন কি, সাহারার মধ্যিখানে ব'সেও বরফ জমানো যায়,—যেমন তপস্যার ঝাঁজে সাধক বাসনা ঠাণ্ডা করতে পারেন।

সূর্যের পরেই মনে পড়ে চন্দ্রকে। তিনি নিস্তেজ হ'লেও নেহাৎ শক্তি-হীন দেবতা নন। সমুদ্রের জলকে টান মেরে পৃথিবীর উপর দিয়ে জোয়ারের ঢেউ দু'বেলা ঘোরান, সেই সঙ্গে বায়ু মণ্ডলেও বাতাসের স্রোত চালান।

বায়ু ত দেব-কে-দেব, ভূত-কে-ভূত। অদৃশ্য হ'লে কি হয়, পবন-দেবের দাপট যে খেয়েছে সে তাঁকে ভুলতে পারে না। বায়ুর ভৌতিক শক্তিকে মানুষ পাল তুলে নৌকো জাহাজ চালাবার কাজে চিরকাল খাটিয়ে এসেছে ; তার উপর, হালে, চাকার মতো পাখা তুলে, পাঁচ রকম কলের মধ্যে, জল-তোলা কল তা দিয়ে চালানো হ'য়ে থাকে, যার সাহায্যে কুয়োর উপকার অনেক গুণ বাড়িয়ে তোলা যায়।

আর আছেন, মেঘের গায়ে যিনি থেকে থেকে চম্‌কান,—সেই সৌদামিনী। তিনি দেবীও নন্‌, ভূতনীও নন্‌ ; তার মানে তাঁর সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষদের ভাল রকম আলাপই ছিল না। এখন আমরা

তাঁকে যুগলরূপা ব'লে চিনেছি। যুগল-মিলন হ'লে তিনি শান্ত অপ্রকাশ থাকেন। মেঘের দৌরাত্ম্যে বিচ্ছেদ ঘটলে, পুনর্মিলনের মুহূর্তে তিনি ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হেনে যান, তার বজ্র কখনো বা মানুষের উপরেও এসে পড়ে। সেকালের ভাবুকেরা বজ্রকে ইন্দ্রের হাতিয়ার মনে করায়, বিদ্যুতের কোপকে খেলা ব'লে ভুল করতেন, তাঁর ক্ষণ-প্রভার আড়ালে প্রচণ্ড শক্তি মৌজুদ থাকার খবর তাঁরা জানতে পারেন নি।

নাম-করণে বিজ্ঞানীরা কিছু বেরসিক। বিজলী যে ভাবেই আমাদের সাক্ষাতে আসুক, সে সতেজে জানান দেয় "আমি আছি"; তবে তার এক ভাবকে "হাঁ ধর্মী" অপরকে "না ধর্মী" বলা কেন? বরং এই দুই ভাবের দামী-দামিনী গোছের নাম দিলে সাজতো। কিন্তু নাম যাই দিন, কাজ আদায়ের বেলা বিজ্ঞানীরা খুব দড়ো। এই দামী-দামিনীকে আলাদা ক'রে রাখলে তাদের মেলার আবেগ তীব্র হ'য়ে ওঠে একথা জানতে পেরে, সেই আবেগের তেজকে মানুষের কাজে আনার অনেক কল কৌশল বেরিয়েছে। চপলাকে স্থির ক'রে আঁধারকে আলো করা হয়; বজ্রকে গর্জে ঘাড়ে পড়তে না দিয়ে তার কণিকা প্রবাহকে তারের নালীর মধ্য দিয়ে সুড়সুড় ক'রে যেখানে দরকার সেখানে পাঠানো হয়; বৈদ্যুৎকে মানুষের অশেষ রকম খিদমতে লাগানো হয়। তবে ঠিক মতো তোয়াজ না করলে শ্রমিকও বেঁকে বসে—বিজলীর ত কথাই নেই, তাকে স্ট্রাইক করার ফাঁক দিলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

আকাশ থেকে ফরমাস-মতো জল ঝরাবার কৌশল পেতে হ'লে মেঘের জীবনী মনে রেখে সাধনা করতে হয়।

বাতাস বরাবর একটানা বয় না, তা করলে এক জায়গায় হাওয়ার ঘাটতি এক জায়গায় বাড়তি হ'য়ে গণ্ডগোল বাধতো। তাই বাতাস স্তরে স্তরে দিকে দিকে চলে। সূর্যের তাপে সাগর থেকে ভাপ উঠে,

জলের ভিতর গোলা নুনের মতো, হাওয়ায় বেমালুম মিশে থাকে। জল হাওয়ার চেয়ে ভারি হ'লেও জলের ভাপ তার চেয়ে হাল্কা, তাই জোলো হাওয়া পাতলা হ'য়ে উপরে উঠে ডাঙ্গার দিকে বইতে থাকে। পাহাড়ে ঠেকে জল ঝরাবার পর হাওয়া শুখিয়েও যায় ঠাণ্ডাও হয়, তাইতে ভারি হয়ে নীচে নেমে সমুদ্রের দিকে ফেরে। আসলে, কিন্তু, যাতায়াতের পথ দুটো এত সোজাসুজি নয়,—পৃথিবীর পাক খাওয়া আছে, মেরুর বাঁধা ঠাণ্ডাই আছে, মরুর আগুনের ঝল্কা আছে, সমুদ্রের সামঞ্জস্য-গুণ আছে,—এত রকম ক্রিয়ার ফলে হাওয়ার পথ জটিল হয়ে পড়ে।

যেমন ক'রেই চলুক, দুই বিপরীত বাতাসের ঠেকাঠেকি হ'লে ঠাণ্ডা ভারি হাওয়ার ঠেলায় জোলো হাওয়া আরো উপরে উঠে যায়। পাহাড়ে যারা চড়ে তারা জানে ক্রমে উঠতে থাকলে ধাপে ধাপে কেমন ঠাণ্ডা বাড়ে। তাই ভাপ উঁচুতে উঠলে ঠাণ্ডায় জ'মে আবার জল হ'তে চায়। কিন্তু চাইলেই ত হয় না, জলের বসবার জায়গা দরকার করে,—যেমন নীচের হাওয়ার জল শীত পড়লে শিশির বিন্দু হয়ে ঘাসে পাতায় বসে। আকাশে সে রকম জায়গা পাওয়া যায় ধূলো-ধোঁওয়ার কণার উপর, যারা বৈদ্যুৎ সংগ্রহ করায় উপরে চ'ড়ে যেতে পেরেছে। ঠাণ্ডা ভাপ ধূলোর আসনে ব'সতে পেলে জলের কণা হয়ে দেখা দেয়,—মাটির কাছাকাছি থাকলে তাদিকে বলে কুয়াশা, উপর আকাশে থাকলে মেঘ। কতকগুলি মেঘের কণা মিশে জলের ফোঁটা বাঁধলে আকাশে আর ভেসে থাকতে পারে না, হাওয়ার চেয়ে ভারি হওয়ায় ধরায় ঝ'রে পড়ে। কিন্তু মেঘের কণার সঙ্গে থাকে, দামী হোক দামিনী হোক, একটি ক'রে বৈদ্যুৎ কণা—তারা না মিল্‌লে জলের কণারাও মিশতে পায় না। সে অবস্থায় মেঘ মেঘই থাকে, জল হ'য়ে বর্ষায় না, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে রঙের বাহার দিয়ে ঘুরে বেড়ায়,—তাতেই কবির মন সরস হয় বটে, কিন্তু চাষার পোড়া প্রাণ

জুড়োয় না। বৈদ্যুতের যুগল ধর্ম এই যে, দামীতে দামীতে নয়, দামিনীতে দামিনীতে নয়, মেলে শুধু দামী-দামিনী। তাই মিলনানন্দের বারি ঝরাতে হ'লে বিপরীত ভাবের বৈদ্যুৎ-ভরা দুই মেঘের সাক্ষাৎ-লাভ হওয়া চাই,—তবেই বিরহের ঝাঁজ উৎসবের রোশনাই আর দামামা বাদ্যে মেটে।

কিছু কাল আগে, আকাশে ক্রমাগত আতস-বাজি উড়িয়ে, উপর-মুখে কামানের আওয়াজ ক'রে, হাওয়ায়-মেশা ভাপকে জল করার চেষ্টা হ'য়েছিল। সারাদিন ধুন্ধুমার কাণ্ডের পর, সন্ধ্যে নাগাদ ফোঁটা কতক বৃষ্টি হ'ল বটে, কিন্তু মজুরী পোষাবার মতো মোটেই নয়। বিজ্ঞানীদের কিন্তু মাকড়সার স্বভাব। তাঁদের মনের মধ্যে যে সব থিওরী ভন্ ভন্ ক'রে বেড়ায় সেগুলোকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনতে পরীক্ষার যে জাল পাতেন, তা বার বার ছিঁড়ে পড়লেও তাঁরা ছাড়েন না। তাঁদের মহামন্ত্র হচ্ছে—try, try, try again! মেঘের কাছে ইচ্ছা-বৃষ্টি-বর আদায় না ক'রে বিদায় নেবেন না, এই ভীষণ পণ ক'রে তাঁরা লেগে আছেন।

তার পর বেরলো এরোপ্লেন। তাতে ক'রে উপরে ওঠা তত শক্ত নয়, উপরে নিরাপদে থাকাটা সব সময় ঘটে না।

কেন, মুক্ত আকাশে আবার কিসের বাধা?

এক বিঘ্ন হচ্ছে মেঘ। তার মধ্যে ঢুকে পড়লে দিক-ভ্রম হতে পারে, দামী-দামিনীর মাঝে পড়ে এক চোট বজ্র খেতে হতে পারে, পর পর ভারি-হাল্কা হাওয়ার বিভ্রাটে যন্ত্রটি মাটি-পানে হঠাৎ ছোঁ মারতে পারে। এই সব বেগতিক দেখে মেঘের সঙ্গে এরোপ্লেন-চালকের লাগলো ঝগড়া।

সেই হ্যাপায় পাঁচ রকম পরীক্ষা করতে করতে একজন এরোপ্লেন-হাঁকিয়ে মেঘের ভিতর এক বস্তা নুন ছিটিয়ে দিলে, তাতে তিন-চার মাইল-জোড়া মেঘ দেখতে দেখতে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। বৃষ্টি আনার

হিসেবে এটা অবশ্য উল্টা-বুঝা-রাম গোছের হ'ল, কিন্তু অতি-বৃষ্টি বন্ধ করার উপায়ও ত ফেলনা নয়।

ক্রমে যুদ্ধের দায় ঠেকে, এরোপ্লেন থেকে গাঢ় ধোঁওয়া উড়িয়ে নিজ-পক্ষের সেনাকে শত্রুর চোখের আড়াল করার ফন্দি আবিষ্কার হ'ল। সম্মোহন বাণ মেরে অর্জুন যেমন কৌরব মহারথীর দলকে ঘুম পাড়িয়েছিলেন, তেমনি আকাশ থেকে বিষাক্ত ধোঁয়া ছেড়ে বিপক্ষের চির-নিদ্রার ব্যবস্থাও হতে লাগলো। এই ধোঁয়া-চালানো কেরামতির সুবিধে পেয়ে USSR তাকে কাজে লাগাবার উদ্যোগ করলেন—মানুষ মারতে নয়, লোকের হিতার্থে।

বিজ্ঞানীর উপর হুকুম হ'ল—"যাও এরোপ্লেনে, অপ্‌কে খুসী ক'রে ক্ষিতির জন্যে বক্‌সিস নিয়ে এস!"

তখন চল্লেন বিজ্ঞানী, মেঘ-কণাদের জোড় মেলাবার বন্দোবস্ত করতে। এরোপ্লেন যখন মেঘ-রাজ্যে প্রথম চক্কর খেলো, তখন সব শুখনো, মেঘের জল মেঘেই লেপ্টে রইল, না লাগলো প্লেনের না চালকের গায়। বিজ্ঞানীর সঙ্গে ছিল বিপরীত-বৈদ্যুৎ-ভরা ধোঁয়া ওড়াবার সরঞ্জাম ; সে ধোঁয়া ছাড়ার পর, ইল্‌সে-গুঁড়ির ছিটে দিয়ে মেঘ তাকে আশীষ জানালো। শেষে তিনিও নেমে এলেন, আর রীতিমত এক পস্‌লাও বর্ষালো—বেশ যেন স্বাভাবিক বৃষ্টি।

শাস্ত্রে বলে সুখের পর দুঃখ চাকার মতো ঘুর-পাক খায়। সৃষ্টির কত রকম জিনিষ চাকা ভাবে ঘোরে, ভাবলে চমৎকার লাগে।

ধর না কেন, নিশ্বাসের সঙ্গে জন্তুরা হাওয়া থেকে অক্সিজেন টেনে নেয়, প্রশ্বাসের সঙ্গে ছাড়ে অক্সিজেন-কার্বন-মেশানো বাষ্প। তাই থেকে গাছগুলো কার্বন খেয়ে নিয়ে পরিষ্কার অক্সিজেন হাওয়ায় ফিরে দেয়! সে জন্যে এই দুই পক্ষ পাশাপাশি বাস করলে থাকে ভাল।

আবার উদ্ভিজ্জ না খেলে পশু পাখী শরীর রাখার মশলা পায় না, তা থেকে যা দরকার নিয়ে বাদবাকি ময়লা ব'লে ফেলে দেয়। সেই ফেলা জিনিষ দিয়ে মাটি উদ্ভিদকে সার যোগায়। আরো দেখ, গ্রামবাসী সহরকে পেটের খাবার সর্বরাহ করে, সহর পাড়াগাঁয়ে মনের আহার পাল্টা পাঠায়। শিষ্যকে গুরু নিজের সম্পদ দিয়ে আনন্দিত করেন, শিষ্যের আনন্দ দেখে দ্বিগুণ আনন্দে আরো দিতে থাকেন, আনন্দের এই চক্রবৃদ্ধি বাড়ে দুজনে মিলে ভূমানন্দের সন্ধান পান।

কিন্তু কিসের থেকে কোথায় এসে পড়া গেল? শিবের গান ত করতে বসা হয় নি! এখানে বলবার কথাটা এই ছিল—নদীকে পুষ্ট করে বৃষ্টি, বৃষ্টিকে আনতে হলে বৈদ্যুৎ লাগে, আবার পুষ্ট নদীর সাহায্যে বিজলী তৈরী হতে পারে।

নদীর জল চালাচালির সময় USSR এই চক্রের কথা ভোলেন নি। যেখানে, নদীর প্রপাত আছে, যেখানে লম্বা ঘোরালো বাঁকের দুই মুড়ো খাল কেটে জুড়ে দিলে জলের তোড় বাড়ানো যায়, সেই সেই জায়গায় একটা ক'রে বিজলী-তৈরীর শক্তি-ঘর তোলা হচ্ছে। এক পক্ষে যেমন নদীর জলের জাল, অন্য পক্ষে তেমনি বৈদ্যুৎ-তারের জাল; কোথাও কখনো কম প'ড়লে, যেখানে বেশী—সেখান থেকে অভাব পূরণ হতে পারবে।

এবার, তাহলে, আর খাল-কেটে বাঁধ বেঁধে নদীর জলকে খোসামোদ ক'রে আনা নয়। শত-হস্তীর সহস্র-ঘোড়ার শক্তি ধরে এমন সব বৈদ্যুতপম্প ব'সে যাবে, যারা মাত্র সুইচের ইঙ্গিত পেলে, পাহাড়ী ঝরণাকে লজ্জা দিয়ে, এখাল থেকে ওখালে, নীচের নদী থেকে উপরের হ্রদে হুড়হুড় ক'রে জল তুলবে ফেলবে।

আরো উপরের কথা হ'ল—আকাশ থেকে সোজা-সুজি জল নামানো।

হাওয়া যতই শুখিয়ে থাক্ না কেন, তা'তে বেশ একটু জলের ভাপ থেকেই যায়। যখন মানুষের সাধ্যি এমন হবে যে, অতিরিক্ত খরচ না ক'রে যেখানে ইচ্ছে আকাশের জল টেনে নামাতে পারবে, তখন ইন্দ্রের পৌরাণিক কর্তব্য আধুনিক মানবে নিজেই সেরে নিতে পারবে। তাহ'লে দেবরাজ সখের নাচ-গান নিয়ে মস্‌গুল থাকার সময় "গেলুম রে, ম'লুম রে" রবে কেও তাঁর মজলিসের রসভঙ্গ করতে দ্বারস্থ হবে না।

তবে সাবধান! অব্যবস্থিত রাজ্যে এবিদ্যে খাটাতে গেলে বিজ্ঞানী উভয়-সঙ্কটে প'ড়ে যেতে পারেন। যার বাড়ী বিয়ে, সে আবদার করবে আকাশ পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে থাক্; ওদিকে যে-চাষার ক্ষেত খাঁ খাঁ করছে সে ঝম্‌ঝমে বৃষ্টির জন্যে আপ্‌সা-আপ্‌সি করবে। মাঝে থেকে বিজ্ঞানী-বেচারীকে এক পক্ষ না এক পক্ষের ঠ্যাঙার গুঁতো না খেতে হয়!

USSR-এ সে হাঙ্গামার ভয় নেই। তাঁদের 5-year-plan-এর খবর আগে থাকতেই সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়। যে দিন না বর্ষালে কারো ক্ষতি নেই, উৎসবের পক্ষে সেই দিনই শুভদিন ধরা হবে; আকাশের কোন্ ভাগে কোন্ গ্রহতারা দেখা দিয়েছে তা'তে মানুষের ভাগ্যের ওলট-পালট কল্পনা করার দরকার হবে না। মনের মিলে পরস্পরের হিতসাধনে মানুষ যে যে জায়গায় জমায়েৎ হয়, সেগুলিকেই পরম তীর্থ ব'লে মানা হবে; ভিড় ঠেলে মরতে মরতে এ ঘাটে ও ঘাটে ডুব দিয়ে, মন বা কপাল ফেরাবার দুরাশা মনে পোষা হবে না। যে বর্ষণে দেশ-শুদ্ধ লোকের অন্ন-সংস্থান হবে, তার জন্যে দেবতার খামখেয়ালী মর্জির অপেক্ষা থাকবে না, স্তব-স্তুতির বাজে খাটুনি বেঁচে যাবে, যাদের গরজ তাদেরই প্রতিনিধি নিজগুণেই যথাযথ ব্যবস্থা করবেন—এই হচ্ছে USSR-এর সমীকরণ যজ্ঞের নব-বিধান।

———

পাতালের কথা

পাহাড় যেন জল-স্থল আকাশ-পাতাল সবেরই বাইরে, অথচ সকলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা। পাতালে ভিত, আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে মাথা, প্রকাণ্ড ভাল্লুকের মতো, পিঠে জঙ্গলের রোঁয়া নিয়ে ভুঁইয়ে হাত-পা ছিৎরে সে উপুড় হয়ে আছে। নিজের উপর মেঘের বর্ষণ টেনে নিয়ে সেই জল সমুদ্রের দিকে গড়িয়ে দিচ্ছে, সেই সঙ্গে গা-ধোয়া মাটি দিয়ে নীচের সার-চোষা মাঠগুলোকে তাজা রাখছে।

সমুদ্রকে রত্নাকর বলে বটে, কিন্তু রত্নের ভার নিয়ে কোনো ডোবা-জাহাজের ভিতর থেকে ছাড়া, সমুদ্র-তলা থেকে রত্ন উদ্ধারের খবর ত শোনা যায় না। আসল রত্নাকর হ'ল পাহাড়—তার পেটের ভিতর, ছাল-তোলা পিঠের উপর, আশ-পাশের খাঁজে-গর্তে যত রত্নের কাঁড়ি।

আজকাল, অবশ্য, পাঁচ-রঙা পাথর হাতে পায়ে গলায়, ফোঁড়া নাক-কানে ঝুলিয়ে "আমি কি হনু" গোছের হাবভাব দেখাবার দিন চ'লে যাচ্ছে। গবর্ণমেণ্টের কৃপায় মুদ্রার কাজও সোনা রূপো ছেড়ে কাগজ দিয়ে সারা হচ্ছে। তবুও নানা কাজের ধাতুগুলোকে রত্নই বলতে হয়। আধুনিক হিসেবে এগুলি ভূত (ভৌতিক পদার্থের মৌলিক উপাদান)-ও বটে। মাত্র পাঁচ ভূতের দিন আর নেই, বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ৯২ টা ভূত খুঁজে পেয়েছেন, ক্রমে আরো হয়ত পাবেন। তার মধ্যে চলতি কথায় যাকে ধাতু বলে তা ত আছেই, এমনও অনেক জিনিষ আছে যাকে ধাতু বলা হয় না; তা-ছাড়া আছে radium-জাতীয় পদার্থ, যাদের পরমাণু ক্রমশ তেজ হ'য়ে ফেটে ফেটে বেরিয়ে পড়ে, যে জন্যে তাদিকে রেডিও-তেজী (radio-active) বলা হয়।

সে হিসেবে পাহাড়কে ভূতালয় বলাও চলে! শোনা যায় পাহাড়ী জাতদের বড্ড ভূতের ভয়—কিন্তু সে-ভূত এ-ভূত নয়।

কখনো কখনো রত্নের খনি দৈবাৎ ধরা পড়ে। রূষের উরল-পাহাড়ে একবার একটা বড় গাছ ঝড়ে উপ্‌ড়ে পড়ে। পাহাড়ী চাষারা তার শিকড়-জড়ানো দুএকটি পান্নার পাথর পেয়ে, শিকড়ের গর্তের মধ্যে আরো খুঁড়তে খুঁড়তে পান্নার খনিতে পৌঁছে গেল। মার্কিন দেশে এক ডোবার উপর তেল ভাসছে দেখে নল চালিয়ে পাথর-তেলের উৎস বেরিয়ে পড়লো। আমাদের দেশেও পাহাড়ের গায়ে রাস্তা করতে বা পাথর কাটতে মাঝে মাঝে নানান ধাতুর সন্ধান মেলে।

কিন্তু দৈবের উপর নির্ভর ক'রে ব'সে থাকলে আবিষ্কারের কাজ কচ্ছপের চালে চলে, বিজ্ঞানকে সহায় করলে খরগোসের মতো দৌড়তে পারে। টাকার ব্যাগ হারিয়ে এলে তাকে হঠাৎ কোথাও কুড়িয়ে পাওয়ার আশা খুব কম, বিধিমতে খুঁজতে গেলে ভাবতে হয়, কোথায় যাওয়া হয়েছিল, কোন্ পথে আসা হয়েছিল, কার গাড়ীতে চড়া হয়েছিল; মাটির পানে চোখ রেখে সেই পথে ফিরে গিয়ে, সেই গাড়োয়ানের খবর করে, তন্নতন্ন ক'রে দেখতে হয়। খনি খোঁজারও সেই নিয়ম।

ফিন-জাতের দেশ (Finland)-এ এক বিজ্ঞানী কতকগুলো বড় বড় তামার পাথর দেখতে পান। সেটা পাহাড়ী জায়গা নয় যে, তামার খনি থাকবে। তাহ'লে সে পাথর এল কি ক'রে? আকাশ থেকে নিশ্চয়ই পড়ে নি; তবে জলের তোড়ের সঙ্গে গড়িয়ে আসা অসম্ভব নয়।

কিন্তু নদী কৈ?

এখন না থাক্, এক সময় ছিল, ছড়ানো নুড়ি দেখে অনুমান হয়।

কেন?

তবে গোড়া থেকে বলি শোনো।

উঁচু পাহাড়ের, কিম্বা মেরুর কাছাকাছি দেশের পাহাড়ের মাথা এত ঠাণ্ডা যে, সেখানকার বরফ মোটেই গ'লতে পায় না, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে

বরফী-ধারা (glacier) হ'য়ে পৃথিবীর টানে আস্তে আস্তে নামতে থাকে।

মনে কর এক চাংড়া বরফ এক-ফেরা সরু তার দিয়ে ঝোলানো আছে। চাংড়াটার ভারে নীচের তারের ঠিক উপরের এক লাইন বরফ গলে যাবে, সেই ফাঁকে তারটা বরফের ভিতর কেটে ঢুকবে। যেমন ঢোকা, তারের নীচে আর চাপ থাকবে না, গলা জলটুকু আবার বরফ হওয়ায় ফাঁকটা বুজে যাবে। এমনি ক'রে তারটা ধীরে ধীরে বরফের ভিতর দিয়ে কাটার চিহ্ন না রেখেই উঠবে। শেষে তারটা একেবারে উঠে গেলে চাংড়াটা দুটুক্‌রো না হয়ে আস্তই তার ছেড়ে নীচে পড়বে।

পাহাড়ের খোঁদলের মধ্যে বরফী-নদী সেই ভাবেই চলে। দুই কিনারার চাপে ধারে ধারে একটু ক'রে একবার গলে, গলার সময় একটু নামে, চাপ উতরে গেলে সে জায়গা আবার জ'মে যায়, আবার চাপ পড়ে। এই গলা জমা ভিতরে ভিতরে চলতে থাকে, বাইরে থেকে দেখলে সমস্তটা নিরেটভাবেই ক্রমে নীচের দিকে নামে।

ছোট বড় ঢিলে পাথর পথে যা পায় তাই আঁক্‌ড়ে বরফী-নদী সঙ্গে নিয়ে চলে, সেগুলো তলায় কিনারায় আঁচড়ের দাগ রেখে যায়। নীচের গরমে পৌঁছে নদীর বরফ গ'লে জল হ'লে পর, বড় পাথরগুলো সেখানেই থেকে যায়, ছোটগুলো জলের তোড়ে কিছু দূর ঘস্‌ড়াতে ঘস্‌ড়াতে গোল হ'য়ে যায়। শেষে জমির ঢাল ক'মে গেলে স্রোতও মন্দ হয়ে যায়, তখন নদী বালি মাটির কণার চেয়ে ভারি আর কিছু টেনে নিতে পারে না, তখন নুড়িগুলোকেও ফেলে যায়।

এই বৃত্তান্ত মনে থাকায়, যে-বিজ্ঞানী সেই তামার পাথর দেখেছিলেন তিনি নুড়ি দেখে, আশপাশের পাথরের গায়ে আঁচড়ের দাগ দেখে সেই পুরাকালের বরফী-নদীর পথ ধরে চলতে লাগলেন, ৪০।৫০ মাইল যেতে না যেতেই পাহাড়ী জমির মধ্যে তামার খনি পেয়েও গেলেন।

তবু থাকে একটা সমস্যা। এক সময় যেখানে বরফী-নদী ছিল, আজ সেখানে মানুষের বসবাস,—এমনটা হয় কি করে ?

এ নদী হচ্ছে সেই কল্পের যখন পৃথিবীর উত্তর ভাগের সবটাই মেরুর মতো বরফের রাজ্য ছিল। ক্রমে ভৌতিক ক্রিয়ার গতিকে বরফী যুগ কেটে গিয়ে য়ুরোপ-এসিয়ার উত্তর ভাগ মানুষ থাকার উপযোগী হ'ল। যদি কালে ভূখণ্ডের নড়া চড়ার গতিকে সমুদ্রের মধ্যে gulf stream নামের গরম জলের যে ধারা চলাচল করছে তার স্রোত অন্য দিকে ঘুরে যায়, তখন England Iceland হয়ে যাবে,—কিন্তু তখনো কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জমাট বেঁধে থাকবে ?

পাহাড়ের উপরকার কোনো পাথরের গায়ে হাত দিলে সেটা সেখানকার হাওয়ার মতোই ঠাণ্ডা ঠেকবে। কিন্তু পাহাড়ের ভিতরটা বিলক্ষণ গরম। রেল-লাইন চালাবার জন্যে যখন সুরঙ্গ কাটে, পাহাড়ের মাঝামাঝি পৌঁছে এত তাত বাড়ে যে কাজ করাই মুস্কিল। মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে চল্লে সেখানেও গরম—যত তলানো যায় তত তাপ। শীত দেশেরও গভীর খনিতে যারা কাজ করে তারা গায়ে জামা রাখতে পারে না। মার্কিন দেশে একটা পাথর-তেল তোলার নল দুমাইল নীচে পর্যন্ত নামানো হয়েছে, তার তলায় জল আপনি স্টীম হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন ১৫।২০ মাইল নীচে পাথর-গলা তাত।

মোট কথা আমরা যে ভূমির উপর বাস করি, বড় বড় ইমারৎ তুলি, যাকে স্থাবরের আদর্শ বলে মানি, সেটা গলা ধাতুর উপর ভাসছে বল্লেও হয়। ২০।২৫ মাইল নীচে যা কিছু আছে—সোনা, রূপো, লোহা, সীসে, টিন—সবি গলা অবস্থায়, তবে উপরকার ভীষণ চাপের কারণে টগবগ ক'রে না ফুটলেও তাতে তরলতার কিছু কিছু গুণ আছে।

বিজ্ঞানীরা এই পাঁচ মিশল গলা পদার্থটাকে magma বলেন, উপরে

উঠে ঠাণ্ডা হলে এর থেকে যত রকম ধাতু পাথরের ও অবশেষে মৃত্তিকারও জন্ম হয়, সে খাতিরে আমরা একে মাতৃকা বলতে পারি।

এই মাতৃকার তলায় কোন প্রচণ্ড চুলোয় আগুন জ্বলছে ?

তলায় চুলোই নেই। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন যে, আরো ৫০।৬০ মাইল নীচে গেলে যত চাপ বাড়ে তত তাপ বাড়ে না। উত্তাপের কারণ মাতৃকার মধ্যেই আছে—এক ঝাঁক সেই রেডিও-তেজী ধাতুর পরমাণু, যারা ক্রমান্বয় ফেটে ফেটে বেরচ্ছে, তারাই এই ভীষণ আঁচ জাগিয়ে রাখে। এদেরই কল্যাণে পৃথিবী চাঁদের মতো জুড়িয়ে গিয়ে প্রাণী-পোষার অনুপযুক্ত হ'য়ে পড়ে নি।

গড়ে ২০ মাইল নীচে এই রেডিও-তেজী ধাতুর ভারি ভিড়। আরো ৬০ মাইল নেমে গেলে এগুলির চিহ্ন বড় একটা পাওয়া যায় না, সেখানকার চাপে পাথর তরল হতে পায় না। সুতরাং ৬০ মাইল গভীর মাতৃকা সাগরের শক্ত পাথরের তলা আমাদের পায়ের ৮০ মাইল নীচে। পৃথিবীর ব্যাসের মাপ ৮০০০ মাইল, কাজেই কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠ ৪০০০ মাইল তফাৎ। এই ৪০০০ মাইলের উপরকার ৮০ মাইল স্তরের এইটুকু খবর পাওয়া গেছে।

জলের সমুদ্রে যেমন জাহাজ, তেমনি পৃথিবীর উপরের স্তরটা, ডাঙ্গাই হোক, পাহাড়ই হোক, আর সাগর-জলে ভরা খাদই হোক, সবই সেই মাতৃকার উপর দোলা খাচ্ছে; তবে দোলের তালটা খুব বিলম্বিত। ডাঙ্গার তলার পাথরের ভিতটা যত ভারি, সমুদ্রের তলার ভিতটা তত নয়, সব চেয়ে ভার পাহাড় শ্রেণীর তলার। ভার অনুসারে এসব মাতৃকার মধ্যে কম-বেশী ডুবে আছে।

কিন্তু উপরের ওজন বরাবর এক রকম থাকে না। জলের ক্রিয়ায় পাহাড়ের উপরকার স্তর দিন-কে-দিন ক্ষ'য়ে যাচ্ছে, তার গা থেকে খসা

মাটি-পাথর, আরো পথে কুড়োনো যা-কিছু, নিয়ে নদীগুলো অবিশ্রান্ত সমুদ্রে ঢেলে চলেছে। তার ফলে পাহাড়গুলো হয়ে যাচ্ছে হাল্কা, নদীর মোহানার সামনেটা হ'য়ে আসছে ভারি। সে জন্যে, ধীরে ধীরে হ'লেও, পৃথিবীর ভিন্ন অংশের ওঠা নামা চলছেই। যেমন, যে নৌকোটায় যাত্রী ওঠে সেটা জলের ভিতর একটু নেমে যায়, যার থেকে যাত্রী নামে সেটা একটু ভেসে ওঠে। তাছাড়া তাপেরও হেরফের চলতে থাকে।

পাত্রে-ভরা জলের উপর চাপ দিলে উপচে পড়ে, ঢাকা থাকলে ফাঁক দিয়ে ছিটকে বেরোয়। জল ভরা হুঁকোয় টান না দিয়ে ফুঁ দিলে জল নল দিয়ে ফোয়ারা হ'য়ে ওঠে। সেই রকম, কোনো ভূখণ্ডের ভার কিম্বা তলার তাত বেড়ে উঠলে, তার মাতৃকার উপর চাপ পড়ে, তাতে গলা ধাতুগুলো এ পাশ ও পাশ সরার জায়গা না পেয়ে উপরের পাথরের ফাটলের মধ্যে দিয়ে উঠে পড়ে, শেষ পর্যন্ত ফাঁক পেলে ভূ-পৃষ্ঠে বেরিয়ে পড়ে। দুপাশের পাথর কম মজবুত হলে সেগুলোকে শুদ্ধ তুলে পাহাড় ক'রে দেয়।

এ রকম ঠেলে-ওঠা জায়গার মধ্যে বিস্তর ফাটল থেকে যায়, তাই পাহাড়ের মধ্যে দিয়েই বেশির ভাগ মাতৃকা উপরে বেরিয়ে পড়ে, সেখানে ঠাণ্ডা হ'লে পাথর হয়ে জ'মে যায়। ফাটলের ভিতরে ও উপরে হাল্কা, নীচে ভারি স্তরে স্তরে থিতিয়ে থাকে। তাতেই জন্মায় এক এক স্তরে এক এক রকম পাথরের খনি।

ফাটলে ওঠার সময় মাতৃকা কোনো গুহার জমা জলে ঠেকলে, তার তাতে সে জল স্টীমের ফোয়ারা হয়ে মাটির ফাঁক ফুঁড়ে বেরোয়, কিম্বা ধাতু-গোলা গরম জলের উৎস হয়ে দেখা দেয়।

যদি গোড়ার চাপের জোর খুব বেশি হয়, যাতে ফাটলের উপরকার মুখ আরো ফাঁক হয়ে মাতৃকার স্রোত তোড়ে উথলে ওঠে, তাহলে সে রকম ফাটা-মুখ পাহাড়কে বলে আগ্নেয়-গিরি।

বেরবার মুখ যদি ছোট হয় বা মোটেই না থাকে, তাহলে চাপের মধ্যে ঠাণ্ডা হ'লে তরল ধাতুগুলো ফটিকের মতো দানা-বেঁধে ধনীর পছন্দসই পাঁচ রকম মণি হয়।

এই হলো এক ধরণের খনির জন্ম-বৃত্তান্ত। এ কাহিনীর পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে ভূখণ্ডগুলোর নড়াচড়ার সময়, ভূমি কেঁপে কেঁপে উঠে মানুষের তৈরী ঘর-বাড়ী, কখনো বা মানুষের প্রাণ সমেত, নষ্ট করে। ভূতের এই উপদ্রবকে মানুষের পাপে দেবতার কোপ ব'লে কেও কেও ব্যাখ্যা দেন। জন কয়েকের অপরাধে স্থান-বিশেষের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে সাজা দেওয়ার রোগ মানুষের নেতাদের মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে, কিন্তু এ রকম অদ্ভুত বিচার-নীতি দেব-চরিত্রে আরোপ করায় তাঁদের মহিমা কতদূর বাড়ানো হয়, সে বিচারের ভার শ্রোতার উপর রইলো।

ধাতু-পাথর ছাড়া অপর পদার্থের খনি জন্মাবার ধারা অন্য রকমের।

মাতৃকায় ভাসা দেশগুলোর ওঠানামার গতিকে কোনো ডাঙ্গা যায় সাগরতলায় নেবে, কোনো সাগর আসে ডাঙ্গার উপর চ'ড়ে, যে ডাঙ্গা তলিয়ে যায়, তার উপর সমুদ্রের অগুণ্তি সামুক-ঝিনুক-জাতীয় প্রাণীরা মরার সময় তাদের চূনের খোলস, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী সমুদ্রের তলার উপরে ফেলতে থাকে। এ ভাবে কয়েক যুগ কেটে গেলে পর, যখন সে সাগরের জল আবার স'রে পড়ার পালা পড়ে, তখন তার সেই তলা আবার হয় ডাঙ্গা, কিন্তু আগেকার সে ডাঙ্গা নয়, এবার চূনের পুরু পর্দা প'ড়ে তার খাল-দাঁড়া সব একাকার।

সাগরের যেখানে কোল ছিল সেখানে পড়ে নুনের পলি।

সাগরে বা হ্রদে নদীর মোহানা থাকায় গুচ্ছের সেওলা গজিয়েছিল, দুধারের পেঁকো মাটিতে ভারি জঙ্গল উঠেছিল। সে সব জায়গা তলিয়ে

যাবার পর তাতে গাছের সংগ্রহকরা সূর্যের তেজ ভরা কয়লা, পাথর-তেল জন্মায়।

এরকম নতুন-ওঠা ডাঙ্গাগুলো বালি মাটি চাপা পড়লে এই পদার্থ-গুলো যে যার খনির মধ্যে থেকে যায়।

এখন কথা হচ্ছে, উপর থেকে কেমন করে জানা যাবে, পাহাড়ের ভিতর কোন্‌খানে ফাটল ছিল, কোনটার মধ্যে কি কি পাথরইবা জমা হয়ে রয়েছে? আন্দাজে এখানে ওখানে গর্ত ক'রে খুঁজে বেড়াতে গেলে বিস্তর খরচ। শক্ত পাহাড়ী পাথর কুরতে হীরে-বসানো যন্ত্র লাগে। সে খরচ বাঁচাতে হ'লে বিজ্ঞানীকে মগজ খাটিয়ে যন্ত্র বার করতে হয়।

এক যন্ত্র উদ্ভাবন হয়েছে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ধ'রে—যে আকর্ষণ থাকায় আমরা ঘরের দেয়ালে বেড়াতে পারি নে, থাকতে হয় মেঝের উপর। শুধু পৃথিবী সকলকে টানছে তা নয়, প্রত্যেক জিনিষ প্রত্যেককে টানছে, তবে ছোট ছোট টানের ফল শাদা চোখে ধরা যায় না। সূক্ষ্ম নিক্তির মতো এই যে যন্ত্র, এটা টানের অল্প হেরফেরে সাড়া দেয়, মাটির নীচে কোনো ভারি পাথরের স্তর থাকলে সে দিকে তার কাঁটা হেলে পড়ে। এই যন্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ালে কাঁটার ভঙ্গী দেখে বোঝা যায় কোন্‌ জায়গার তলায় ধাতু পাথর জমা আছে।

লোহার মতো চুম্বক-টানা ধাতুর খবর কম্পাসের কাঁটাও দিতে পারে। উপর-নীচে দুলতে পারে এ ভাবে চুম্বক-কাঁটাটাকে ঝোলালে, সে মাটির নীচে এ জাতীয় পাথর যেখানে আছে সে দিকে ঝোঁকে—তার ঝোঁকার রোখে লাইন টানলে সে লাইন ধাতুর সন্ধান বাংলে দেবে। দুতিন জায়গা থেকে এ রকম লাইন টানলে তারা যেখানে মিলবে সেখানে পাথরও মিলবে। এ লাইনের উল্টো দিকে থাকতে পারে নুন বা চুন বা কয়লার খনি।

ভূমিকম্পের মতো শত্রু পক্ষের কাছ থেকেও এ বিষয়ে সহায়তা পাওয়া যায়। ভূকম্প মাপার seismograph নামে এক রকম কম্প-মান যন্ত্র আছে, সে ভূমির কাঁপুনির রকম অনুসারে কাগজে আঁক-জোঁক কাটে। তার লিখন যে পড়তে জানে, সে কাগজে-আঁকা রেখার খেলা দেখে বুঝতে পারে কোন্ দিকে কত দূরে কাঁপুনি সুরু হয়েছিল, কোন পথ দিয়েই বা সেটা ঘুরে ফিরে কম্প-মান যন্ত্রে পৌছেছে।

মেঘ ডাকার আওয়াজের কথা ভাবলে এ যন্ত্রের ক্রিয়া বোঝার কতক সুবিধে হতে পারে। দুপাশ থেকে দামী-দামিনীর দল যখন বজ্র-নিনাদে মাঝের বায়ু স্তর ফুঁড়ে এসে মেলে, তখন কাছাকাছি শ্রোতার কানে প্রথমে তার কড়াৎ শব্দ বাজে। তার পরে আসতে থাকে তার প্রতিধ্বনি—গুড় গুড় গুড় গুড় গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম। প্রথম গুড়-গুড়-গুলো হ'ল কাছের মেঘ, মাঝের মেঘ, ক্রমশ দূরের মেঘ থেকে সেই গোড়ার কড়াৎ-টা পর পর ঠিক্‌রে আসার শব্দ। যখন এমন হয় যে দূরের মেঘ থেকে, আর কাছের এ মেঘ ও মেঘ সে মেঘ ঘুরে, দুই আওয়াজ একসঙ্গে কানে পৌছয়, সে বারে হয় গুড়ুম; যে বারে এক সঙ্গে তিন চার দিক থেকে আওয়াজ এসে পড়ে, সে বার হয় জানলা-দরজা-কাঁপানো বড় গুড়ম; তার পরে সেই গুড়ুমের আওয়াজ এদিক ওদিক থেকে ঠিক্‌রে ছোট ছোট গুড়ুমে অবসান হয়। সমজদার হয়ত এ সব আওয়াজ শুনে, আকাশে কি ভাবে মেঘের চাপগুলো সেজে আছে তার একটা ছবি পেতে পারে।

একই ভূধাক্কার কাঁপুনি সেই রকম দফে দফে আসে,—যন্ত্রে প্রথম পাওয়া যায় যে-গুলি সোজাসুজি সব চেয়ে ছোট পথে এসেছে; পরে আসে যে-গুলি পৃথিবী ঘুরে উল্টোদিক থেকে পৌছয়; শেষে হাজির হয় যেগুলি প্রথম একপত্তন নীচের দিকে তলিয়ে গিয়ে পরে

পাতালের কোনো পাথরে ঠেকে ঠিক্‌রে উপরে ফিরে আসে। শেষের এই কাঁপুনিগুলি পাতালের অনেক খবর এনে দেয়।

তবে কি তলার অবস্থা জানতে হ'লে ভূমিকম্পের আসার আশে হাঁ ক'রে ব'সে থাকা লাগবে?

তা কেন? মাটিতে গর্ত ক'রে তার ভিতর বারুদ বা dynamite ফাটালে তো ভূমিকে যখন ইচ্ছে যত ইচ্ছে কাঁপিয়ে তোলা যায়। বারুদ ফাটিয়ে লাগাও যন্ত্র, ওস্তাদের কাছে ধ'রে দাও তার লেখা, সে ব'লে দেবে মাটির নীচে কোথায় কত দূরে কি রকম ধরণের পাথর আছে।

আবার আমাদের ধুয়োয় এসে পড়া গেল। বৈজ্ঞানিক বিদ্যে ত USSR-এর এক-চেটে নয়, তবে কেন এমন ভাবে কথা হচ্ছে যেন এ বিষয়ে তাদের কিছু বিশেষত্ব আছে?

চল্‌তি তন্ত্রে রাজা-প্রজা ধনী বিজ্ঞানী সবাই কাজ করে নিজের নিজের লাভের আশায়। জমির মালিক প্রায়ই বিলাসী, বিজ্ঞান সম্বন্ধে উদাসীন, অপরকে খাটিয়ে নিতে মজবুত, পারিশ্রমিক দেবার বেলায় কষা। বিজ্ঞানীও নিজের বহু কষ্টে পাওয়া বিদ্যের ন্যায্য মূল্য না পেলে তাকে ছাড়তে চান না, পেটেই রেখে দেন। যাঁরা নির্লোভের বড়াই করেন, আমাদের সেই তাপস ফকিররাও ওষুধবিসুধ পেলে যে রকম আগলে রাখেন, একা বিজ্ঞানীর উপরই বা কটাক্ষ করা কেন? এই লাভ বা প্রতিপত্তির মোহে কত ভাল ভাল আবিষ্কার সাধারণের চির-সম্পত্তি হতে পায় নি তার কি ঠিক আছে?

বিপ্লবের আগে থেকেই রুষের Kursk-জেলার লোকের নজরে ঠেকতো যে, সেখানকার সব কম্পাসের কাঁটা নীচের দিকে একটু ঝুঁকে থাকে। এর কারণ বার করার জন্যে Leist নামে এক জর্মান পণ্ডিতকে

সকলে ধ'রে প'ড়লো। সে বিজ্ঞান-পাগল এ কাজে লেগে গেল ত বারো বৎসর টানা খেটেই চল্লো।

তার হাতে ক্রমশ ৪৫০০ দাগের এক জটিল নক্সা গ'ড়ে উঠলো, যার এক এক দাগ ফেলতে তাকে চৌপর দিন ধূলোয় জঙ্গলে হাঁটা-হাঁটি করতে হয়েছে, কারণ দাগ বেঠিক পড়লে তাতে অকাজ ছাড়া কোনো ফল হবে না। যারা কম্পাস বয় তাদের কোটে লোহার বোতাম, বা পকেটে চাবির গোছা, বা কাছাকাছি লোহার যন্ত্রপাতি থাকতে কম্পাসের কাঁটার লাইনে দাগ কাটলে ভুল হবে।

হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ত নক্সা দাঁড়ালো। বাকি রইলো পাঁচ জায়গায় গর্ত করে নক্সার লিখন ক্ষেত্রে যাচানো।—কিন্তু তার টাকা আসে কোথেকে?

খনি বেরলে ত জমিদারদের লাভ। কিন্তু নক্সায় এত বড় জায়গা দেখাচ্ছে, যা অনেক জমিদারের এলাকায় চারিয়ে পড়ে। অথচ মিলে-মিশে কাজ করার অভ্যেস জমিদারদের আদবেই নেই, বিজ্ঞানের তাঁরা কোনো ধার ধারেন না; এক মুদ্রা বার করলে সেটা হাল-ফিল দু মুদ্রা হ'য়ে ফেরা চাই—এই এক তত্ত্ব তাঁরা নিশ্চয় জানেন।

কাজেই অনেক কষ্টে যদি বা পরীক্ষার জন্যে তাঁরা চাঁদার টাকা কব্‌লালেন, ত মেওয়া ফলার সবুর তাঁদের সইলো না, কাজ শেষ হবার আগেই চাঁদা দেওয়া বন্ধ ক'রে দিলেন। হতাশ পণ্ডিত ত পাত্তাড়ি গুটিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে না খেতে পেয়ে মারা গেল। তখন সেই নক্সা পড়লো জর্মান বিশেষজ্ঞদের হাতে। সেটা যে কত বড় গুপ্ত ধনের সিন্দুকের চাবি, সে কথা তাঁদের বুঝতে বাকি রইলো না।

ইতিমধ্যে রুষের বিপ্লব আরম্ভ হ'য়ে গেছে। জমিদার আর নেই, রাষ্ট্র চালাচ্ছেন USSR। ঐ নক্সার মূল্য লাখে লাখে আদায় করার আশায় সেই জর্মান বিশেষজ্ঞের দল রুষে চলে এলেন।

কিন্তু USSR নিজের গুপ্ত-সিন্দুকের চাবি পরের কাছে ঠ'কে কিনবেন কেন,—তাঁরা কি চাবি গ'ড়তে জানেন না? এক পণ্ডিতের জায়গায় তাঁরা লাগিয়ে দিলেন এক ঝাঁক বিজ্ঞানী; দেখতে দেখতে বেরিয়ে পড়লো কোটি কোটি মণ লোহায় ভরা এক প্রকাণ্ড খনি। তাতে USSR-এর এক মস্ত অভাব মিটে গেল, কারণ বাইরের রাজ্য সকলেই বিরুদ্ধ-পক্ষ, তাদের কাছ থেকে ডবল দাম দিয়ে লোহা কিনতে হচ্ছিল।

এসব ব্যাপারের মজাটুকু এই যে, ভারতের ঋষিদের বাণী দূরে থাক্, USSR তাঁদের নামও শোনেন নি, অথচ কাজে তাঁদের কথার ব্যাখ্যা অজানতে ক'রে চলেছেন। উপনিষদে ত্যাগ ক'রে ভোগ করার কথা যা বলা হয়েছে, বিষয়ীর কাছে তার কোনো মানেই হ'তে চায় না, বড় জোর তাদিকে এইটুকু বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে ব্যাঙ্কে টাকা তোলা থাকলে ভোগে আসে না, খরচ করলে তবেই সেটা মূলধন হয়ে ভোগের উপায় জন্মাতে পারে। ও দিকে যাঁরা বৈরাগ্য-রোগ-গ্রস্ত, তাঁরা ভুলে যান যে আনন্দসম্ভোগের আসল উপায় শিখিয়ে দেওয়াই ঋষির উদ্দেশ্য, মনে করেন বুঝি ত্যাগের গুণগানই করা হচ্ছে।

USSR কিন্তু ঠিক বুঝেছেন, কাজেও দেখাচ্ছেন যে, যা ত্যাগ করা দরকার সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত ভোগের মোহ, যাতে একের লোকসান বিনা আরের লাভ হয় না, যে জন্যে বিষয়ে বিষ মাখানোই থাকে, তাই নড়তে চড়তে লাগে ঝগড়া-ঝাঁটি, মানুষের উন্নতির দরজা থাকে বন্ধ। এই মোহের হাত থেকে উদ্ধার পেলে তবেই সম্ভব হয় দেশ-সুদ্ধ লোকের সম্ভোগ, যাতে ভোগ্য-বস্তু সকলের ভাগেই বেড়ে ওঠে, সমবেত ব্যবস্থার গুণে বিবাদের জড় ম'রে যায়, মনকে উঁচু স্তরে ওঠানোর পথ খোলসা হয়।

তৃতীয় পালা

মন-প্রাণের উৎকর্ষ

আহারের সমস্যা

সাধে ভাবি USSR হয়ত এবারকার অবতার,—দেখাইত গেল, আকাশ বায়ু জ্যোতি জল এঁদের বাগ মেনে আসছে ; এঁদের শাসনে উত্তরবাহিনী নদী পশ্চিমে চলেছে, পশ্চিমের নদী পূবের নদীর সঙ্গে জল মেশাচ্ছে ; এঁদের বিধানে যেখানে ছিল মরু সেখানে কোথাও বনের পাখীর বৈঠক বসেছে, কোথাও সহুরে মানুষ হট্ট-গোল লাগিয়েছে ; যা ছিল ফাঁকা পাথুরে অধিত্যকা, হয়েছে সেখানে কাটা খাল, খালের ধারে সবুজ গাছের বেড়া, সে-কেলে নবাবদের কেয়ারি-করা বাগানের অতি বৃহৎ সংস্করণের মতো ; সকলের আধার যে পৃথিবী তার রূপ এমন ফিরে যাচ্ছে যে, কিছু কাল পর এরোপ্লেন থেকে এক নজর দেখলে তাকে সেই ইহ-লোক ব'লে আর চেনাই যাবে না !

ধরিত্রীকে রূপসী করার সখ ত নয়, "দরিদ্র নারায়ণ" যাতে পেট ভ'রে খেতে পান, সেই আগ্রহে এত গা-ঘামানো, এত মাথাব্যথা।

তাহলে আমরা নরেরা কি রাক্ষসের জাত—বুঝি শুধু আঁউ মাউ আর খাঁউ ?

তা যাই বলো, এক পেট ক্ষিধে নিয়ে বুদ্ধির কি ধার হয়, না মেজাজ খোস থাকে ? চরম গতির কথা ত ছেড়েই দাও।

এই চোদ্দ-পোয়া ধড়টাকে তাজা ভাবে খাড়া না রাখলে, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কোনোটারই নাগাল মেলে না। আর মানুষের খাবার ধাঁচাটা

যদি রাক্ষুসে হয়েই থাকে, সে দোষও প্রকৃতি-মায়ের, যাঁর কৃপায় কোনো না কোনো প্রাণী হত্যা না করলে তার প্রাণই বাঁচে না। কাজেই খোদার উপর খোদকারী ক'রে, প্রকৃতির প্রকৃতি বদলাতে না পারলে মানুষের মানুষ হওয়াই দায়।

মহাভারতে দু'রকম রাক্ষসের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্বর-অবস্থায় মানুষের হিড়িম্ব-রাক্ষসের মতো ভাব—যাকে পাই তাকে খাই, জুটলে নাচি গাই, নইলে হন্যে হ'য়ে বেড়াই। সভ্যতার বড়াই করলেই ত হয় না, আজ পর্যন্ত অনেক জাতের মানুষের জীবন-যাত্রা ঐ রকমই। কিন্তু বক-রাক্ষসের মতি অন্য ধরণের। সে পরের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে গ্রামকে স্বচ্ছন্দে রাখতো, তার দাম হিসেবে নিজের পেটচালাবার জন্যে পালা ক'রে একজন গ্রামবাসী খেতো।

উৎকৃষ্ট মানুষ বকের নিয়মে আশ্রিত প্রাণীদের সঙ্গে ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু অনেক সময় সে ঐ রাক্ষসের মতো মাত্রা ঠিক রাখতে পারে না। দেখ না কেন, আমাদের ধর্ম-প্রাণ জাতের মধ্যে নিজের পাঁঠা খাবার সখটা দেবতার উপর চাপিয়ে একদল ভক্ত রক্ত-নদী বইয়ে উৎকট আমোদে মাতে। সভ্যতা-অভিমানী মার্কিন দেশে জানোয়ার-মারা কলে এক দিক দিয়ে শুয়োর ঢুকিয়ে জন্তুটার আর্তনাদের রেশ কান থেকে না যেতেই অন্য দিক দিয়ে তার চামড়ার জুতো বার ক'রে নিজের কেরামতি দেখে নিজেই তাক।

সে যাই হোক, নরোত্তম পদ পেলে কি হবে বলা যায় না, নরের এখনকার অবস্থায় প্রকৃতির সঙ্গে রফারফি ছাড়া গতি নেই। বাঁদর মাংসাশী নয়, সে পাতা ফল খেয়ে থাকে। কিন্তু অভিব্যক্তির তাড়ায় যখন বানরের এক দল গাছ থেকে নেমে দু'পায়ে খাড়া হয়ে নর-রূপ নিলো, তখন প'ড়লো ফাঁপরে। ফল থেকে এসে গেল দূরে, অথচ চাষ-বাস

তখনো শেখে নি। ক্ষিধের জ্বালায় কি করে, পাথরের অস্ত্র বানিয়ে তা দিয়ে জীব-জন্তু মেরে খাওয়া অভ্যেস করতে হ'ল।

কিন্তু মাংস খাওয়া নরের দেহ-মনের উপযোগী না হওয়ায় মানুষের শরীর হ'য়ে দাঁড়ালো ব্যাধি-মন্দির। সে বিষয়ে সচেতন হ'য়ে আজকালকার পাশ্চাত্য ডাক্তারেও বলতে আরম্ভ ক'রেছেন যে, মাংস খাওয়া মানুষের পক্ষে দরকারী ত নয়ই, উপকারীও নয়। কৃষ্টির ফলে বুদ্ধি-বৃত্তি শোধন হ'লে মানুষ রাক্ষস-পিশাচের নকল না ক'রে, নিজের আক্কেল মতো চ'লে রক্তারক্তি কাণ্ড ত্যাগ করবে—এই আশায় ভর করে এখানে নিরামিষ আহারের আলোচনাই চলুক।

গাছের সঙ্গে মানুষের যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ সেটা নেহাৎ মন্দ দাঁড়ায় নি। ফলের বেলায় ত কথাই নেই, ওটা গাছ নিজের গরজে মিষ্টি রসের ভেট সমেত মানুষের হাতে তুলে দেয়, সঙ্গে থাকে এই মাত্র আবদার—"বংশ রক্ষার উপায় করে দিও।"

ফল ফলাতেই ত গাছ-তলার আশ-পাশের মাটির সার ফুরিয়ে আসে, সেই মাটিতে সোজাসুজি বীজ পড়তে দিলে নতুন চারার সঙ্গে পুরোনো গাছের খোরাক নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগে যাবে। তাই দূরের তাজা মাটি পর্যন্ত বীজ পৌছে দেবার জন্যে সচল জীবের সাহায্য নইলে নয়।

এদিকে, গাছের সে নীরব আবেদন মানুষ নিজের গরজেই মঞ্জুর ক'রে, গাছের মাথায় হাত বুলিয়ে মিষ্টান্ন ভোজনের ব্যবস্থা করেছে। তাই দেশে দেশে মানুষের যত্নে-করা যত্নে-রাখা ফল-বাগানের ছড়াছড়ি। —কিন্তু হায়রে কানা পদ্ম-লোচন! সুফলা বাংলার ফল-বাগান কোথায়?

যাই হোক, প্রকৃতির ব্যবস্থার মধ্যে মানুষে-গাছে ফল সংক্রান্ত

চুক্তিটা সমবায়-সম্বন্ধের একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত—কোনো পক্ষের লোকসান নেই—উভয়েরই লাভ।

চোরের উপর বাটপাড়ী ক'রে উদ্ভিদ-খেকো জন্তু মেরে খাওয়া বাদ দিলেও দুধ ডিম খাওয়া, রোঁয়া-পালক পরা, আরো পাঁচ কাজ আদায়ের কারণে পশুপাখীর সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ রাখতে হয়। পাশ্চাত্য দেশে গোরুর পালের চাকচিক্য দেখলে চোখ জুড়োয়, মানুষের যত্ন-চেষ্টায় তাদের দেহ বংশ দুই বৃদ্ধি পাচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না; স্বীকার করতে হয়, সেখানে দুধ দিয়ে গো-জাতি যথেষ্ট প্রতিদান পাচ্ছে। কিন্তু পূজিত গো-মাতার দেশে তার ক্ষীণ খর্ব দেহ, তার বাছুরের হাড়-সার দশা দেখলে দরদীর দুধ খাবার রুচি উড়ে যায়। পূরো খেতে না দিয়ে অতিরিক্ত খাটিয়ে আধ-মরা ক'রে রাখার যে-অহিংসা তার চর্চা না ক'রে বরং ওরকম ভব-যন্ত্রণা থেকে সংক্ষেপে নিষ্কৃতি দেওয়াটা বেশী দয়া-ধর্ম্মের পরিচয় কি না, সে প্রশ্ন ওঠে; কিন্তু এখানে তার বিচার নাই বা করা গেল।

তার চেয়ে ঘাসের দিকে চোখ ফেরানো যাক। বুনো অবস্থায় ঘাসের বিচি হবার পরেও বটে আগেও বটে, বনের জন্তুরা খেয়ে মাড়িয়ে তার কর্ম্ম-সারার যোগাড় করে। তা সত্ত্বেও যে বিচিগুলো পেকে উঠতে পায় তাও কতক পাথুরে জমিতে পড়ে শুখোয়, কতক জলে পচে, কতক নানা বিপাকে মারা পড়ে; শেষে হাজার করা দু'চারটে যা সুবিধে মতো জায়গায় আস্ত পৌঁছয়, তারাই ঘাস বংশ বজায় রাখে।

এর তুলনায় ঘাসের শস্য-দাদার আরামের কথা ভাবো। কত খাটুনি দিয়ে তৈরী, কত আগাছা নিড়িয়ে পশুপাখী খেদিয়ে সাবধানে রাখা জমিতে বীজ লাগানো হয়, বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কত রকমের তদ্বির চলতে থাকে। শেষে ক্ষেতের উপর ক্ষেত জুড়ে নধর সবুজের বাহার দেখে,

চাষা ত চাষা, কবির মনেও আনন্দ ধরে না। কে বলবে মানুষে-শস্যে নিন্দের সম্পর্ক।

অনেক স্থলে গাছ দিগ্বিজয় করারও সুযোগ পেয়েছে। মানুষ কত হাজার বৎসর ধরে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত রকম কারণে এক এক দলকে দেশান্তরে যেতে হয়েছে—আজ বলে নয়, আদিকাল থেকে; শুধু কাছাকাছি নয়, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে, নানা জাতের মানুষের যাতায়াতের চিহ্ন আছে,—কখনো আবহাওয়ার হের-ফেরে, কখনো বা মানুষের প্রধান শত্রু মানুষের তাড়া খেয়ে। যারা যখন যেখানে গেছে সঙ্গে নিয়েছে খাবার ফলমূল দানা, তার মধ্যে পথে কিছু প'ড়ে গিয়ে মাটিতে লেগে গেছে, নতুন বসতি করার পর কিছু ইচ্ছে করেও লাগানো হয়েছে।

এ রকম ক'রে গম, ধান, আর কত কি ফলশস্য পৃথিবীর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের আম গেছে মার্কিন দেশে, চীনের লিচু এসেছে এখানে, মর্তমান (Martaban) কলা, বাতাবি (Batavia) মোসম্বী (Mozambique) নেবু, আজও নিজের নিজের নামে আদিস্থানের পরিচয় দিচ্ছে। তার উপর বীজ বাছাই ক'রে, কলম ক'রে, সার দিয়ে নানান উপায়ে ফলশস্যের জাতের উন্নতি করা হয়েছে। জঙ্গলের টোকো এঁসো আম, বাগানের ল্যাংড়া বোম্বাইয়ে দাঁড়িয়েছে। পাহাড়ী বাঁতুরে নাস্পাতি, সুগন্ধী রসালো কাশ্মীরী pear হয়ে উঠেছে। আর শস্য ত সবি রকম-রকম বুনো ঘাস থেকে জাতে তোলা।

মানুষের এত দিনের চেষ্টাচরিত্রে ত এই ব্যাপার ক'রে তুলেছে, তবে USSR-এর এ বিষয়ে আর নতুন দেখাবার থাকলো কি?

আছে, ঢের আছে। এত দিন কি ভাবে চ'লে আসছে জানো? নতুন জায়গায় যে বীজ পৌছলো, তার ঝড়তি-পড়তি আপনি লাগলো

ত লাগলো, হেলায় কিছু বা বিশেষ ভাবে লাগিয়ে দেখা হ'ল, বাঁচলো ত বাঁচলো, নয় ত নতুন মাটিতে অচল ব'লে ছেড়ে দিলে। সার দেওয়ার ব্যাপারও সেই রকমই। হাতের কাছে যে সার আছে, বা জোটে, তাই গাছের গোড়ায় দিয়ে দেখা হ'ল, ফল না পেলে খেয়াল ছুটে গেল, ফল পাওয়া গেল ত বাহাদুরী নিলে।

USSR-এর উদ্যম বল, অধ্যবসায় বল, ধারাবাহিক চেষ্টা বল, সে সব অন্য ধরণের। তারা গাছের চরিত্রই বদলে ফেলতে বসেছে। ভারতবর্ষের রোদে-মানুষ-হওয়া ব্রহ্মচারী, সে যদি তিব্বতের বরফে গিয়ে সাধনায় বসতে পারে, শীত-দেশের লড়াক্কে জাত যদি ধনের লোভে আফ্রিকায় বালির তাতে আড্ডা গাড়তে পারে, তবে ওস্তাদের মতো ওস্তাদের হাতে প'ড়লে গাছই বা নিজের অভ্যেস বদলাতে শিখবে না কেন?

তবে গাছকে শেখাতে হলে অশ্রান্ত অনুসন্ধান চাই, অফুরন্ত পরীক্ষা চাই, অদম্য উৎসাহ চাই, সকলের উপর সমবেত চেষ্টা চাই। USSR-এর এই সব আছে বলেই এতকালের কৃষ্টির বাড়াও তাঁরা অনেক কারদানী দেখাতে পারছেন।

মাথা যতই খাটানো হোক, হাজার পড়াশুনা করা হোক, তাতেই মানুষের পূর্ণ বিকাশ হয় না, আনুরাগ্য-বিনা আনন্দ-লোক লাভ হয় না, সে বিষয়ে অঙ্গিরা ঋষি প্রকারান্তরে সাবধান করে দিয়েছেন। USSR-এর অনুরাগের কি পরিচয় পাওয়া যায়, তা পরে দেখা যাবে। কিন্তু যিনি যে-লোকের আকাঙ্ক্ষা করুন না কেন, আগে ইহলোকের অন্নসংস্থান আবশ্যক। সেই উপদেশ রাজর্ষি জনক হাতে-লাঙ্গলে দিয়ে গেছেন। সে সনাতন দৃষ্টান্ত আধুনিক প্রণালীতে USSR কেমন ভাবে বিস্তার করছেন, তারি কিছু কিছু গল্প এই পালায় করা যাচ্ছে।

শ্রেষ্ঠের তল্লাস

রুষের বিপ্লব নির্বিবাদে হ'তে পায় নি, সে ত ধরা কথা। বাইরের শত্রুদের আক্রমণ এক পক্ষে চলছিলই ; ভিতরেও বাগ্‌ড়া দিচ্ছিল বিরুদ্ধ দল, যাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছেড়ে দিতে হওয়াটা মোটেই উপাদেয় ঠেকে নি ; আর প্রতিপত্তি প্রাধান্য নিয়ে রেষারেষী—তাই বা যাবে কোথায় ? এ সব নিয়ে কাটাকাটি মারামারি থম্‌থমে হ'লে, বিপ্লবী কর্তারা যে-রাষ্ট্রের ভার পেয়ে কাজ চালাতে বসলেন, তার একেবারেই ভগ্ন-দশা।

রুষের সে সময়কার খবরের কাগজ পড়লে অবাক হতে হয়। সহরে ঘাস-গজানো রাস্তার দুধারে পোড়ো বাড়ি ; পল্লীর সব পতিত ক্ষেত আগাছা-ঢাকা ; কারখানার কলে মর্চে ; স্টেশনে সারবন্দী রেলগাড়ি অচল। ধন্য তাঁদের পুরুষকার, যাঁরা ছারখার রাষ্ট্রের ঘোর অন্ধকার রাতে দ'মে না গিয়ে, নগরে নগরে বিজলী দীপ-মালা পরাবার, গ্রামে গ্রামে দুনিয়া-ছাঁকা সেরা ফসল ফলাবার সঙ্কল্প করতে পেরেছিলেন।

খালি ফাঁকা কল্পনা নয়। ঘরে বাইরে সেই অবিরাম অশান্তি সত্ত্বেও সেরা বিজ্ঞানীর দল বাছাই ক'রে, কোন্ জায়গায় কিসের অভাব, যা আবশ্যক তা কোন খানে কেমন ক'রে পাওয়া যায়, সেই খোঁজে তাদিকে লাগিয়ে দিলেন।

সব দেশেই কিছু কিছু বিদেশী গাছ গাছড়া দেখা যায়, কিন্তু সে বিষয়ে মার্কিন-দেশের কাছে কেও নয়। সেখানকার মানুষও যেমন পাঁচ দেশের আমদানী, সে দেশের পর্যটকরাও তেমনি নিজের খেয়াল-মতো নানা জায়গার রকম-বেরকমের গাছ এনে জুটিয়েছে। সেখান থেকে

শেখবার অনেক আছে বটে, কিন্তু খামখেয়ালী ভাবে কাজ করলে USSR-এর চলে না, তাই তাঁরা মার্কিন-দেশের মাছি-মারা নকল করেন নি।

USSR-এর প্রথম দিকে plan ছিল, যে-প্রদেশে যা সহজে হয় সেখানকার বাসিন্দা দিয়ে দেশশুদ্ধ লোকের জন্যে তাই উৎপন্ন করিয়ে চারিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু দেখা গেল তাতে আনা-নেওয়ার হাঙ্গাম অনর্থক বেড়ে ওঠে। চাষ-আবাদই হোক, খনির কাজই হোক, বড় ভাবে করতে গেলে, গোরু ঘোড়া ঠেঙ্গিয়ে কুলোয় না, নানা রকম কল-কব্জা লাগে, কল তৈরীর জন্যে কাছাকাছি কারখানা চাই, শ্রমিকদের টাটকা ফলতরকারী খেতে হ'লে দূর থেকে আনা চলে না। কাজেই সব প্রদেশে সব রকমের বন্দোবস্ত রাখতে হয়।

কর্তাদের কাছে চার দিক থেকে আবদার আসতে লাগলো—

"আমাদের বরফের দেশ ব'লে আমরা কি গমের রুটি খেতে পাব না?"

"আমাদের এখানে পোকার উপদ্রব, ফলে পোকা ধরে না এমন গাছ চাই, নইলে আমাদের ফল খাওয়াই হবে না।"

"কারখানায় কুট্‌নো কোটে কলে, কলের মাপের সমান গোল আলু হয় এমন জাতের বীজ চাই।"

—কত রকমের ফরমাস!

এখন ত আর সম্রাটের গবর্ণমেণ্ট নেই যে, প্রজারা বকাবকি করলে রাজ-দ্রোহ হয়। USSR-এ সকলেই শ্রমিক, শ্রমিকদের দরদ শ্রমিকে বোঝে; তা ছাড়া এত সাধের এত কষ্টের বিপ্লব, বিপ্লবীর ছেলে-পিলেরা রাজার হালে খেয়ে মানুষ না হলে মান থাকবে কেন? তাই USSR-এর চোখা চোখা জিনিষ চাই, তড়ি ঘড়ি চাই, দুনিয়া হাতড়ে বেড়াবার

তর সয় না। ঠিক জিনিষটি যেখানে পাওয়া যাবে, বেছে বেছে সেখানে লোক পাঠাতে হবে।

মৎলবটা ত ভালই। তবে কোথায় কি আছে সেখানে গিয়ে না দেখে আগে থাকতে আন্দাজে লোক পাঠানো, সে কি রকম ?

এ হেঁয়ালীতে বিজ্ঞানী ডরায় না। গণৎকার হিসেবে বিজ্ঞানীর বেশ হাত-যশ আছে।

আগে ত বুধ মঙ্গল শুক্র বৃহস্পতি শনি, এই পাঁচটি বৈ গ্রহ জানা ছিল না। শনির চাল-চলন ঠিক অয়ন-মতো হচ্ছে না দেখে জ্যোতির্বিদ অনুমান করলেন, সে আরো দূরে কোনো অজানা গ্রহের টানে না পড়লে এমন গতিভ্রম হয় না ; আকাশের কোন্‌খানে সে গ্রহের দেখা পাওয়া উচিত তাও গুণে ঠিক করলেন ; তার পর সে দিকে দূরবীণ যেমন তাক করা, অমনি বরুণ (uranus) গ্রহ ধরা পড়া। ক্রমশ এই প্রণালীতে খোঁজ ক'রে দূরে কাছে আরো কত গ্রহ বেরলো।

তেমনি যত রকম মৌলিক পদার্থ জানা ছিল সেগুলিকে পরমাণুর বাঁধুনী অনুসারে ধাপে ধাপে সাজাতে গিয়ে, রসায়ন-বিৎ দেখলেন এক একটা ধাপ ফাঁক থেকে যায়। সে ফাঁকে বসাবার মতো পদার্থ উপস্থিত না থাকলেও, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে ভরসা ক'রে খোঁজ করায় নতুন নতুন ভূতের দেখা পাওয়া গেল।

উদ্ভিদেরও সব শ্রেণী-ভাগ করা হয়েছিল। নীল গোলাপ কেও খুঁজতে বেরোয় নি, কারণ শ্রেণীর মধ্যে তার ফাঁক ছিল না ; কিন্তু হল্‌দে ফুলের মটর রুষে না থাকলেও, শ্রেণীতে তার ফাঁক থাকায় সেখানকার বিজ্ঞানী মনে জানেন কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবে। আমরা দেখে জানি এ দেশেই পেতে পারেন।

কিন্তু ফুলের বাগান করার জন্যে ত USSR ব্যস্ত হন নি ; তাঁরা যে

সব খাদ্যের খোঁজে ছিলেন, তার কি উপায় করা হ'ল সেই হচ্ছে কথা। এই ধর না কেন, এমন এমন গম তাঁরা চান যার কোনোটা বরফের দেশে টিঁকতে পারে, কোনোটা যে দেশে মাসকতক টানা রাত সেখানেও ফলতে পারে, কোনোটা জলের অভাবে বা অতি বর্ষায় মরে না। একাধারে সব গুণ তৈরী না পেলেও, দু'চার রকমের জোড় মিলিয়েও দরকার মতো ক'রে নেওয়া যেতে পারে। মোট কথা নানা গুণের বিচি চাই, যত রকমের পাওয়া যায় তত রকমই চাই।

"পুঁথি গত বিদ্যে" নিন্দের ছলে বলে, কিন্তু কাজে লাগাতে জানলে সে বিদ্যে বড় ফেলা যায় না। যে আমলের হোক, যে ভাষায় হোক, পুঁথিতে গমের বিষয়ে যা কিছু কথা পাওয়া যায়, পণ্ডিতেরা ব'সে গেলেন সেগুলোকে টুঁকে নিয়ে একত্র ক'রতে। নানা যুগের পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে তাদের চলাচলের পথের যে সন্ধান পাওয়া গেল, তাই ধ'রে গমের চিহ্ন খুঁজতে লেগে গেলেন। সব মিলিয়ে গমের যত রকম খবর পাওয়া গেল, তাই এক ভূচিত্রের উপর সাজানো হ'ল; এক এক গড়নের,—গোল, তেকোণা, চৌকো, তারার মতো,—ফুটকি দিয়ে এক এক রকমের গম বোঝানো হ'ল।

কোনো দেশে একটা শস্যের চাষ অনেক কাল ধ'রে চলতে থাকলে, প্রকৃতির নিয়মে সেখানে তার নতুন নতুন জাত উদ্ভব হ'তে থাকে; ক্রমে সেখানে তার হরেক রকমের নমুনা দাঁড়িয়ে যায়—আমাদের দেশে ধান চালের যেমন হয়েছে।

পরে আদি-স্থান থেকে দেশান্তরের যাত্রীরা শস্যের দানা সঙ্গে নেওয়ায় তার প্রচার কি রকম ক'রে হয়, তা ত দেখা গেছে। কিন্তু সব জাতের দানা নেওয়াও হয় না, যা নেওয়া হয় সব মাটিতে পড়েও না, যা পড়ে সব লাগেও না। এর থেকে এই তত্ত্বটুকু উদ্ধার হয়,

কোনো শস্যের যেখানে সব চেয়ে রকম বেশী, সেটাই তার আদি স্থান।

গমের ফুটকি চিহ্ন বসানো যে ভূচিত্রের কথা বলা হয়েছে, তাতে দেখা গেল ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম কোণে, আফগানিস্থানের এলাকায়, যত রকম ফুটকির ভারি ঠাসাঠাসি। নক্সার উপর অন্য যে দিকেই লাইন টানা যায়, তা ধরে চল্লে ফুটকির রকম ক'মতে থাকে, দূরে মাত্র দু'এক রকমে গিয়ে ঠেকে। বোঝা গেল কোথায় গমের আদি স্থান,—সব রকম গমের বীজ যোগাড় করতে হ'লে যেতে হবে সেই আফগানিস্থানে।

এই যুক্তি অনুসারে নানা বীজের আদিস্থান বেরলো। ১৯২৪ সালে দলে দলে বিজ্ঞানী খানা-তল্লাসে রওনা হলেন এক এক বীজের আদি-স্থানে। যাঁরা গম আনতে আফগানিস্থানের দিকে বেরলেন, তাঁদের রোজনামায় দেখা যায় কি অদম্য উৎসাহে অশেষ কষ্ট সহ্য ক'রে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে দিয়ে তাঁদিকে কেমন ক'রে চলতে হয়েছিল।

তৈরী রাস্তা প্রায় কোথাও পাননি, স্রোতার উপর দিয়ে সাঁকো নেই, অনেক স্থলে পা পাতবারই জায়গা পাওয়া যায় না। হিংস্র জন্তুর কমতি নেই, মানুষ ডাকাতেরও বাড়াবাড়ি। কাজেই অল্পে অল্পে অতি সাবধানে সন্তর্পণে এগোতে হয়েছিল—কোথাও রামচন্দ্রের মতো তড়বড়ে পাহাড়ী প্রপাতের উপর সেতুবন্ধ ক'রে, কোথাও হনুমানের মতো পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে, কিম্বা পাহাড়ের গায়ে ঝুলতে ঝুলতে। মাঝে মাঝে ঘোড়া থেকে নামিয়ে বোঝা নিজে বইতে হয়েছে, কতবার জিনিষপত্র খদে গড়িয়ে পড়েছে; এক এক স্থান এমন দুর্গম যে, আধঘণ্টা অন্তর পরামর্শে ব'সে তবে এক পাহাড় থেকে পরের পাহাড়ে যাবার উপায় হয়েছে।

শেষে এক কাফিরের দেখা পেয়ে, তাকে কিছু বক্‌সিস কর্‌লে তাকে পথ দেখাতে রাজি করানো হ'ল। তাও সে এক গ্রামের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে দে-পিট্টান—আর এগোতে সে সাহস পেলো না।

পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গায়ে গায়ে গ্রাম বল নগর বল, যে-সব ছোট ছোট বসতির মধ্যে বিজ্ঞানীর দল অবশেষে পৌঁছলেন, সেগুলি অপরূপ—যেন বহুরূপীর দেশ!

সেখানকার লোকগুলোর কত ছাঁদের চেহারা,—কেও বা ফরসা, কটা চুল-দাড়ি; কেও বা কাফরীর মতো কালো, চুল কোঁক্‌ড়া। আর কত ঢঙের পোষাক,—কারো ফুলো পাজামা, কারো কষা ইজের; কারো গায়ে আলখাল্লা, কারো খাটো কুর্তা, কারো বা পরণে আস্ত ছাগল-ভেড়ার চামড়া। ভাষাও সেই মতো রকমারি,—কেও সূর্যকে বলছে আফ্‌তাব, কেও য়েল্মার, কেও বা সুন। কোনো গ্রামের লম্বাই চওড়াই নেই, কেবল খাড়াই, পায়রার খোপের মতো ঘরগুলো পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছে, এক এক ঘর পাহাড়ের মধ্যে এক এক গর্ত, মাথার উপর একটু বারাণ্ডা বার-করা।

এমন আজব দেশ ভুঁই-ফুঁড়ে ওঠে নি,—এ হাল সেকালের গুণ্ডা-রাজাদের বিজয়-কীর্তি। অসুরীয় (Assyrian) যোদ্ধা থেকে আরম্ভ ক'রে সিকন্দর (Alexander) বাদসা, জঙ্গীস খাঁ, অনেকেই ভারতের ধনের লোভে হিন্দুকুশের পথ দিয়ে আনাগোনা করেছে, কত জাতের সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে নিয়ে। বিজয়ের মজা মারলেন ত কর্তারা, হেজিপেজি দলবলের ক্লেশের একশেষ। তাদের মধ্যে অনেকে ফিরে যাবার যন্ত্রণা-ভোগ এড়াবার জন্যে পাহাড়ের গুহাগহ্বরের মধ্যে লুকিয়ে রয়ে গিয়েছিল। আর আশপাশের উপত্যকায় যে সব বুনো চাষী, তারাও অনেকে বিদেশী সেনার উৎপাতে পাহাড়ের ভিতর পালিয়ে এসেছিল। বর্বরজাতের

যেমন হয়, নতুন কিছু নিতে জানে না; অভ্যস্ত আচার বিচার আঁকড়ে থাকে,—এরা সবাই সেই রকম, থাকলো কাছাকাছি, কিন্তু মিশলো না, বদলালো না, এগোলো না, এখন পর্যন্ত তখনকার নমুনা হয়ে রইলো।

পাহাড়ের ধাপে, স্রোতার ধারে ধারে, এদের যে সব ছোটো ছোটো ক্ষেত কালো পাথুরে জমির উপর সবুজ-বুটির মতো দেখা দিলো, সেগুলি বিজ্ঞানীরা যে রকম অনুমান ক'রে এসেছিলেন, ঠিক তাই—রকম বেরকম গমে ভরা—নরম দানার, কড়কড়ে দানার, গোল দানার, লম্বা দানার, কোনোটায় জল দেওয়া লাগে না, কোনোটা উৎকট শীতে দানা পাকায়। আর সেখানকার হাটবাজারগুলো ত ফল-তরকারীর প্রদর্শনী বল্লেও হয়,—এত রকমের কাঁকুড় ফুটি খরমুজ তরমুজ ডালিম বেদানা গাজর সালগম মূলো শাকসব্জী,—জংলী থেকে আরম্ভ ক'রে উৎকৃষ্ট জাত পর্যন্ত বাজারে পাশাপাশি রাখায় নিজের নিজের অভিব্যক্তির ধারা দেখিয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞানীরা আশ মিটিয়ে বস্তা বস্তা বীজ সংগ্রহ করলেন।

বিজ্ঞানীর যত দল দেশে দেশে বেরিয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা শেষে যে-যার অহিংস্র-লুঠের ভার নিয়ে স্বস্থানে ফিরে এলেন। আফগানিস্থান থেকে ৭০০০, পশ্চিম এসিয়া থেকে ১০০০০, মধ্য-এসিয়া থেকে অগুন্তি, মার্কিন-দেশ থেকে আলুর যত জাত আছে, সব মিলিয়ে লাখো রকমের বীজ এসে হাজির; সেগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন মাটি-আব-হাওয়ার প্রদেশে পরীক্ষার জন্যে চারিয়ে দেওয়া হ'ল। যত্ন তদ্বিরের ত্রুটি ছিল না, তবুও পরীক্ষায় পাস হ'ল অল্পই,—যেমন এক জাতের গাছ বরফের তলায়ও বেশ বড় বড় আলু গজাতে লাগলো, মেরুর ধার পর্যন্ত সালগমে কপিতে ছেয়ে গেল, নতুন নতুন গমের জাত এখানে ওখানে লেগে গেল—কিন্তু বেশির ভাগ হ'ল ফেল।

কতক রকমের আয়েবের ওষুধ হতে পারে,—শুখনো মাটিতে জল

আনা যায়, লম্বা দিনের অতিরিক্ত আলো ছাউনি দিয়ে কমানো যায়, লম্বা রাতের অন্ধকার বিজলি বাতি দিয়ে ঘুচিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু ওষুধের উপর নির্ভর ক'রে জীবন-যাত্রা চালানো মুস্কিল, তার খরচও বেজায়; উপযুক্ত অভ্যেসের জোরে শরীর রাখতে না শিখলে চলে না। অবশ্য বুড়ো-ধাড়িকে শেখানো যায় না, শিক্ষার ফল পেতে হলে ছাত্রকে কচি-বেলায় হাতে নিতে হয়।

গাছকে শেখাবার বিষয়টা কি ?—শাস্ত্রে যাকে বলে তিতিক্ষা,—তার মানে শীত গর্মি, ক্ষিধে তেষ্টা, যখন যা ঘটে, অম্লান বদনে বর্দাস্ত করা। তা শেখাতে হ'লে গাছের বীজের জন্যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম খোলা দরকার,—করা হলও তাই।

আশ্রম স্থাপন হ'ল এক লম্বা চালা-ঘরে। তোড়যোড়ের মধ্যে জলের চৌবাচ্ছা, বালতি ঝাঁঝ্‌রী কোদাল নিড়ানী দাঁড়ি-পাল্লা আর বিশেষ ক'রে তাপমান যন্ত্র; আয়োজনের মধ্যে ইচ্ছে মতো ঘরটাকে ঠাণ্ডা গরম আলো অন্ধকার করার বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম। এই আশ্রমে গমের বীজকে কি ভাবে ঠাণ্ডা সওয়ার সাধনা করালো, তার রিপোর্টটা দেখা যাক।

মাটিটাকে কুপিয়ে আল্গা ক'রে তা'তে এক পত্তন বীজ পোঁতা হ'ল। ঘরটাকে বরফের চেয়ে চার ডিগ্রী ঠাণ্ডা ক'রে রাখা হ'ল। মাটির ঢাকার মধ্যে বীজগুলো গরম হ'তে না পায় সে জন্যে মাঝেমাঝে মাটি আঁচ্‌ড়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল। জলের ছিটে দিয়ে দিয়ে বীজকে তাজা রাখা হ'ল। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় জমে যাবার মতো হ'লে কাপড় চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। এ রকম কৃচ্ছ্রসাধনের পর বসন্ত কালে যে বীজের চারা বেরলো, সেগুলিকে কিছু উত্তর দেশের কিছু দক্ষিণ দেশের মাঠে রোপন ক'রে বাইরের সংসারে বার ক'রে দেওয়া হ'ল।

ডান হাত বরফ জলে, বাঁ হাত গরম জলে ডুবিয়ে রেখে দুই হাত সমান-জলে দিলে সে জল ডান হাতে গরম, বাঁ হাতে ঠাণ্ডা লাগবে,—তার মানে জীবের বোধ-শক্তি তাপমান যন্ত্রের মতো কাজ করে না। উত্তর দেশের বসন্তের গোড়ায় রোদের তাপ প্রায় না থাকলেও, বরফী-শীতে পালন-করা গমের চারা সেই টুকুই পর্য্যাপ্ত বলে মাথায় ক'রে নিলো, তা'তেই তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠায় বেশী শীত পড়ার আগেই শীষ ধ'রে পেকে গেল। বরফ পড়লে কি হবে না হবে সে সমস্যা মিটে গেল, লম্বা রাতের ভাবনাও আর ভাবতে হ'ল না। দক্ষিণেও শীতের সময় জলের অভাব হয়, সেই শুখো পড়ার আগেই সেখানকার গম কাটা সারা। ঠিক ওষুধ পড়লে সে সব দিক দেখে নেয়।

মানুষের বেলায়ও কি তাই হয় না? যে ছেলে কষ্ট স'য়ে মানুষ হয়েছে, সে বড় হ'য়ে অল্পে সন্তুষ্ট থাকে, মজবুত শরীর-মন নিয়ে সংসারে তেড়েফুঁড়ে ওঠে, পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দান নিয়ে বেশ আনন্দে থাকতে পারে, বিলাসের খরচ যোগাবার জন্যে শরীর পাত ক'রে তাকে অকালে বুড়িয়ে যেতে হয় না।

তবুও একটা কথা বাকি রইলো। দরকারী অভ্যেস কচি বয়সে করাবার কথা বলা হয়েছে। তার চেয়ে বেশী ফল হয় যদি আরো আগে ছাত্রকে ধরতে পারা যায়। বুদ্ধিতে বৃত্তিতে সুশিক্ষিত *কনে'কে যদি উপযুক্ত বর দেওয়া যায়, ছেলে পেটে থাকতে যদি মাকে সুস্থ সবল

---

* বিচার ক'রে কাজ করার অভ্যাস হ'লে বুদ্ধিকে সুশিক্ষিত বলা যেতে পারে; আর বৃত্তিকে সুশিক্ষিত বলা যায় যদি সব অবস্থায় রস টানতে পারে, বিশেষত নীর থেকে ক্ষীর তোলার মতো সুখ-দুঃখ মেশানো সংসার থেকে সুখটা ছেঁকে আদায় করে নিতে পারলে।

প্রফুল্ল রাখা হয়, তাহলে বংশের উন্নতি মারে কে ? একথা মানুষ পশু পাখী পোকা গাছ সবেতেই খাটে।

বিধাতার দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট থাকা আমাদের দেশে একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়েছে ; এভাবে স্বাধীন চিন্তা দূর করার সঙ্গে সঙ্গে লাভের মধ্যে বুদ্ধি-বৃত্তি সুখ-শান্তি সবেতেই জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। ক'রে খেতে না শিখিয়ে মেয়েটাকে বলে অরক্ষণীয়া, শেষে তাকে দেয় যে-সে পাত্রের হাতে ফেলে, তার ভোগ যখন ভুগতে হয় তখন কপাল চাপ্‌ড়ে বলে "অদৃষ্ট"। বিয়ের পর পুত্র কন্যার প্রবল বন্যা রোখ্‌বার চেষ্টা না ক'রে তাদিকে বলে বিধাতার দান ; এ দিকে বাপের রোজগারে কুলোয় না, মায়ের শরীরে বয় না, কাজেই সন্তানের শিক্ষাদীক্ষা আয়ু সবেরই কমতি পড়ে যায়। ফলে সংসারটা যেরকম নরক হ'য়ে দাঁড়ায় তার উপযুক্ত নাম মনে না এলেও, গলা ছেড়ে টেবিল চাপ্‌ড়ে বলা যেতে পারে যে তার কাছে ছেলে-না-হওয়ার পুন্নাম নরক ছেলেখেলা !

USSR-এর ভাব এর ঠিক বিপরীত। পূর্বজন্মের বা দুর্দৈবের উপর দোষ দিয়ে ব'সে ত তাঁরা থাকেনই না, উল্টে নিজের পুরুষকারের জোরে জন্মের পূর্ব থেকে দোষবর্জন গুণবর্দ্ধন কেমন ক'রে করা যায়,সেই চেষ্টাতেই তাঁরা আছেন। তারি কিছু কথা এবার বলা যাক—তা'তে আমাদের হাহাকার ঘোচাবার উপায় যদি নাও হয়, তাঁদিকে বাহবা দেবার সুখটা ত পাওয়া যাবে।

কুলশীলের রহস্য

Drosophila নামে কলা-খেকো এক রকম মাছি হয়, বিজ্ঞানীরা তাই পুষতে লেগে গেলেন। রাম! রাম! ও কেমন ধারা? শেষটা মাছি খাবে না কি?

আরে, ব্যস্ত হ'ও কেন, অমন তড়বড় ক'রে সিদ্ধান্তে ঝাঁপিয়ে পড়া ভাল নয়। খাবার জন্যে পাঁঠা পোষে ব'লে আর কোনো কারণে কিছু পুষতে নেই বুঝি? মাছি পোষার কত সুবিধে একবার ভেবে দেখ। প্রথমত রাখতে বেশী জায়গা লাগে না, লোহার জালের একটা বাক্সে হাজারে ধরে; দ্বিতীয়ত খাইখরচ নেই বল্লেও হয়, এক পয়সার খোরাকে অনেক দিন চলে; সবের উপর ওরা দশদিন বয়সে ডিম পাড়তে সুরু করে, একমাস না যেতে মাছি হয় দিদিমা।

তাহলে প্রমাণ হ'ল কি, না—

মাছি সহজে বাড়ে
মাছি সস্তায় বাড়ে
মাছি ঝটপট বাড়ে—

আহা, ওকথা এত আড়ম্বর ক'রে নাই বা বোঝালে, মাছি বাড়িয়ে কি হবে সেইটে খুলে বলো দেখি।

তবে বলি শোনো।

মাষ্টার মশায়কে যে জন্যে মাইনে দেওয়া, মাছি বংশকে সেই জন্যে গ্রাসাচ্ছাদন যোগানো,—উদ্দেশ্য, বিদ্যেলাভ। মাছির মহা ভাগ্যি, মানুষকে ওরা প্রজনন-তত্ত্ব শেখাবার Chair পেয়ে গেছে।

প্রজনন-তত্ত্ব কথাটা যেমন কটো-মটো, বিষয়টাও তেমনি—ভাগ্যিস ওর মধ্যে ঢোকার কোনো আবশ্যক নেই! USSR-এর যন্ত্র-চালানো

আমাদের বোঝা নিয়ে বিষয়, তার জন্যে যেটুকু দরকার, তাই শাদা ক'রে ভাবার চেষ্টা করা যাক।

বাপের মতো হাত, কি মায়ের মতো নাক, এ সব সন্তানে পেয়েই থাকে ; তবে হাত-ভাঙা বাপের নুলো ছেলে, কি নাক-কাটা মায়ের বোঁচা ছেলে, তা হয় না। আবার সন্তানের এমন গুণ-দোষও দেখা যায়, যা মা-বাপে নেই। এই হের-ফেরের হিসেবটা পেলে তবেই বোঝা যাবে একটা প্রাণী-কুলের ভিতর কোনো বিশেষ গুণ আনতে হলে তার কি উপায় করা যায়।

প্রাণীর দেহ কত অগুন্তি, কত রকম-বেরকমের কোষ দিয়ে গড়া ; সে দেহ ত মা-বাপের কাছ থেকে সন্তান আস্ত পায় না, পায় শুধু একটি যুগল জনন-কোষ। জনন-কোষ বলতে দেহের নিভৃত স্থানে কতকগুলি বিশেষ কোষ, যারা স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে অর্দ্ধাঙ্গ অবস্থায় থাকে। সুযোগ পেয়ে দু' রকম দুটো জনন-কোষের মিলন হ'লে একটি পূর্ণাঙ্গ কোষ হ'য়ে, সে আলাদা জীবন আরম্ভ করে, পিতৃকুল মাতৃকুল দুই দিক থেকে পাওয়া গুণ অনুসারে নতুন দেহ গ'ড়তে থাকে।

আরো একটু কথা আছে। অশরীরী গুণ-গুলি সন্তান-কোষে চলে আসে না,—সে মা-বাপের জনন-কোষ থেকে পায় শুধু গুণের কারিগর। জনন-কোষগুলি নিজেই এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীণ দিয়ে কষ্টে দেখা যায়। তাদের মধ্যে আবার গুণের জননিকা (genes) যেগুলি আছে, তারা অণুর তুলনায়ও অণু, তারা ধরা পড়েছে মনোবীণ দিয়ে, অর্থাৎ যুক্তির জোরে। এই জননিকাগুলির ক্রিয়ায় সন্তানের নতুন দেহ বংশের সনাতন দেহের সাদৃশ্য পায়।

এই জননিকা-সমেত জনন-কোষগুলি দেহের নিভৃত স্থানে থাকায়, বাইরের আঘাতে দেহের অন্য কোষগুলি জখম হ'লেও সেখানে সে

চোট গিয়ে লাগে না, তাই তার ফল সন্তানে বা বংশের ধারার মধ্যে পৌঁছয় না।

তা যেন হ'ল, কিন্তু অন্তত বংশের যত রকম দোষগুণ, প্রত্যেক সন্তানে তা পায় না কেন? সে কতক বাপের দিক থেকে, কতক মায়ের দিক থেকে বেছে নেয়; মা-বাপে যা দেখা যায় না এমন গুণও পায়,—এ রকম হয় কি ক'রে?

গোড়াকার কথা এই যে, যখনই স্ত্রী-দেহে পুরুষ-দেহে জনন-কোষ-গুলি অর্দ্ধাঙ্গ হয়, তখন থেকেই গুণের একটা বাছাই ঘটে, যার দরুণ তাদের মধ্যে জননিকার সমান ভাগ-বাঁটোয়ারা হয় না। ঠিক কি রকম ক'রে কি হয় বর্ণনা করার চেষ্টা করতে গেলে আলাদা ক'রে দেহ-তত্ত্বের পালা গাইতে হয়, তার অবসর ত এখানে নেই। তবে একটা কৌশল করা যেতে পারে।

কথায় বলার চেয়ে অনেক সময় নক্সা দেখিয়ে সহজে বোঝানো যায়। তন্ত্র-শাস্ত্রে যন্ত্র ব'লে এক রকম নক্সার সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব বোঝাবার প্রণালী আছে। অত বড় কথায় কাজ কি, একটা বাড়ী তৈরি করতে হ'লে কাগজের উপর রেখার ঘর কেটে, এখানে ওখানে চিহ্ন বসিয়ে কি রকম বাড়ী চাই তা রাজমিস্ত্রীকে বেশ বুঝিয়ে দেওয়া যায়,—যদিও মাটির তলায় থাকবে ভিত, উপরে উঠবে দেয়াল, কোথাও লাগবে ইঁট কোথাও কাঠ কোথাও লোহা,—আসলে-নক্সায় চেহারার মিল কিছুই থাকবে না।

সেই রকম একটা রূপক দিয়ে বংশধরদের মধ্যে গুণের যাওয়া আসার হেরফের বোঝাবার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, আসলের সঙ্গে রূপকের রূপের মিল থাকবে না, সূক্ষ্ম-খেলা সহজে স্পষ্ট করতে হলে স্কেল বদলে মোটামুটি দেখাতে হবে।

জনন-কোষগুলোকে এক একটা গ্রামের মতো ভাবা যাক, যার মধ্যে গুণের জননিকাগুলি যেন তাঁতি ছুতোর কামার কুমোর কাঁসারি, পাঁচ রকমের কারিগর। তার পর মনে করা যাক, কর্ত্তৃপক্ষের একটা নতুন গ্রাম পত্তন করার ইচ্ছে হয়েছে।

হুকুম জারি হ'ল—"(ক), (খ), এই দুই গ্রাম থেকে পাঁচ রকমের পাঁচ জন করে, মোট দশ জন কারিগর সদরে পাঠানো হোক, তার মধ্যে থেকে পাঁচজন বাছাই করে (গ)-গ্রামে বসানো হবে।"

এই পাঁচ জোড়া কারিগর জড়ো হ'লে তাদিকে একটা অন্ধকার ঘরে পোরা হ'ল, যার দরজা কোন্ দিকে তারা কেও জানে না। হাত্‌ড়া-হাত্‌ড়ি করে দরজা পেয়ে সেখান থেকে প্রথমে যে পাঁচজন বেরিয়ে এল, তারা যে যার বাড়ী ফিরে গেল। যে পাচজন পিছিয়ে থেকে আটক প'ড়ে গেল, তাদিকে পাঠানো হ'ল (গ)-গ্রামে বাস করতে।

এই যে অন্ধকারে-ঢিল-মারা গোছের কারিগর বাছাই, নতুন গ্রাম-সম্পর্কে এর ফলাফল একটু ভেবে দেখা যাক।

প্রথমেই ত বোঝা যাচ্ছে যে, (গ)-গ্রামে পাঁচজন গেল বটে, কিন্তু তারা পাঁচরকমের কারিগর নাও হতে পারে। অন্ধকারে ঠেলা-ঠেলির পর হয় ত (ক)-(খ)-গ্রামের দুই তাঁতি নতুন গ্রামে যাবার দলে ধরা প'ড়লো, দুই কামারই ছাড়া পেয়ে নিজের গ্রামে ফিরে গেল। গুণতিতে ঠিক রইলো, রকমে হ'ল বেশ'কম। সে অবস্থায় প্রথম ফল এই দেখা যাবে যে, (গ)-গ্রামে তাঁতের কাজ চলবে জোরে, কিন্তু সে গ্রামের লোককে লোহার জিনিস বাইরে থেকে কিনে আনতে হবে।

আবার ধর, (ক)-গ্রামের তাঁতি বোনে শুধু মোটা ধুতি, (খ)-

গ্রামের তাঁতি ফুল-পেড়ে সাড়ী বুনতে জানে; অথচ (গ)-গ্রামে তাঁতের সরঞ্জাম মোটে একপ্রস্থ। নতুন গ্রামে ফুল-পেড়ে সাড়ী ক'জনেই বা কিনতে পারবে, মোটা ধুতির বেশী কাটতির আশা দেখে তু'জনে মিলে' ঐ কাজেই লেগে গেল। তবুও (খ)-গ্রামের সে তাঁতি থাকায়, (গ)-গ্রামে ফুল-পাড় বোনার বিদ্যেটা চাপা থাকলেও মারা প'ড়লো না। যা হোক, দ্বিতীয় ফল এই দেখা যাবে যে, (গ)-গ্রামে মোটা ধুতির কারবার জেঁকে উঠলো।

তৃতীয় ফল প্রকাশ পেতে পারে যখন (ঙ)-গ্রাম পত্তনের বেলা (গ)-(ঘ)- গ্রামের উপর কারিগর জোগাবার ভার পড়বে। (ঘ)-গ্রামের তাঁতি হয়ত গামছা ছাড়া কিছুই বুনতে পারে না, অথচ বাছাইয়ের গোলমালে সে নতুন গ্রামে গেলই না, সেখানে পৌছল একা ফুল-পাড়-বোনা তাঁতি। তা'তে (ঙ)-গ্রাম হঠাৎ হ'য়ে উঠবে ফুল-পেড়ে সাড়ীর মোকাম। সাধারণ লোকে তাজ্জব হ'য়ে বলাবলি করতে পারে—"মোটা ধুতির গ্রামের আর গামছা-বোনা গ্রামের কারিগররা বসলো (ঙ)-গ্রামে,—সেখানে ফুল-পাড় তৈরীর বিদ্যেটা এল কোত্থেকে?" গ্রাম-পত্তনের ইতিহাস যে গোড়া-থেকে জানে, সেই এ রহস্য ভেদ ক'রে দিতে পারবে।

এমনও হতে পারতো যে (ঙ)-গ্রামে (গ)-(ঘ)-গ্রাম থেকে তু'রকমেরই তাঁতি পৌছল। সে অবস্থায় গামছায় খাটুনি কম কাটতি বেশী (বিজ্ঞানের ভাষায় এ গুণ dominant) হওয়ায় ফুল-পাড়ের বিদ্যেটা আবার চাপা পড়লো (বিজ্ঞানের ভাষায় recessive হল) কিন্তু তবুও ম'রলো না। তাহলে হয় ত এ রকম ভাবে চাপা পড়তে পড়তে (চ)-(ছ)-(জ)-(ঝ)-গ্রাম পেরিয়ে (ঞ)-গ্রাম পত্তনের সময় ফুল-পাড়-বোনা তাঁতি নিজের বিদ্যে জাহির করার সুবিধে পেলো। তত দিন পর এই

ফুল-পাড়-ধারার গোড়া খুঁজে বার করতে ঐতিহাসিকেরও ধাঁধা না লেগে যায় না।

এই রূপক আরো খেলিয়ে চল্লে, অনেক রকমের হেরফেরের অন্ধিসন্ধি পাওয়া যেতে পারে। আপাতত যেটুকু বলা হ'ল, তাতেই আমাদের এ পালার কাজ চলবে।

জটিলতা কমাবার জন্যে আমাদের এই রূপকে মাত্র পাঁচ রকম কারিগরের কথা বলা হয়েছে। আসলে মানব-দেহে বিশ-পঁচিশটা আলাদা রকমের জননিকা ক্রিয়া করতে থাকে, তার দরুণ ফলাফলও খুব ঘোরালো হয়। এমনও দেখা যায়, মা বুদ্ধিমতী, বাপও ধীরস্থির, অথচ মা বা বাপ কারো ছিটগ্রস্ত পিতামহ বা মাতামহের একটি জননিকা বংশপরম্পরার ভিতর দিয়ে ঘুরে ফিরে এসে পড়ায়, এদের এক ছেলে হ'ল পাগল। আবার বাপ শাদাসিধে, মা পাঁচপেঁচী, অথচ বংশের দুই দুই ফ্যাঁকড়া ধরে নানা গুণ দৈবাৎ এক দেহে জুটে পড়ায়, ছেলে হ'ল মহাপুরুষ।

পূর্বপুরুষদের গুণাগুণ খোঁজ ক'রে বার করা যায়, বংশধরদের গুণাগুণ ত দেখতেই পাওয়া যায়, মাঝপথের গুণ বাছাবাছি ব্যাপার ঠিক-মতো জানা নেই বলে' আমাদের নক্সায় অন্ধকার ঘরের কথা বলা হয়েছে। কোন্ ঘটনার পর কোন্ ঘটনা হয় জানা থাকলে বলা হয় নিয়মে চলছে; নিয়ম না জানা থাকলে বলে দৈবাৎ ঘটেছে। সৃষ্টির প্রকরণ সম্বন্ধে মানুষের বিদ্যে যত বাড়ছে, ততই জগৎ-প্রবাহ দৈবের রাজ্য থেকে নিয়মের এলাকায় এসে প'ড়ছে।

কুলের মধ্যে শীলের লুকোচুরি খেলাটা মাঝে মাঝে অন্ধকারের আড়ালে হতে থাকলেও, তার যতটুকু জানতে পারা গেছে তা দিয়ে জাত-বদলের কাজ মোটামুটি চালানো যায়। ফরসা বর-ক'নে ক্রমাগত

মিলিয়ে চল্লে ফরসা পরিবার দাঁড়িয়ে যাবে—সে কথা সবাই জানে। লাল গোরুতে শাদা গোরুতে জোড় মেলাতে থাকলে পর পর কতকগুলি লাল, কতকগুলি শাদা, কতকগুলি মাঝামাঝি রঙের বাচ্ছা হবে, তাও গুণে বলার প্রণালী বিজ্ঞানীরা বার করেছেন। পাহাড়ী শক্ত নাস্পাতির সঙ্গে নীচের রসালো ক্ষীণজীবী নাস্পাতি মিলিয়ে মজবুত অথচ সুস্বাদ নাসপাতির জাত তৈরী হয়েছে। আবার কখনো বা উল্টো উৎপত্তিও হয়ে পড়ে; তলায় মূলো উপরে কপি হবে আশায় দুই গাছ মেলাতে গিয়ে শিকড় হল কপির মতো, পাতা হ'ল মূলোর!

গাছের পুংকোষ থাকে ফুলের রেণুর মধ্যে, স্ত্রী-কোষ থাকে ফুলের তলায় একটা বিশেষ আধারে। স্বাভাবিক অবস্থায় রেণু চালাচালির কাজ মৌমাছিতে বা অন্য পোকায় করে, তারা মধু'র ঘটক-বিদায় পায়। মানুষের ইচ্ছেমতো জোড় মেলাতে হ'লে, তুলি দিয়ে রেণু তুলে নিয়ে স্ত্রী-কোষের আধারে দিয়ে দিতে হয়।

আমাদের দেশের সেকেলে ঘটকেরা পাত্র-পাত্রীর লক্ষণ মিলিয়ে, বিয়ে দেবার উপযুক্ত কি না ঠিক ক'রে দিতো। আজকাল গাছের ওস্তাদেরাও গাছের আবশ্যকমতো জাত তৈরী করার উদ্দেশ্যে লক্ষণ দেখে গাছের জোড় মেলায়। বিদায় হবার পর ঘটকের ভুল ধরা পড়লে সে থোড়াই কেয়ার ক'রতো, কিন্তু গাছের ওস্তাদ ফলোদয় না হওয়া পর্যন্ত কাজে লেগে থাকে। ভুলের পর ভুল হ'লেও সে দমে না, বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এ গাছ ও গাছ সে গাছে মিলিয়ে যা চায় তা পাবার চেষ্টা ছাড়ে না। দোষের মধ্যে এতে বড্ড সময় লাগে। বৎসরান্তে যতক্ষণ আবার ফুল না ফোটে, নতুন পরীক্ষায় হাতই দিতে পারা যায় না।

জনন-কোষ বা তার ভিতরের জননিকার উপর বাইরের ঘটনার প্রভাব যে একেবারেই পৌঁছয় না, তাদের কোনো রকমেরই পরিবর্তন হয়

না, তা ত নয়। মানুষ ও-বিষয়ে হাত লাগাবার আগেই প্রকৃতির মামুলী নিয়মেই কত নতুন নতুন উন্মেষ প্রকাশ পেয়েছে। নইলে আদি পক্ষী-জোড়ার বংশধরদের মধ্যে রাজহংসই বা ধবধবে শাদা, ময়ূরই বা রং-বেরঙে চিত্রিত হ'ল কেমন ক'রে? এ পর্যন্ত প্রাণীদের জাত বদলানো সম্বন্ধে ত প্রকৃতিরই অপেক্ষা ক'রে চলতে হ'য়েছে। দৈবাৎ কোনো সুবিধে-জনক নতুন গুণ জন্মাতে দেখলে তবেই তাকে জাতের মধ্যে কায়েম করার তদ্বির করা হয়েছে,—যেমন এক মেষপাল একটি খাটো পায়ের বিকৃত বাচ্ছা পেয়ে তাই দিয়ে বেঁটে ভেড়ার জাত গ'ড়ে তুল্লো, যারা বেড়া টপ্‌কে পালাতে না পারায় তাদিকে বেশ সহজে আগ্‌লে রাখা যায়। তবে প্রকৃতিকে নিজের চালে চলতে দিলে এক আধটা নতুন গুণ জাতের মধ্যে ব'সে যেতে, অভিব্যক্তির পথে জাতের দু'এক পা এগোতে, যুগের পর যুগ কেটে যায়।

সংস্কার আঁক্‌ড়ে থাকা সম্বন্ধে জননিকাগুলো হিন্দুমানুষকেও হার মানায়। কোনো বিজ্ঞানী একজোড়া বাবুই পাখী খাঁচার মধ্যে পুষে-ছিলেন। স্বাভাবিক অবস্থায় তারা যদিও পোকা খায়, তিনি তাদের জন্যে ছাতু খাবার ব্যবস্থা করেছিলেন আর ঘাসের বোনা বাসার বদলে টিনের কৌটোর মধ্যে তাদের থাকার জায়গা দিয়েছিলেন। তা'তেই তারা বেশ রইলো, জোড় বাঁধলো, ডিম পাড়লো, বাচ্ছা হ'ল। সে বাচ্ছারা ঐভাবেই বড় হ'ল, তাদেরও খাঁচার মধ্যে বাচ্ছা হ'ল। কাজেই এসব বাচ্ছারা পোকা ধরে খাওয়া, ঘাস বুনে বাসা বাঁধা, কিছুই শিখতে পেলো না। কিন্তু সেই বাচ্ছার বাচ্ছাকে যখন খাঁচার বাইরে ছেড়ে দেওয়া হ'ল, তারা প্রথম থেকে ইতস্তত না করেই পোকা ধরে খেতে লাগলো, ঘাস কুড়িয়ে বাসা বাঁধতে লেগে গেল,—যেমন-তেমন বাসা নয়, ঠিক সেই বোতল গড়নের। জননিকাদের মধ্যে পূর্বস্মৃতি বা

সংস্কার (নাম যাই দাও) অটুট ছিল বলেই ত খাঁচায়-মানুষ সে-বাচ্ছাদের পক্ষে এসব করা সম্ভব হ'ল।

মানব-জাতি ডেপুটি-স্রষ্টার পদ পাবার পর, পরিবর্ত্তনের কাজ কতকটা তাড়াতাড়ি এগিয়েছে বটে। খরগোষের মতো জীব অশ্ব হয়ে উঠলো; মানুষের শত্রু যে নেক্ড়ে, সে মানুষের মিত্র কুকুর ব'নে কত রকম জাতের বাহার দেখালো, ঘাসের বিচি গমে ধানে গুলজার হ'ল। তবু এসব হতে সময় নিয়েছে কম নয়; কারণ এ পর্যন্ত জনন-কোষের উপর আক্রমণ, তাদিকে একটু প্রগতিপরায়ণ করার চেষ্টা,—তার উপায় জানাও ছিল না, করাও হয়নি।

সেই জন্যে দশ দিন বয়সে যে মাছি বংশবৃদ্ধি করে, তাদের উপর বিজ্ঞানীদের এত ঝোঁক। কি উপায়ে জাতের মধ্যে বিশেষ গুণ আনতে বা তা থেকে দোষ ছাড়াতে পারা যায়, তার হিসেব পাবার জন্যে এই Drosophila মাছিদের নিয়ে বছরে ছত্রিশবার নাড়াচাড়া করা চলে। মাছিদের স্বচ্ছ নরম দেহ, উপরে কিরণ ফেল্লে ভিতর পর্যন্ত তার তেজ প্রবেশ করে, শরীরের যে-কোনো জায়গায় তেজী আরক ফুঁড়ে দেওয়া সহজ; কোনো কোনো অঙ্গচ্ছেদ করলেও তাদের প্রাণের হানি হয় না।

এখন মাছির উপর X-কিরণ ফেলে বিজ্ঞানীরা তাদের জননিকাকে উত্তেজিত ক'রে তাদের কত রকম চেহারার অদল-বদল করাচ্ছেন—খাটো ডানা, লম্বা ডানা, শাদা চোখ, লাল চোখ, আড়া খুদে বা তেধেড়েঙ্গা; কেও আলোর দিকে ওড়ে, কেও আলো দেখলে পালায়, গুণেরও কত রকম ওলট পালট।

তবে, উপযুক্ত রকম কিরণ বা আরক লাগাতে পারলে, কলার বহরের চালের দানা, কুমড়োর মাপের আলু, একবেলার খোরাক যোগাবার মতো এক একটা আম, এ সবই বা তৈরী হবে না কেন?

মামলার নিষ্পত্তি না হতেই তা নিয়ে মন্তব্য-প্রকাশ অপরাধের মধ্যে গণ্য। গাছে কাঁঠাল থাকতে গোঁফে তেল দিলে সেটা অপবাদের কারণ হয়ে থাকে। এই নজির অনুসারে প্রজনন-পরীক্ষা আর একটু না এগোলে ভাবী ফলাফলের সুখ-স্বপ্ন দেখে জিভে জল না আনাই সমীচীন।

তাই ব'লে মানুষের হিতৈষীবিজ্ঞানীদের সফলতা কামনায় দোষ নেই। তবে কিনা, USSR-কী-জয়! হাঁকার আগে আরো একটু বিবেচনা করা লাগবে।

ঈশা-সংকট

খৃষ্টান সাধক বলেন, প্রেমের কারণে পিতৃ-স্বরূপ পরমেশ্বর সৃষ্টির মধ্যে বহু হলেন,—শুধু তা নয়, এমনি আত্মহারা হলেন যে, জগতে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না, বিজ্ঞান দিয়ে তাঁকে ধরা-ছোঁয়ার চেষ্টা বৃথা। প্রেমের জোরে নিজের মধ্যে পরমাত্মাকে উপলব্ধি ক'রলে তবে মাতৃ-রূপা জীবাত্মা পুত্র-ভগবানকে নব-জন্ম দেন।

আমাদের ঋষি আর এক ভাবে বলেছেন, জগতের মধ্যে যত জগৎ, ঈশা সে সব ছেয়ে আছেন।

সৃষ্টি হল প্রবাহের মধ্যে প্রবাহ। যেটুকু আমাদের গোচরে আছে তা'তেই দেখতে পাই,—বিশ্বের মস্ত বড় ইতিহাসের মধ্যে সৌরজগতের অভিব্যক্তি, তার ভিতর এই পৃথিবীর অভ্যুদয়, পৃথিবীর উপর নানা প্রাণীর জীবন-ধারা, এক এক জাতের প্রাণীর মধ্যে কত ব্যক্তি, ব্যক্তির

মধ্যে কত কোষ, কোষের মধ্যে নতুন ব্যক্তির জননিকা। জড়পদার্থও ক্রমশই নিরেট বস্তুর কোঠা ছেড়ে প্রবাহের দলে এসে পড়ছে।

কোনো না কোনো ঈশার প্রভাবে ত এই সব প্রবাহগুলি যে-যার নিয়মে চলে, কিন্তু পরমেশ্বরকে সত্যিই ত তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। আলাদা প্রবাহের চালকও যেন আলাদা,—সব সময় তাদের এক মতি থাকে না, অন্তত তাদের-চালানো প্রবাহগুলির এক গতি ঘটে না, বিরোধ বাধে, একের গড়া অন্যে ভাঙে।

প্রকৃতির অম্বিকা-মূর্ত্তির যে সামঞ্জস্য—যাকে বিজ্ঞানীরা Balance of Nature বলেন—তার বাইরের পরিপাটী ঠাট শান্তির ছবি, অথচ তার তলে তলে করালীর রণ-রঙ্গ; বাঁচার জায়গা, বাঁচার সুযোগ, বাঁচার উপায় নিয়ে ছোট-বড় প্রাণী-দলের হরদম ভীষণ রেষা-রেষী চলেছে; গোছগাছ নেই তা নয়, কিন্তু ফেলা-ছড়াও বিস্তর। পরস্পর সাহায্যের মাধুর্য, নিষ্ঠুর খাওয়া-খাওয়ীর কদর্যতা পাশাপাশি পাওয়া যায়।

এই অবস্থার কথা ভাবলে, "যা করেন ভগবান," এই বাঁধি বুলিতে সায় দিতে মন সরে না। ভগবান গর্ত্তে ফেলেন আবার সেই গর্ত্ত থেকে তোলেন; বাঘ দিয়ে মানুষ খাওয়ান, মানুষের বন্দুকে বাঘ মারান; যাকে দুষ্ট বুদ্ধি জোগান তাকেই দুষ্ট কাজের সাজা দেন;—এ ভাবে কথা কইলে কোনো তত্ত্বের সন্ধান ত মেলেই না, মাঝে থেকে ভগবান নামের গাম্ভীর্য নষ্ট হয়।

জড়ের বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দিয়ে প্রজ্ঞাশক্তি নিজের ক্রমবিকাশের পথ খুঁজে ফিরছে, ভুল পথে বার বার কিছুদূর চ'লে আবার পাল্টে নতুন পথ ধরতে হচ্ছে,—চেহারাটা সেইরকম লাগে। কোথায় যাবার পথ? বহু থেকে আবার একে পৌঁছবার নাকি? এই চেষ্টাই যেন প্রকৃতির লীলা।

মাঝপথে নানা খণ্ড-ঈশার আঁকুবাঁকু দেখে পরম মহেশ্বরের চরম অভিপ্রায় সম্বন্ধে কোনো তত্ত্ব সাব্যস্ত ক'রে বসার ঝোঁক চাপলে, সাবধান থাকা উচিত। জ্ঞানের নীচুস্তরে থাকতে উঁচু রকমের প্রশ্ন তুল্লে, সদুত্তর পেলেও অনেক সময় তার মানে করা যায় না। এক ইংরেজ বিজ্ঞানী এর একটা মজার উদাহরণ দিয়েছেন।

মনে কর, এক অঙ্কনবীশ আলোর গতি গুণতে শিখেছে, কিন্তু জ্যোতিষ্কের হালচাল পর্যন্ত তার বিদ্যের দৌড় নয়। একদিন, সামনের বনের উপর এক রামধনু দেখে, তার গুণে বার করার সখ হ'ল, ঐ পাঁচরঙা আলো কতদূর থেকে আসছে। নিয়ম-মতো অঙ্ক পেতে উত্তর বেরলো,—"৯,৩০,০০,০০০ মাইল।" অঙ্কনবীশ বার বার পরখ ক'রে মাথা চুল্‌কে ভাবতে লাগলো—"তাইত, কষার ভুল পাচ্ছিনে, অথচ গণনার একি অদ্ভুত ফল!" সামনের বনটা ত মাইল কতকের বেশী দূর হতেই পারে না। তার ধাঁধা-লাগা দেখে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী বন্ধু আশ্বাস দিলেন—"ওহে, উত্তর ভালই পেয়েছ। রামধনু যাকে বলে সে ত মেঘ-থেকে ঠিক্‌রে-আসা সূর্যকিরণ বৈ অন্য কিছু নয়। ওর দিকে মুখ করলে সূর্য থাকে পিছনে, সেই কথা বিপরীতের (—) minus চিহ্ন জানিয়ে দিচ্ছে। আর সূর্য ৯,৩০,০০,০০০ মাইল দূরে ত বটেই।"

আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা হিম-সিম খেলেও, যন্ত্রের সাহায্যে বুদ্ধি খাটিয়ে যা পান, তার বর্ণনা করায় তাঁরা এমন পোক্ত যে, যার ইচ্ছে সে যাচিয়ে নিতে পারে। তাই রকমারি ঈশার চেহারা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একবার দেখে নেওয়া যাক, পরে তত্ত্বজ্ঞান উদয় হ'লে সমন্বয়ের উপায় বেরিয়ে পরতে পারে। শিক্ষা-নবীশকে এইটুকু সতর্ক করে দেওয়া দরকার, উপলব্ধি হবার আগেই বড় বড় জ্ঞানের কথা

আওড়ালে চৈতন্য জাগার সাহায্য হয় না, উল্টে তাকে ভুলিয়ে অসাড় ক'রে রাখা হয়।

পুরাকালে, যখন পৃথিবী সবে সূর্য থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে প্রচণ্ডতাপে বাষ্পময় ছিল, তখনকার অবস্থায় আমরা এখন যাকে প্রাণের ক্রিয়া বলি, তার উপায় ছিল না। কাল-ক্রমে ঠাণ্ডা হবার পর যখন জীবন-রূপী জলের কতক অংশ তরল হ'য়ে আকাশ থেকে নেমে এসে মাটির খাঁজে-খন্দে ব'সে গেল, তার মধ্যে প্রাণী-কণা উদ্ভাবন হ'য়ে ভেসে বেড়াতে লাগলো। এই প্রাণ জিনিষটায় ঈশার প্রকাশ প্রথম ফুটে ওঠে, যার দরুণ জড়ের নিরুদ্দেশ গতির মধ্যে একটা মতি দেখা দেয়।

প্রাণ-শক্তির মতি অনুসারে দৈবাৎ এক আধটা নয়, দল-কে-দল প্রাণ-বিন্দুরা দেহ গ'ড়তে লেগে গেল। প্রাণ-কোষটা ভাঁজ হ'য়ে পেটের খোঁদল হ'ল, আগা পাকিয়ে ন্যাজ বেরলো, ন্যাজের ঝাপ্‌টায় উদর-পূরণের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেলো। খেয়ে দেয়ে দেহ বেশী বেড়ে গেলে দু'টুকরো হ'য়ে বংশবৃদ্ধি হতে লাগলো, ক্রমে যুগল-মিলনের কৌশল বেরিয়ে—সন্তানের মধ্যে বৈচিত্র্য এসে উন্নতির পথ খুলে গেল।

প্রাণশক্তির কথা না এনে ফেল্লে চলে না। যে খাবার সামনে নেই, যে ভাবী উন্নতি আগে থাকতে কল্পনায় আসতে পারে না, তার খোঁজে প্রাণীকণাকে পাঠালে কে?—যদি বল ভিতরকার অন্ধ সংস্কারের এই কাজ, তবে প্রশ্ন ওঠে গোড়ায় সে সংস্কার এল কোত্থেকে? যদি বল এক ঈশায় সবই করাচ্ছেন, তাহলে প্রাণীতে জড়ে, প্রাণীতে প্রাণীতে কাটা-কাটি মারামারির হিসেব পাওয়া যায় না। কাজেই আপাতত প্রাণশক্তি ব'লে কোনো খণ্ড-ঈশার প্রভাবে প্রাণক্রিয়া চলে, তাই ধরতে হয়।

আবার দেখ, প্রবাহের মধ্যে যেমন প্রবাহ, ঈশার উপর তেমনি ঈশা। প্রাণী-কণার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ-শক্তির উপর জৈবিক শক্তির

আবির্ভাব হয়, তার প্রভাবে প্রাণীকণাদের মধ্যে সমবেত হ'য়ে বড় কলেবর ধারণ করার চেষ্টা দেখা যায়।

প্রথম দিকে জীব-দেহধারণের চেষ্টার এক দৃষ্টান্ত স্পঞ্জ (sponge) জাতি, যে স্পঞ্জের সমাজদেহের খোলসকে ইংরেজরা গামছার মতো ব্যবহার করে। এই ফোঁপ্‌রা-ছিব্‌ড়ের মতো জিনিষটা সমুদ্রতলার একজাতের প্রাণী-কণা-সমবায়ের তৈরী বাস-পল্লী। সুরঙ্গের মতো যে সব গর্ত্ত ওর মধ্যে দেখা যায়, তারি ধারে ধারে মাথা গুঁজে ন্যাজের দিক ফাঁকায় রেখে, প্রাণী-কণারা স্থাবর হয়ে থাকে,—ভিটে কামড়ে যেমন পাড়াগেঁয়ে মানুষ থাকতে চায়, তার চেয়েও কায়েম হ'য়ে। এ অবস্থায় তারা আলাদা হ'য়ে থাবার খোঁজে বেড়াতে পারে না, কিন্তু সবাই মিলে একতালে ন্যাজ নেড়ে তারা এই সুরঙ্গের ভিতর দিয়ে জলের স্রোত চালাতে থাকে। জীবদেহে রসরক্ত চলাচলের আভাস এখানে পাওয়া যায়। স্রোতের সঙ্গে যা-কিছু পুষ্টিকর জিনিষ ভেসে আসে, যে-যার জায়গায় আটুকে থাকলেও তার ভাগ সকলে পায়।

এই যে মিলে-মিশে সমুদ্রের মধ্যেকার মালমসলা জুটিয়ে সুরঙ্গময় বাসস্থান তৈরী করা, একসঙ্গে তালে তালে ন্যাজ নাড়া, প্রত্যেকের আলাদা প্রাণ-শক্তি সকলকে ঠিক একভাবে এসব কেমন ক'রে শেখাতে পারে? তাই আবার প্রাণীদলের উপরকার জৈবিক শক্তির প্রভাব মানতে হয়।

স্পঞ্জের মতো ঢিলে-ঢালা সমবায় দিয়ে আরম্ভ ক'রে, প্রাণীকণারা এক একদল বর্ণভেদ কর্মভেদ স্বীকার ক'রে নানা অঙ্গ-বিশিষ্ট আঁট-সাঁট জীব-দেহ গ'ড়তে শিখে উঠলো। সেই সঙ্গে দলাদলির সূত্রপাত হ'ল, খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ উৎকট হয়ে উঠলো।

ঢেউয়ের আধার সমুদ্রকে আমরা "এক" বলি, কিন্তু ঢেউগুলি একটি

আর একটিকে কখনো বাড়ায়, কখনো চাপা দেয়, ঠোকাঠুকি লাগলে দুটোই ভেঙে পড়ে, তাই দেখে তাদিকে "আলাদা" বলি। আবার এরোপ্লেন থেকে সমুদ্রে-ঢেউয়ে একাকার মূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। তেমনি উদার দৃষ্টিতে বড় ঈশার সঙ্গে ছোট ছোট ঈশার যোগাযোগ ধরা পড়তে পারে। সেই আশায় খণ্ড-শক্তিগুলোর ক্রিয়া-কলাপ আরো ভাল ক'রে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

এক দল প্রাণীকণা সূর্যকিরণের তেজ শরীরের মধ্যে আট্‌কে নিয়ে তার সাহায্যে সোজাসুজি জড়কণা দিয়ে প্রাণের ক্রিয়া চালাবার উপায় পেয়ে গেল। এরা উদ্ভিদ-শ্রেণীতে ফলাও হ'ল। আর যে প্রাণী-কণার দল তা করতে পারলো না, তারা উদ্ভিদ খেয়ে তাদের তৈরি কোষ দিয়ে প্রাণক্রিয়া চালিয়ে নানা শাখার উদ্ভিদ-খেকো শ্রেণী বার করলো।

গোড়ায়-গোড়ায় উদ্ভিদ-জাত সবই সেওলার মতো নরম ছিল, তখন তারা জলের তলায় বা ধারে শিকড় গাড়তো। ক্রমে তাদের কোনো কোনো দল শক্ত ছালের ঢাকা বানিয়ে, তার ভিতরে নিরাপদে রস চলাচলের ব্যবস্থা রেখে, ডাঙ্গায় উঠে পড়লো, শেষে বিচি ছড়াবার নানা ফন্দি বার ক'রে পাহাড়ের মাথায় পর্যন্ত চ'ড়ে গেল। উদ্ভিদ-খেকোরাও গা'য়ে শক্ত চামড়া মুড়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ছেয়ে ফেল্লো। এদের মোটামুটি দুই শাখা,—পোকার মতো যাদের নরম দেহ, আর হাড়ের কাঠামো থাকায় যাদের দেহ শক্ত। এদের মধ্যে কোনো কোনো প্রশাখা আরো সোজায় পুষ্টি আদায় করার চেষ্টায়, উদ্ভিদ খাওয়া ছেড়ে স্বশ্রেণীর পশু পাখী মাছ পোকা খেতে লাগলো।

তবু, এত রকমের খাওয়া-খাওয়ী সত্ত্বেও জন্তুতে পাখীতে গাছে পোকায় পরস্পর সাহায্যেরও কিছু কিছু সম্বন্ধ র'য়ে গেল; তার কিছু আভাস আমরা আগে পেয়েছি।

এতেও ঈশার বৈজ্ঞানিক পরিচয়ের শেষ নয়। জৈবিক শক্তি যেমন নানা রকম প্রাণীকণার সমবায় বেঁধে জীবদেহ তৈরী করে চালায়, তেমনি আরো উপরকার এক শক্তি, যাকে সঙ্ঘ-শক্তি বলা যেতে পারে, সে জীবদের মধ্যে গুণ-কর্ম বিভাগ ক'রে সমাজের মতো আরো বড় কলেবর রচনা করায়। এই সঙ্ঘ-শক্তির ক্রিয়া-কলাপ অল্পের মধ্যে বুঝতে হ'লে পোকার ছোট ছোট সমাজের উপর নজর করলে সুবিধে হবে।

সমাজ-বাঁধা পোকার মধ্যে উই, মৌমাছি, পিঁপড়ে, এরাই প্রসিদ্ধ।

এক দল প্রাণ-কোষে মিলে যেমন এক-একটি উই-পোকা গ'ড়েছে, তেমনি এক দল উই-পোকা মিলে মাটির ছাল-ঢাকা সমাজ-কলেবর রচেছে, যাকে বলে উই-ঢিবি। সেই ঢিবি-গারদের অন্ধকারে নিজত্ব-হারা উইপোকারা যে রকমের জীবন কাটায়, তা'তে ওদের সঙ্ঘ-শক্তিকে তামসিক বলতে হয়।

জন্তুর চামড়া কেটে গেলে যেমন জৈবিক শক্তির হুকুমে রস-রক্তের দৌড়ো-দৌড়ীর চোটে জায়গাটা ফুলে ওঠে, রক্ত জমাট বেঁধে বাইরের খারাপ জিনিষ কিছু ঢুকতে দেয় না, ভিতরে নানা কোষের ক্রিয়ায় নতুন চামড়া তৈরী হয়, তেমনি উই-ঢিবির মাটির ছাল কোথাও ভেঙে গেলে, সেখানে লাল সাদা দু'রকমের উই-পোকা ছুটে আসে, লাল গুলি বাইরের পোকামাকড় ঠেকিয়ে রাখে, শাদাগুলি ভিজে এঁটেল মাটির ছোটো ছোটো ডেলা এনে ছাল মেরামতে লেগে যায়।

এখানেই সঙ্ঘশক্তি নিজেকে জানান দেয়। ভাঙা মাটির ফাঁকের দু'দিক থেকে জোড়ার কাজ চলে, শেষে ঠিক এক থামালে জোড় মিলে যায়। তবে কি এই চোখ-কান-হীন সামান্য পোকারা নিজেদের মধ্যে এরকম জটিল কাজের বিষয়ে পরামর্শ করতে পারে? এক বিজ্ঞানী সে কথা পরীক্ষা করার জন্যে একটা ঢিবিকে করাত দিয়ে এ পার ও পার

ফেড়ে কাটার ফাঁক দিয়ে উপর থেকে নীচে পর্যন্ত একটা টিনের চাদর চালিয়ে দিলেন, যার মধ্যে দিয়ে এক দিক থেকে অন্য দিকে কোনো রকম আদান প্রদান চলতে পারে না। তবু দেখা গেল উই-কর্মীরা দুদিক থেকে মেরামতের কাজ আরম্ভ করে ঠিক এক থামালে টিনের দুপাশে ফাঁকটা জুড়ে দিলে। বিনা কোনো উপরের সঙ্ঘশক্তির নির্দেশ ছাড়া এমন ত হয় না।

এই সঙ্ঘ-শক্তির প্রভাবে উই-ঢিবির জীবন-যাত্রার যত রকম কাজ চলে—মাটির তৈরি সুরঙ্গ বেয়ে লিঙ্গহীন কর্মীদের কাঠের সন্ধানে বেরনো, কাঠের গুঁড়ো কেটে এনে গরম স্যাঁৎসেতে গুদমে পুরে, ছাতা ধরিয়ে তাকে হজম করানো, সেই তৈরি "ফুড" খাইয়ে ডিম-ফোটা বাচ্ছাদিকে বড় করা, উপরের মাটি শুকিয়ে গেলে জলের কাছ পর্যন্ত নেমে গিয়ে ভিজে মাটি তুলে আনা, আরো কত কি।

জন্তুর মাথা কাটা গেলে যেমন তার শরীরের যত রকমের কোষ সব নির্জীব হয়ে মারা যায়, তেমনি উই-পোকাদের সঙ্ঘশক্তি ওদের মাতৃ-স্থানীয় একটি বিশেষ স্ত্রী-পোকার মধ্যে দিয়ে কাজ করে। সেটি পেট-সর্বস্ব একটি ডিম-পাড়া যন্ত্র বল্লেও হয়, ঢিবির নিভৃত স্থানে একটি আলাদা ঘরে বন্ধ থেকে সে জীবন-ভর ডিমই পাড়ে। বাচ্ছাদের মতো তাকেও কর্মীরা খাওয়ায়, সেবা করে। তাকে যদি মেরে বা সরিয়ে ফেলা হয়, তাহলে উই-পোকাদের নিত্যকর্ম বন্ধ হয়ে যায়, তারা একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ে, ঢিবির আয়ু শেষ হয়ে যায়।

ঢিবির বংশবৃদ্ধি উপলক্ষ্যে পোকাদের বৎসরে একবার ডানা গজায়, বিয়ের উৎসবের দিন সেই একবার এরা খোলা আলো হাওয়ার স্বাদ পায়। কিন্তু হায় কপাল! সে কি অদ্ভুত উৎসব। ভোজ প'ড়ে যায় রাজ্যের লোভাহূত গিরগিটি টিকটিকি বাদুড় চামচিকের দলের, আর

তরকারী হয় হতভাগা বর ক'নেরা স্বয়ং। শেষে যে দু'চারটি টিঁকে যায়, তারা জোড় বেঁধে ডানা খসিয়ে নতুন ঢিবি পত্তন করতে বসে বটে, কিন্তু সে পরিণামের উদ্দেশ্যে যে-সঙ্ঘশক্তি মরবার তরে ঝাঁকে ঝাঁকে উইপিপীলিকাদিকে পক্ষ জোগায়, তাকে অন্তত মিতাচারী বলা যায় না।

ঈশার এক খণ্ড পথ হারিয়ে অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছে,—ঢিবি জীবনের চেহারাটা সেই রকম নয় কি?

মৌমাছিদের সঙ্ঘ-শক্তি রাজসিক—চাকের মধুময় আঁধার থেকে প্রফুল্ল কাননের জেল্লায় এঁদের আনাগোনা। চাকের বাসিন্দারা হচ্ছে—একটি পাটরাণী, গুটিকতক বাচ্ছা রাণী, দশ-বিশটা পুরুষ-মোসাহেব, আর বাকি সব লিঙ্গহীন কর্মী। আকাশমার্গে বিবাহ-উৎসবের মাতামাতির পর থিতিয়ে বসলে, পাটরাণীর কাজ হচ্ছে চাকের ঘরে ঘরে ডিম-পেড়ে বেড়ানো। চাকের বাসিন্দা বেড়ে উঠলে, বাচ্ছা রাণীরাও সেই সঙ্গে সাবালিকা হ'য়ে এক এক ঝাঁক কর্মী নিয়ে স্থানান্তরে নতুন চাক ফাঁদতে বেরিয়ে পড়ে, এই ভার তাদের উপর। আর কর্মীরা এক-নিষ্ঠায় চাকের যত কিছু কাজ সব করতে থাকে—মোম তৈরি থেকে আরম্ভ ক'রে, মোম দিয়ে চাক গড়া, রাণীদের সেবা, ডিম-ফোটা বাচ্ছাদের খাওয়ানো, রোদের বেলায় মধু এনে ভাঁড়ারে রাখা, শত্রুর আক্রমণ ঠেকানো, রাতে সকলে মিলে একসঙ্গে ডানা নেড়ে চাকের হাওয়া বদলানো, বাচ্ছাদের মধ্যে কারা রাণী হবে, কারা পুরুষ হবে, কারা কর্মী থাকবে, রেণুতে মধুতে মিশিয়ে সে রকম খাবার ব্যবস্থা করা,—এমন অশেষ কাজে খাটতে খাটতে এদের অল্প আয়ুর কটা দিনের মধ্যে শরীর জীর্ণ হয়ে যায়।

কর্মীদের এত খাটুনির উৎসাহ কি মধুর রসে মাতোয়ারা হওয়ার

লোভে ?—তা ত নয়।—যেটুকু মধু খায় এক ত তার চেয়ে ঢের বেশী তুলে রাখে, তাছাড়া রাণীকে বাচ্ছাকে না খাইয়ে ওরা ত খায়ই না। যত খাতির রাণীর, যত সেবা বাচ্ছাদের, যত কঠোরতা হতভাগা পুরুষগুলোর ভাগ্যে ;—বসন্ত উৎসবে একজন উদ্যোগী পুরুষ ত রাণীকে লাভ করে, বাকি সব ঘরে ফিরে এসে বেকার ব'সে থাকে, ফুলের মর্ম্ম উৎরে গেলে কর্মীরা তাদিগে ঘেরাও ক'রে মেরে দেয়—মধু'র বাজে খরচ ওদের এতই অসহ্য। নিজেদের সম্বন্ধে কর্মীরা উদাসীন, কেও কারো অপেক্ষা রাখে না, কোনো কর্মীর আঘাত লেগে সে যদি যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে, তার দিকেও অন্যেরা ফিরে তাকায় না, চাকের কাজের হুড়োহুড়িতে তাকে যদি মাড়িয়ে যেতে হয়, সেও স্বীকার।

নিজের বেলা এত হেলা, পরের কাওকে আতুপুতু, কাওকে মারধর,—এ ব্যাপারের হিসেবটা এই যে এরা বোঝে শুধু "বৃদ্ধি", স্বজাতবৃদ্ধি—মানুষের মধ্যে যেমন ক্ষত্রিয়-বৈশ্যপ্রবর নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দ তুচ্ছ ক'রে রাজ্য বাড়াতে, ধন বাড়াতে, মশ্‌গুল থাকে। শেষে এতদিনের গৃহস্থালী, এত ক'রে সঞ্চয় করা মিষ্টধন, ওদের এই যথাসর্বস্বের মায়া কাটিয়ে নিজেদের কোন্ এক অতীত অহেতুক-বৃদ্ধিবাতিকগ্রস্ত সঙ্ঘ-শক্তির এক ইসারায় অর্বাচীন রাণীর অনুচর হয়ে ওদের তরুণ দল অজানার মধ্যে অকাতরে ঝাঁপ দেয়। ঝড় জল দুর্য্যোগের হাত থেকে যারা বেঁচে যায়, তারা পৌঁছয় কোথায় ? না, আবার নিজেকে ভুলে নতুন চাক তৈরি করা, আবার তৈরি চাক ছেড়ে বেরিয়ে পড়া! ব্যক্তির উৎকর্ষ-সাধন গোছের কোনো বালাই নেই।

এক রকম তপস্বী-দলের আস্তানা দেখা যায়, যেখানে বোকাগৃহস্থদের খাটুনির দান মাটির তলায় কাঁড়ি হ'তে থাকে, বুড়ো তাপসরা স'রে পড়ার আগে একদল শিষ্যকে সেই তপস্যা শিখিয়ে যায়, যাতে ক'রে

পুঁতে-রাখা ভিক্ষের ধন আরো বাড়তে থাকে, যা দেবতার উপকারে লাগে কিনা জানা নেই, ধর্ম্মের কাজে যে লাগে না সেটুকু নিশ্চয়। এই রকম তপস্বীদের দেখলে মৌচাকের কথা মনে পড়ে।

সে যাই হোক, মৌমাছি-জীবনের ঘানি যে-ঈশায় ঘোরায়, তার আরো বড় কিছুর দিকে এগোবার রাস্তা দেখা যায় না। তবে পাশ্চাত্য-মানুষের চালাকির সঙ্গে পারা ভার। মৌমাছির আপন-ভোলা শ্রমকে সে নিজের ভোগে লাগাবার ফিকির বার করেছে। "বংশ বাড়াবি, সাধ হয়েছে?—বেশত, তার জন্যে গাছের গর্ত খুঁজে ঘুরে মরা কেন? দিব্যি কাঠের বাক্স তৈরি আছে, তাতে ব'সে যা, চাকে প্রাণ ভ'রে মধু আন্, ঝাঁকের পর ঝাঁক বার করতে চাস্ কোনো ভয় নেই, বাক্স মোজুদ আছে।" এই অভ্যর্থনায় খুসী হয়ে মৌমাছি বশ মেনে গেল, এক এক বাক্সে লাখো কর্ম্মী জুটে আধমণ একমণ ক'রে মধু জড়ো হতে লাগলো, সে মধু কৌশল ক'রে মানুষে বেমালুম বার ক'রে নিয়ে তার বদলে গুড় ভরে দিলেও ঘানিঠেলা মদেমত্ত মধুকর দলের সে দিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। এ দিক থেকে দেখলে, মানুষের সঙ্গে বড় সমবায়-ভুক্ত হওয়াটা মৌমাছির ভাগ্যে ঘ'টেছে বটে।

পিঁপড়েদের জীবন বিচিত্র, সন্দেহ নেই। ওদের সঙ্ঘশক্তিকে সাত্ত্বিক বলা না যাক, চৌকস বলা চলে। ওদের শস্য ফলানো আছে, গো*-পালন আছে, সন্ধি-বিগ্রহ আছে, বাচ্ছাদের প্রাণ-পণ যত্ন ত আছেই, তা ছাড়া শরণাপন্নকে আশ্রয় দেওয়া আছে, পরস্পরকে দান করাকরি

* আমরা যে জীবকে গোরু বলি, তা অবশ্য পিঁপড়েরা পালন করে না। এক জাতের ছোট পোকা আছে যারা গাছের মিষ্টিরস খেয়ে টৈটুম্বুর হয়ে থাকে, পিঁপড়েরা যত্ন ক'রে তাদিকে কাছাকাছি বসায়, তাদের গায়ে সুঁড় বুলিয়ে খোসামোদ ক'রে সে রস-বিন্দু আদায় ক'রে নেয়।

আছে, এমন কি ওদের মধ্যে দাতাকর্ণের দল আছে যারা মিষ্টি রসের বোঝা নিয়ে ব'সে থাকে, যে চায় তাকে বিলোয়। দেহ নেহাৎ খুদে না হ'লে, ওরা হয়ত মানুষের সঙ্গে সমানে টক্কর দিতো।

নাবিকেরা এক দ্বীপের গল্প করে, যেখানে ডেঞ্জে পিঁপড়ের দল এমন আড্ডা গেড়েছিল যে, সেখানে অন্য কোনো জানোয়ার থাকার যো ছিল না। তারা দ্বীপ দেখবে ব'লে যেমন নৌকো থেকে নেমেছে, আর পিঁপড়ের দল-বদ্ধ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পালাতে পথ পায় না। ক' বছর পর আর একবার সেখানে খবর নিতে গিয়ে সেই নাবিকেরা দেখে যে ইতিমধ্যে এক প্লাবনে পিঁপড়েরা উজাড় হয়ে গেছে, মানুষ সমেত নানা জন্তুর বসবাস স্থরু হয়েছে।

পিঁপড়েরা যে, সংঘশক্তির জোরে চলে-ফেরে, তার একটা প্রমাণ বল্লেই হবে। বাঘ-সিংহকে আলাদা করে খাঁচায় রাখলে, দুটি দুটি খাবার যোগালে, তারা আয়ুর শেষ পর্যন্ত তাতেই টিঁকে থাকতে পারে। কিন্তু দুটি একটি পিঁপড়েকে প্রচুর খাবার দিয়েও আলাদা ক'রে রাখলে তারা বাঁচে না।

পোকাসমাজের একটু একটু যা ছবি দেখা গেল, তা থেকে কিছু তত্ত্ব উদ্ধার করা যায় কি, যা আমাদের এ পালায় কাজে লাগতে পারে?

এক ত বোঝা যাচ্ছে যে, খালি আমি-হারা হ'লেই বড় হবার দরজা খুলে যায় না। দেবীর উপর অভিমান ক'রে কবি জিজ্ঞাসা ক'রেছেন—"কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে থাকি, বল্?" সে বিলাপের উত্তর এই—গৃহস্থ যদি গতানুগতিকের গোলাম হ'য়ে চলে, নিজের পায়ে নিজেই শিকল পরায়, তবেই তার সংসারটা আশ্রম না হ'য়ে গারদে দাঁড়ায়। যেটা ভবের লীলা হবার কথা, তাই হয় ভব যন্ত্রণা। হিন্দু যখন স্বাধীন বুদ্ধি-বৃত্তি খেলানো ছেড়ে দিলো, তখন থেকে চোখের জলে

তারাকে ডাকতে ডাকতে তার দিন কাটছে, বিধাতার কাছে রোজ-কে-রোজ পাঁচ মোহর পারিতোষিক* আদায় ক'রে আনন্দ করা মায়া-পাগলের ভাগ্যে ঘটে না। মনে পড়ে কবি ইক্‌বালের উপদেশ—"আমি-কে হারানো দূরে থাক, তাকে এমন টন্‌টনে চৈতন্যে তুলতে হবে যাতে সে বিশ্বকে নিজের ভিতর টেনে নিতে পারে।"

আর একটা দেখা যাচ্ছে এই,—সজ্ঘ-শক্তি যতবার সংস্কার-বদ্ধ জীবকে সমবায়ে মিলিয়ে বড় করতে গেছে, ততবারই তাদিকে ঘূর্ণিপাকে ফেলে, নিজেও তার মধ্যে আটকে গিয়ে, ত্রাণের চেষ্টায় ভঙ্গ দিতে হয়েছে। এখন ঈশার যা কিছু আশা ভরসা মানুষের মতো মানুষ নিয়ে কারবার ক'রে।

মানুষ দুই ধারার মধ্যিখানে এসে পড়েছে। বুদ্ধি-খাটানো ছেড়ে দিয়ে সে বাপ-দাদার আমলের ক্রিয়া-কাণ্ড নিয়ে চোখ-বাঁধা-বলদ-গিরিও ক'রে থাকে, আবার নিজের নিত্য-নতুন সৃষ্টির আনন্দে আলো হ'তে আরো আলোয় উড়ে বেড়াতেও পারে। তার লক্ষ্মী-নারায়ণ লাভের তিন যুগের ব্যর্থ চেষ্টার কথা ত বলা হয়েছে,—এবার বা মানুষের ঈশার গুণপণার শেষ পরীক্ষা—কল্কি-অবতার USSR-কে দিয়ে তিনকেলে বাজে সংস্কারের জাল ঝেড়ে ফেলে যদি লক্ষ্মী-নারায়ণের উপযুক্ত আসন পেতে রাখতে পারে। নইলে অস্ত্রঝন্‌ঝনানির আওয়াজে মানুষ দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে, বর্বর অবস্থায় দৌড়ে ফিরে যাবে। পাকা ঘুঁটিকে কেঁচে গাদ থেকে আবার বেরোতে হবে।

পুরোনো আবর্জনা বিদায়ের কথা যদি তোলা গেল, তবে একটা বিধান নেওয়া দরকার :

---

* পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দানকে সাধক রবিদাস এই ভাবে নিতেন।

পুরাকালে উৎপেতো অসুরের জ্বালায় অস্থির হ'লে দেবতারা বাঁচাও, বাঁচাও! ব'লে চণ্ডীদেবীকে কাকুতিমিনতি করতেন। এ কালের নেতারা যাঁকে ডাকেন, চতুরা-রূপে অ-সহযোগ-সাজেই আসুন, আর নিজ-মূর্তিতে রণসজ্জায় আসুন, তিনি সেই চণ্ডীই বটেন, রেহাই দেবার পাত্র তিনি নন। কোনো না কোনো ভাবে তাঁর আবির্ভাব না হ'লে প্রকৃতির গল্‌তিই হোক, আর মানুষের বদমায়সীই হোক, তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় দেখা যায় না।

তাই জিজ্ঞেস করি, যে শত্রুরা কখনো লুকিয়েচুরিয়ে কখনো বা হাঁক-ডাক ক'রে, মাঝে মাঝে সমীকরণ যজ্ঞ-বেদী নষ্ট করতে আসে, তাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষত্র-তেজ প্রকাশ ক'রে যজ্ঞ রক্ষার চেষ্টার দরুণ USSR-কে আদর্শ-ভ্রষ্ট পাষণ্ড ব'লে গাল পাড়া চলে কি?

মানুষের সঙ্গে মানুষের কালক্রমে রফারফি হলেও হতে পারে; গোছগাছের হিক্‌মতে মানুষ হয়ত বা নির্বিবাদে পরস্পর-উপকারী জীবজন্তু গাছপালা দিয়ে ক্রমশ নিজেকে ঘেরাও ক'রে রাখতে পারবে; কিন্তু হিংসাকে কি একেবারে বাদ দিতে পারা যাবে? অন্তত ধূলো থেকে, জল থেকে, হাওয়া থেকে, কলেরা-ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড-ইনফ্লুয়েঞ্জার যত রোগবীজকে মেরে সারা না করলে, "মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ···মধুমৎ পার্থিবংরজঃ···" এই মন্ত্র দিয়ে মানুষ নিজের সজ্ঞ-শক্তির প্রতি সত্যিকার শ্রদ্ধা জানাতে পারবে না।

শত্রু মিত্রের নিন্দে প্রশংসার বাড়াবাড়ির কুয়াশা ভেদ করে পরের পালায় USSR-এর মনের ভাবের কতকগুলি snap-shot-ছবি নেবার চেষ্টা করা যাবে।

চতুর্থ পালা

প্রবাসী-গ্রামবাসী সম্বাদ

মহাভাঙন তন্ত্র

বিপ্লবের প্রথম 5-year-plan-এ চাষাদের উপর হাত পড়ে নি। শ্রমিকদের মধ্যে ওরাই সব-চেয়ে অবুঝ, সব-চেয়ে পুরোনোর গোঁড়া। তা ছাড়া, তখনো বাইরের শত্রুর আক্রমণ পূরোদমে চলেছে। এ অবস্থায় দেশ-শুদ্ধ লোককে ঘাঁটালে সামলানো মুস্কিল হ'তো।

১৯৩০ শালের গোড়ায় বিপ্লবী-কর্তারা সময় বুঝে উপদেশ জারি করলেন—

"এখন চাষাকেও বিপ্লবের মধ্যে নিজের স্থান ঠিক ক'রে নিতে হবে, তাই এবারকার 5-year-plan শেষ না হ'তেই, বাপ-পিতামহের ধারা ছেড়ে, নিজের জমিবাড়ী, নিজের গোরুভেড়ার মায়া কাটিয়ে গ্রাম-সমবায় (kolhoxy)-র মধ্যে তাদের আত্ম-সমর্পণ করা আবশ্যক।"

কর্তাদের বিধান অনুসারে, এই সমবায়ই গ্রামের সব কাজ চালাবে। একসঙ্গে গুছিয়ে কলের সাহায্যে চাষবাস পশুপালন করলে আগের চেয়ে ফল অনেক বেশী পাওয়ার কথা, তাই দিয়ে সমবায়ীদের জীবন-যাত্রা ভালমতে চালিয়েও যা বাঁচবে সেটা দেশের অভাব পূরণের জন্যে কর্তৃপক্ষের হাতে থাকবে। তা'তে পল্লীবাসীরও অবস্থার উন্নতি হবে, রাষ্ট্রমধ্যে অসাম্য ক্রমে আর থাকবে না।

সমবায়-ভুক্ত হতে যাদের নেহাৎই মন স'রবে না, তাদের উপর জবরদস্তি করার হুকুম হয় নি ; তারা নিজেদের পরিবার পালনের জন্যে একটি গোরু বা ঘোড়া, গুটিকতক ছাগল ভেড়া বা শুয়োর রাখতে পারার ব্যবস্থা হ'লো। কিন্তু সমাজে তাদের মান মর্য্যাদা থাকবে না, সমবায়-ভাণ্ডারে শস্তায় কেনার অধিকার তারা পাবে না ; তা ছাড়া, এ ভাবে রাখা সম্পত্তির মূল্য অনুসারে তাদিকে একল্‌সেঁড়ে টেক্স দিতে হবে।

কিন্তু পরের মেহনতে নিজের দরকারের অতিরিক্ত চাষ আবাদ করিয়ে, বা পশু রেখে, বা কারবার চালিয়ে বিনা-শ্রমে আরামের চেষ্টা একেবারেই মানা। এটা অপরাধের মধ্যে গণ্য। এরকম কুধসী (koolack) ধরা পড়লে, তার সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হ'য়ে তাকে নির্ধনী (de-koolackise) ক'রে দিয়ে, যেখানে নতুন আবাদ করা হচ্ছে সেখানে তাকে সপরিবারে মজুরী করতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

Maurice Hindus একজন নাম-জাদা লেখক। তাঁর জন্ম রূষের এক গণ্ড-গ্রামে। ১৪।১৫ বছর বয়সে ঘর বাড়ী ছেড়ে তিনি মার্কিন দেশে গিয়ে বসবাস করেন ; সেখানেই কৃতী হন। কিন্তু দেশের উপর তাঁর টান যায় নি, তার সব খবর তিনি রাখতেন।

বিপ্লব সুরু হলে, এই প্রবাসী জন্মভূমিতে বেড়াতে এসে বুঝতে পেরেছিলেন যে, রূষের মাটির সঙ্গে চিরকাল লপ্টে আছে যে-চাষী, এ মহা নাটকে তাকেই প্রধান পাত্র হতে হবে, যদিও তখনো ভূমির স্বত্বাধিকার নিয়ে আইনের টানাটানি পড়েনি। পরে মার্কিন দেশে ফিরে গিয়ে তিনি যখন বিপ্লবীকর্ত্তাদের মহাভাঙন তন্ত্র (Stalin নাম দিয়েছিলেন "The Great Break") প্রচারের সংবাদ পেলেন, তাঁর মন বড়ই খারাপ হয়ে গেল।

এই নিরীহ কৃষক জাতের উপর ইতিহাসের কি সাংঘাতিক ধাক্কাটাই এসে পড়লো! এক ঠেলায় সেকাল থেকে একালে লাফিয়ে আসা, রাজ-শক্তির আশ্রয় ছেড়ে আত্মশক্তির উপর এসে পড়া, সম্রাট-আমলের শত-অত্যাচার সহ্য ক'রেও যে বাস্তুটুকু জমিটুকু আগ্‌লে এসেছে, অবশেষে সে সব অনভ্যস্ত সমবায়ের হাতে ইচ্ছে-সুখে স'পে দেওয়া— এ বড় ভীষণ ফরমাস! সকলের বাড়া এই, যে গৃহস্থ রাতদিন জমি-জমার ভাবনা ভেবে, তিলে তিলে পলে পলে সম্পত্তি বাড়িয়ে মুরুব্বি হ'য়ে উঠেছে, এখন তার এই যথাসর্বস্ব না ছাড়লে তাকে কিনা পেতে হবে সাজা!

প্রবাসীর মনের ব্যথা আমরাও 'বুঝি। ধনীর ধন জালিয়াতে ফাঁকতালে মেরে নিলে তাকে সশ্রম নির্বাসন-দণ্ড দেওয়া হয়, তা ত গা-সওয়া হয়ে গেছে। অন্যের খাটুনির ফল ভোগ ক'রে ধনী গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়, তাও দেখে দেখে আর বিসদৃশ লাগে না। কিন্তু ধনী-বেচারীকে জালিয়াতের মেক্‌দারের সাজা পেতে হবে শুনলে মনটা ছ্যাঁক্ ক'রে ওঠে বৈকি!

পৃথিবীর কোনো জাতকে কোনো কালে কি এত বড় সর্বনাশের মুখে পড়তে হয়েছে? এ কথা প্রবাসী মাথায় হাত দিয়ে ব'সে ভাবছেন, এমন সময় তিনি নদিয়া (Nadya) নামের একটি পরিচিত রুষ-মেয়ের চিঠি পেলেন—

নদিয়ার চিঠি

আমাদের দল-বল নিয়ে আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরতে চলেছি,—চাষীদের সমবায় পত্তন করতে। কাজটা সহজ নয়, কিন্তু ফলটা বিরাট। তুমি এখানে চ'লে এস; যে চাষীদের প্রকৃতি তুমি অচল অটল মনে করো,

তারা কেমন ক'রে সমবায়ী হতে শিখছে, দেখবে এস। চোখে দেখলে, ওদের দুঃখ কল্পনা ক'রে তোমায় আর দুঃখ পেতে হবে না, তোমার নিজেরও চিত্ত-শোধন হবে। তুমি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলে—প্রাণ যাবে তবু চাষায় বাস্তু ছাড়বে না ; সেই এক-গুঁয়ে চাষীকে আমরা কেমন ক'রে পথে আনছি, দেখে যাও। শুধু দেখেই বা ক্ষান্ত হবে কেন ? রুষকে নতুন ভিতের উপর খাড়া করার কাজে আমাদের সঙ্গে যোগ দাও। এখানকার হাওয়ায় আগুণ লেগেছে,—নতুন ভাবের, অভাবনীয় উদ্যমের আগুন !—

এই নদিয়া একটি বেঁটেখাটো মেয়ে, ঝাঁক্ড়া কটা চুল, বড় বড় কটা চোখ উৎসাহে জ্বল্-জ্বল্ করছে, গোল-গাল মুখ, সু-ছাঁদের ঠোঁট, মিষ্টি কিন্তু তীক্ষ্ণ গলার স্বর, মন-কাড়া হাসি। আত্ম-শক্তির উপর তার অগাধ বিশ্বাস। ১৯ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়, কিন্তু স্বামী তাকে বিপ্লবের ধান্দায় জড়াতে দিতে চায় না ব'লে, সে সঙ্কল্প ত্যাগ না ক'রে ত্যাগ করলো স্বামীকে। এখন সে অসীম আনন্দ-উচ্ছ্বাসে USSR-এর নব-বিধান প্রচারে মেতে আছে।

নদিয়াকে কেও যদি জিজ্ঞেস করে—"এ কাজে তুমি কি সুখ পাচ্ছ ?" —সে হেসে ওঠে, কিম্বা রাগ করে। ব্যক্তিগত সুখ ব'লে জিনিষটাই সে মানে না। তাকে যাতে ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে, সে সুখের সন্ধান নয়। মহাযুদ্ধে সামান্য সৈনিকের মতো সে এই বিরাট যজ্ঞে আত্ম-নিবেদিতা। যে শরীর পাত করতে বসেছে, তার আবার আলাদা সুখদুঃখ কিসের ? যজ্ঞের প্রগতিতেই তার সুগতি।

নদিয়া একা নয়। আজকের রুষে এমন হাজার মেয়ে আছে, তাদের হাজার ভাইও আছে, যারা সমীকরণ যজ্ঞ পূর্ণ করার মহাব্রত সাধনে প্রাণ-পণ করেছে।

নদিয়ার ডাকে সেই প্রবাসী জন্মভূমিতে ফিরে এলেন,—বিপ্লবের ধারা নিজের চোখে দেখতে। তিনি যা দেখলেন শুনলেন, কতক তাঁর নিজের জবানীতে, কতক তাঁর টুঁকে-নেওয়া পাঁচ জনের মুখের কথায়, এ পালায় ধ'রে দেওয়া যাচ্ছে।

অর্বাচীনের কথা

বিকেল-বেলা রেল-স্টেশনে নেমে, আমার ছেলেবেলার খেলা-ঘর সেই গণ্ড-গ্রামের রাস্তায় হেঁটে চল্লাম। যে ধারে চাই, মেঘ-মুক্ত রোদে-ভরা আকাশের মনোহর নীলে চোখ জুড়োয়। মনে হ'ল lark-পাখীর* এমন আপন-হারা গান আর কখনো শুনিনি। চারিদিকে কোথাও হেলাফেলার চিহ্ন নেই, ফসলে ফসলে মাঠ উথলে উঠেছে, ভাবী আশার উৎসবে সবই উৎফুল্ল।

আমি প্রাণ ভ'রে দেখতে শুনতে চলেছি, এমন সময় গ্রামের কাছাকাছি পৌছে এক স্কুলের ছেলের সঙ্গে দেখা। বয়স বছর বারো হবে। চাষার রীতি অনুসারে সে কাঁধে-ফেলা লাঠির আগায় জুতো-জোড়া টাঙ্গিয়ে খালি পায়ে চ'লেছে, মাথার ছাঁটা চুলের উপর টুপিও নেই। বগলে একঝুলি বই। সে বুঝি সমবায়ের লাইব্রেরীর জন্যে সহরে বই আনতে গিয়েছিল, এখন বাড়ী ফিরছে।

আমি প্রবাসী ব'লে নিজের পরিচয় দিয়ে, ওর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম—বাড়ীর কথা; গ্রামের কথা; গ্রাম-সমবায়ের কথা, যার মধ্যে এই বছরের গোড়ায় ওর বাপ ভর্তি হয়েছেন।

* Lark পাখী আকাশে উড়তে উড়তে গায়।

জিজ্ঞেস করলাম—“বড় হ’লে তোমার কি হ’তে ইচ্ছে যায় ?”

সে বল্লে—“ইঞ্জিনীয়ার হব।”

“বিশেষ ক’রে ইঞ্জিনীয়ার কেন ?”

“গ্রামের গোলাবাড়ী, সাঁকো, কারখানা, যা কিছু দরকার বানিয়ে দেব।”

“তুমিও তা’তে বেশ ধনী হয়ে উঠবে, না ?”

ছেলেটা হেসে উঠলো।

“হাস্‌ছ কেন ?”

“বোকা ছাড়া ধনী হ’তে কে চায় ?—তাই হাসছি।” পরে সে গম্ভীরভাবে বল্লে—“ধনী হওয়া মানে পরকে লুঠ করা।”

“কিন্তু ভাল ভাল জিনিষ তোমার নিজের হয়, তাও কি চাও না ? তোমাকে কেও যদি ঘোড়া কি মোটর গাড়ি দেয়, তা কি নাও না ?”

“নিই বৈ কি, নিয়ে বাবার সমবায়ে দিয়ে দিই। জানেন, প্রবাসী মশায়, আজকাল ধনী কথাটা আমরা গুদামজাত করেছি, ওটা আর চলতি নেই !”

আমি অবাক হয়ে ছোকরার পানে তাকিয়ে রইলাম। এতটুকু মুখে অত বড় কথা! একি ওর সত্যিকার মনের ভাব, না শেখানো বুলি? কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দে ব’লে গেল, চোখের ভাবে মুখের কথায় গরমিল ত দেখলাম না, মুখস্থ গৎ আওড়াবার মতো চেহারা মোটেই নয়। আমি যে-দেশ থেকে এসেছি, সেখানকার ছেলেরা বলা দূরে থাক্, এ কথা ভাবতেই পারে না ; সেখানে এ ধরণের মতামত নেহাৎই ফাঁকা শোনাতো ; তাই প্রথমটা সন্দেহ হয়েছিল।

রাস্তার মোড়ে ছেলেটির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হ’ল। আমাদের বাড়ি যে পাড়ায় ছিল, নানা কথা ভাবতে ভাবতে সে দিকে চলতে লাগলাম।

এখন দেশে যে-দ্বন্দ্ব চলেছে, তা রাস্তার দুই পাশের মাঠের চেহারা থেকেই বোঝা যায়। এক দিকে সমবায়ের হাত পড়েছে, আল দিয়ে ক্ষেত ভাগ করা নেই, কলে বোনা বিচির গাছের সোজা সোজা লাইন জমির ঢাল ধ'রে যেন ফসলের স্রোতের মতো বিল পর্যন্ত চলেছে। অপর ধারে, যারা সমবায়-ভুক্ত হয় নি, তাদের ভাগ করা ছোট ছোট ক্ষেতে ফসলের সে তেজ নেই, তারা যেন বিরুদ্ধ ভাবের জের টেনে রেখেছে মাত্র। এ বৎসরের গোড়ায় যে "সমবায়" এত ভয় ভাবনা ওজর আপত্তির বিষয় ছিল, এরি মধ্যে তার প্রভাব, প্রকৃতির ঋতুপরিবর্তনের মতো বেমালুম এসে গ্রামকে ছেয়ে ফেলেছে।

মনে সন্দেহ রইলো না, ভবিষ্যতে আর যাই হোক, রূষের সেই নিরিবিলি ঝিমন্ত পল্লীর দিন ফুরিয়েছে। আমাদের এই গ্রামে আজও কারখানা দেখা দেয় নি; যে দিন কলের বাঁশি গ্রামবাসীর মন কেড়ে নেবে, সে দিন যা থাকে অদৃষ্টে, তারা নতুনের মধ্যে ঝাঁপ না দিয়ে পারবে না।

এই স্কুলের ছেলেটি বড়ো হ'লে, বিপ্লবের নতুন আঁচ নরম পড়ে গেলে, তখনো যদি এই নিজস্ব ধনে বিতৃষ্ণার ভাব, পরের অভাব-মোচনে আগ্রহের ভাব, দেশে সজীব থাকে, তাহলে USSR বাস্তবিকই পৃথিবীর যত রাজ্যকেই বল, যত ধর্মসম্প্রদায়কেই বল, একটা নতুন আদর্শ দেখিয়ে দেবেন।

আমরাও তাহলে প্রবাসীর কথায় নিজের ভাবে সায় দিয়ে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবো, USSR নীলকণ্ঠের মতো বিষয়ের বিষ টেনে নিয়ে, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করার মন্ত্রে সমীকরণ যজ্ঞ সফল ক'রে, কলির ক্ষয় ক'রে এনেছেন।

গ্রামের কথা

সূর্য অস্ত যায় যায়, কিন্তু এখনো বেশ আলো আছে। তবু গ্রামে ঢুকতেই যেন প্রকৃতির প্রফুল্ল ভাবের উপর একটা ছায়া প'ড়লো। রাস্তার দুধারের বাড়ীগুলোয় অযত্নের নানা লক্ষণ নজরে ঠেকলো,—বেড়া, উঠন, ঘর-দোর সবই কেমন বে-মেরামৎ। Trinityর* উৎসব এলো ব'লে, কিন্তু আমাদের ছেলে-বেলার সে সাজ-সজ্জা কৈ? কোনো চালে নতুন খড় ওঠেনি, কোনো দরজায় নতুন রং পড়েনি।

বুঝলাম, সমবায় নিয়ে দোটানা ভাবের এই মূর্ত্তি। পাছে অবশেষে সমবায়ে না গিয়ে উপায় থাকবে না মনে ক'রে কেও হাতে রেখে খরচ করছে, কেও বা সমবায়ে যোগ দিয়েছে, কিন্তু ভালো মনে দিতে পারেনি ব'লে পরের কাজ ভেবে হাত সরছে না।

গ্রামে এখন আমাদের জ্ঞাতি আর নেই। আমার চোদ্দপুরুষ এখানেই জন্মেছে, মরেছে, বংশের শিকড় গেড়েছে, কিন্তু এ আমলে আমরা সে শিকড় উপড়ে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছি। আমার এখন নতুন জীবন, নতুন মন, নতুন আকাঙ্ক্ষা; তবু মনে হচ্ছে এ গ্রামের সকলেই আমার আপনার। মাঠ, জলা, জঙ্গল, কোথায় কি ছিল, সবই আমার মনে গাঁথা আছে। সেখানে সাথীদের সঙ্গে কত খেলেছি, বনের ফল, পাখীর ডিম কত পেড়েছি, পালক কুড়িয়ে এনে যে-যার মাকে বালিশ তোষক করতে দিয়েছি।

কিন্তু এ কি? বিলের ধারের জঙ্গলটায় ত কিছু ছিল না,—আজ

* ইহুদিদের সেকেলে নবান্ন গোচের উৎসবের খৃষ্টান সংস্করণ।

সেখানে মস্ত একটা বাড়ী দেখছি! কাছে গিয়ে দেখি এটা নতুন তৈরি স্কুল-বাড়ী, শাদা রঙের দরজা-জানালা, উপরে-লেখা বড় বড় অক্ষরের নামটা আমার দিকে প্যাট প্যাট ক'রে চেয়ে না থাকলে বিশ্বাসই হ'ত না।

আমার ছেলে বেলায় এখানকার চাষারা লেখা পড়ার ধার ধারত না। তাদের চিঠিপত্র লিখে প'ড়ে দিয়ে আমি ঝুড়ি ঝুড়ি আপেল ফল দক্ষিণে পেয়েছি। মনে পড়ে, একবার জাপান যুদ্ধের সময় একজন বিদেশী এসে পুরোনো খবরের কাগজ থেকে যুদ্ধের কথা শুনিয়ে ছু'চার বস্তা বাজরা আদায় ক'রে নিয়ে গেল।

এখন স্কুলের ছুটি। কিন্তু ভিতরে ঢুকে দেখি এক ধারের ঘরে সার সার খাট প'ড়েছে, তার উপরে ধব ধবে বিছানা পাতা। শুনলাম, চাষা গিন্নিরা সমবায়ের কাজে বেরলে, এটা তাদের ছেলে রেখে যাবার জায়গা। ছেলেরা বেশ খুসী মনে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে।

আমায় দেখে দাই এগিয়ে এসে অনেক গল্প করলে। হাসতে হাসতে বল্লে, প্রথম প্রথম ভারি আপত্তি উঠেছিল, ছেলেদিকে চাষী-প্রথা-মতো ঘোলে ভেজানো বাজরার রুটি না খাইয়ে খাঁটি দুধের উপর শুখিয়ে রাখা হচ্ছে।

আমার কাছে কিন্তু বড় হাসির কথা নয়। মনে প'ড়ে গেল ছেলে-বেলার আদরিয়া (Adarya) গিন্নির কথা। তেরো বছরে তার তেরোটি ছেলে হ'য়ে সবক'টি মারা যায়। অখাদ্য কাকে বলে, নোংরা কিসে হয় কিসে যায়, না জানার এই দুর্দশা। বেচারীর কাঁদতে কাঁদতেই জীবন কেটেছিল।

স্কুল-বাড়ী ছাড়িয়ে আর একটু যেতে, ঠিক যেখানটায় আমাদের বাড়ী ছিল, সেখানে দেখি সাজসরঞ্জাম সমেত একটা দমকল ঘর। এ রকম

সব খোড়ো চালের গ্রামে আগুন-লাগা কি সর্বনেশে কাণ্ড মনে করলে এখনো বুক কাঁপে। জলের যোগাড় নেই, একসঙ্গে চলাবলার অভ্যেস নেই; যে জল আছে এলো-মেলো আপসা-আপসীর চোটে তাও পৌছয় না; কেওবা বাধা দিয়ে বলে, দেবতার কোপ জলে শান্ত হবে না, দুধ চাই; ফলে, আগুন ঘরের পর ঘর গ্রাস করছে, হাত-পা এলিয়ে তাই দেখতে হ'ত।

আমাদের আমলে বছরে বছরে কত শত গ্রামে এই বুক-ফাটা ঘটনার আবৃত্তি চলতো। শেষে ঘর-পোড়া চাষাগুলো এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে ভিক্ষে ক'রে আবার বাড়ী করার কাঠ-খড় আনতে বেরতো। এখন তাহলে তারো উপায় হয়েছে।

এবার চেনা-লোকের পাড়ায় এসে পড়েছি। চারদিক থেকে—"এস, এস, একটু ব'সে যাও, একপাত্র দুধ খেয়ে নাও,"—সমাদরের ডাকাডাকি চল্লো। তাদের অনুরোধ এড়িয়ে শেষে ছেলেবেলার এক বন্ধুর বাড়ী গিয়ে উঠলাম। আমাকে পেয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মহা খুসী, তাড়াতাড়ি নিজের নিজের কাজ সেরে নিয়ে প্রচুর দুধ পনীর ডিমহালুয়া সাজিয়ে খেতে বসিয়ে দিলে। সেখানেই রাত কাটালাম।

গ্রাম্য বৈঠক

পরদিন রবিবার, সকলেরই ছুটি। রাস্তায় বেরিয়ে দেখি প্রবাসী ফিরে আসার খবরে অনেকে আমায় দেখতে আসছে, তা ছাড়া ছুটি বলেও রাস্তায় লোকের আনা-গোনা বেশী। কামারের বাড়ীর সামনে ফাঁকা জায়গাটায় কাটা গাছের গুঁড়ির উপর আমরা সব আড্ডা ক'রে ব'সলাম।

সমবায়ে সব কিছু দিয়ে-থু'য়ে যে নিস্ব (Bedniak) হয়েছে, বিপ্লবী-হিসেব-মতো সেই মান্য-গণ্য ; যে অসমবায়ী গৃহস্থ নিজে আলাদা খাটে খায় (Seredniak) সে মাঝামাঝি ; যে পরকে খাটিয়ে নিজে আলস্যের আরামে থাকার চেষ্টা করে সে হেয় কুধনী (Koolack)। কিন্তু গ্রাম-সমাজে এ সব শ্রেণী-ভেদের চিহ্ন দেখা গেল না ; এখানে মাত্র দুই দল—যারা সমবায়ের পক্ষপাতী, আর যারা সমবায়ের বিরোধী।

মার্কিন দেশের গল্প শোনাবার জন্যে আমায় সবাই ধ'রে ব'সলো। আমি কিন্তু সে আবদার কাটিয়ে বল্লাম—"না, সে হবে না। আমি তোমাদের কথা শুনতে এসেছি, তোমরাই সব বলো।" সব দলের লোক আছে দেখলাম—যার যা মতামত জেনে নেবার এমন সুযোগ ছাড়ি কেন ?

একটা বুড়ো চাষা আরম্ভ ক'রে দিলে—"একটা জিনিষ আমরা খুব শিখেছি—গোরু ঘোড়া ভেড়া আর বাড়ানো নয় !"

বুঝলাম, এটা রাগের কথা। যেটুকু না দিলেই নয়, তার বেশী সমবায়ের হাতে দেওয়া হবে না, তাতে দেশের অভাব বাড়ে বাড়ুক,—বিরোধী পক্ষের এই ভাব। যারা এসেছে তাদের মধ্যে কর্তৃপক্ষের লোকও রয়েছে, তবু কেও ছেড়ে কথা কইবার পাত্র নয়।

আর এক চাষা ব'লে চল্লো—"এই দেখ না, সেদিন আমার বাড়ী পেয়াদা চড়াও হ'ল। দোষের মধ্যে আমার একটা তিন-কাল-যাওয়া বিচিলি কাটার কল আছে, তা দিয়ে বছরে সামান্য কিছু রোজগার ক'রে থাকি, তাই দেখে আমাকে কুধনী সাব্যস্ত করার চেষ্টা। আমি হেসে বল্লাম—লোভ হয়ে থাকে, লোহার দামে তোমরা ওটা নিয়ে নাও—তবে পেয়াদা থামলো। কিন্তু তাতেও পার নেই।—তোমার গোরু ক'টি ? আমি বল্লাম—একটি। দেখিয়ে দাও।—নিয়ে চল্লাম গোয়ালে। দুটি

দেখছি যে।—ও টিত বাছুর। পেটে বাচ্ছা, বাছুর কেমন?—বাচ্ছা পেটে থাকলে ত গাই হয় না, বাচ্ছা আগে হোক। এই ব'লে আমি গিন্নিকে ডাক দিলাম। সে এসে এমনি তুড়ে দিলে যে পেয়াদা পালাতে পথ পায় না!"

সকলে। "এই ত গিন্নি বলি!"

সৈনিকের মতো ঢ্যাঙা লোককে একজন ডেকে বল্লে—"এই যে নিকোলাই, বল না হে, কর্তারা তোমাকে কি নাকালটা করেছিল।"

নিকোলাই। "থাক্ না, সে সব পুরোণো কথা খুঁচিয়ে তুলে কি হবে?"

সকলে। "না, না, ব'লে ফেলো। আমাদের মার্কিন অতিথি সব জানতে চায়।"

নিকোলাই। "আমি গোড়াতেই ভেবেছিলাম, সমবায়-ভুক্ত হব; কিন্তু গিন্নি বেঁকে ব'সলো, বল্লে তাহলে গলায় দড়ি দেবে, তাই হ'ল না। শেষে আমার সব কেড়ে কুড়ে নিলে, রাখার মধ্যে মণ কতক খাবার দানা, আর দু'চার বস্তা আলু রেখে গেল। এখন সমবায়ে ঢুকে নির্বাসন থেকে বেঁচেছি।"—এইটুকু ব'লে নিকোলাই স'রে পড়লো।

এক বুড়ো। "আমাদের নিকোলাইর মতো হিসিবি মানুষ আর দেখা যেতো না। রোদ ঝড় জল যাই হোক না কেন সে সমানে রোজগারের ফিকিরে ঘুরে বেড়াতো। বিচিলির গাড়ি থেকে দু'এক গাছ প'ড়ে গেলে ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে আনতো। আলু তোলার সময় কাঁচা পচা কিছু বাকি রাখতো না। আমোদ নেই, আহ্লাদ নেই সহরে কাজে গেলে সখ ক'রে ময়দার রুটি টুকু মুখে দিতো না। এত ক'রে জমানো ধন এ রকম বেঘোরে মেরে নেবে, কে জানতো!"

অন্য গ্রামের এক সমবায়ী-যুবক এ কথা শুনে আলোচনায় যোগ দিলে।

"এত করার যে কথা ব'লছ, এত ক'রে লাভটা হ'ত কার? আশ-পাশে যারা আধ-পেটা খেয়ে আছে, তাদিকে কি খাওয়াতো? নিজেও খেলো না, ম'লে সঙ্গেও যাবে না, তবে কিসের জন্যে জমালো? তার চেয়ে মানুষের মতো থাকলে হ'ত না? তোমাদের নিকোলাইকে চিনিনে, কিন্তু আমাদের গ্রামের কামারটা ঐ রকম ছিল। সে মরার পর ঘর থেকে, গুদম থেকে, চালের ভিতর থেকে, কি যে না বেরলো, বেশীর ভাগ ফেলে দিতে হ'ল। সকলে জানতো তার মোহর-ভরা বাক্স আছে। খোঁজ, খোঁজ, কোথাও পাওয়া যায় না, শেষটা পায়খানার তলার মাটি খুঁড়ে বেরলো। কি যাচ্ছেতাই জীবন!"

বুড়ো "তোমাদের মতো লক্ষ্মীছাড়া নিস্ব হ'য়ে ঘুরে বেড়ানো সব চেয়ে ভাল,—না?"

যুবক। "ভাল নয় ত কি? আমরা ভাল খাই পরি, পরস্পরের সুখ-দুখের ভাগ নিই, পরদেশেরও খবর রাখি, মানুষের জীবন কেমন হওয়া উচিত তাই নিয়ে ভাবনা চিন্তে করি, সেই মতো চ'লে বেঁচে সুখ পাই।"

অনেকে। "ঐ সমবায়ের গোঁড়া আসছে। এসো মাসী! তুমি ত সমবায়কে স্বর্গ মনে কর! প্রবাসী ভায়াকে সব বলো না।"

মাসী। "হাঁ, ঘণ্টা-নাড়ার স্বর্গ বটে! ঘণ্টায় ওঠো, ঘণ্টায় খাটো, ঘণ্টায় খাও, ঘণ্টায় শোও—ঘণ্টা না পড়লে মা-হারা-পাখী-ছানার মতো চিঁ চিঁ করতে থাকো।"

এক রসিক। "মাসী দেখছি বাজনা-বাদ্যি ভালো বাসে না।"

সকলে হেসে উঠলো।

মাসী। "সত্যি কথা, ঘণ্টার বাজনায় নেচে বেড়াতে ভালবাসিনে। পরশু দিন কাজে মন লাগলো না, চৌপরদিন প'ড়ে ঘুমোলাম। কাল ক্ষিধে

হ'ল, পাঁচ বার খেলাম। সমবায়ে থাকলে আমার জন্যে পাঁচ বার ঘণ্টা পড়তো ?"

সকলে। "সাবাস, মাসী, সাবাস !"

সমবায়ী যুবক। "যখন ফসল কাটা হবে, তোমরা ভাল খাও, কি আমরা ভাল খাই দেখা যাবে।"

বুড়ো। "ভারি ত বাহাদুরী ! দেশের যত ভাল জমি ঘোড়া গোরু তোমাদের সমবায় নিয়ে ব'সে আছে। কাঠ চাও, কলের লাঙ্গল চাও, টাকা হাওলাত চাও, সদর থেকে তখনি যুগিয়ে দিচ্ছে। আমরা অমন সুবিধে পেলে তোমাদের চেয়ে অনেক কারদানী দেখাতে পারতাম।"

একজন মোটা-সোটা গ্রামবাসী এগিয়ে এল—"নিস্ব কাকে বলে জানতে চাও ত আমায় দেখো ! আগেও নিস্ব এখনো তাই। তবে আগে পাঁচ সাত মুদ্রা যোগাড় ক'রে টেক্সটুকু দিতে পারলেই চুকে যেতো, আর জ্বালাতন করতো না। কুকুরটা পর্যন্ত বাড়ী ঢুকতে পেতো না। এখন টেক্স লাগে না বটে, যা দরকার তাও পাই, কিন্তু খানাতল্লাসের জ্বালায় প্রাণ যায়। আর কেটে নেয় কত—বাড়ীর বিমা, ফসলের বিমা, এর পর বলবে হাত-পার বিমা !"

এক শ্রোতা। "আরে ভাই, বিমা কি খারাপ জিনিষ ?"

নিস্ব। "খারাপ কে বলছে ? কিন্তু আমার খাটুনির দাম থেকে কাটবে কেন ? নিস্ব বলে কি আস্ত আস্ত মুদ্রা কাটা গেলে মায়া লাগে না ?"

আবার হাসি প'ড়ে গেল।

১ম শ্রোতা। "খুচরো অসুবিধের কথা ছেড়ে দাও। আমি বলি গোড়ায় গলদ। দেখো প্রবাসী ভায়া, তুমি ত জান একই পরিবারের মধ্যে

লোকে গালাগলি চুলোচুলি না ক'রে থাকতে পারে না ; আর এই পরকে নিয়ে সমবায় করা, এতে ঝগড়াঝাঁটি হাতাহাতি লাগবে না? কিছু দিনের মেয়াদ হলেও হ'ত, এ যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত !"

২য় শ্রোতা। "যা বলেছ ভাই। খাওয়া পরা ঠিক থাকলেই ত হয় না, নিজের ইচ্ছে মতো ফসল লাগালাম, ইচ্ছে মতো খাটলাম কি ব'সে রইলাম, জমালাম কি খরচ করলাম,—এ না হ'লে কি সংসার করা বলে। আমরা তো জেলখানায় আছি,—যা বলবে তাই করো, যা দেবে তাই খাও, পরের ভাবনা ভেবে মরো।"

৩য় ব্যক্তি। "দেবার অবিচার কেমন, দাও দেখ। এক গিন্নির দশ ছেলে সে দশ মাপ দুধ পাবে, আর যে বেচারীর একটি ছেলে সে এক মাপের বেশী পাবে না।"

বুড়ো। "আমাদের স'রে পড়বার সময় হয়েছে। গলায় দড়ি দিয়ে সংসার থেকে বিদায় নিলে তবে বাঁচবো। এখন হয়েছে ছোঁড়াদের রাজত্ব।"

আমি বুঝলাম, বুড়ো বিপ্লবের ঝাঁকানি খেয়েছে, কিন্তু তার ভাবটা মাথায় থিতিয়ে বসাতে পারে নি। পুরোণো ছাড়লে সামনে দেখে অতল গহ্বর, তরাসেই হয় সারা। জিজ্ঞেস করলাম—"সমবায়-ভুক্ত করার জন্যে কি জবরদস্তি লাগিয়েছে?"

সকলে। "না, না, তা নয়। আগে পেড়াপিড়ি চলতো বটে, কিন্তু কর্তার মহা ভাঙনের উপদেশ বেরবার পর সে সব আর হয় না।"

এক ব্যক্তি। "হয় না ব'লছো কি ক'রে? সমবায়ে যোগ না দিলে ঘ্যানর-ঘ্যানরের চোটে কি সোয়াস্তি থাকে? অত্যেচারও আছে বৈ কি। সেদিন, মনে নেই, ঐ পোল (Pole) পাড়া থেকে ভরা-শীতে মেয়ে-

ছেলে-শুদ্ধ কতজনকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিয়ে উত্তরে খাটতে পাঠিয়ে দিলে। বাপ রে, সে কি কান্নাকাটি!"

যুবক। "ওরা ত সব কুধনী।"

বুড়ো। "ভাল এক কুধনী কথা শিখেছ! ধনীদের কি রক্তমাংসের শরীর নয়,—ওদের ছেলেপিলে শীতে মারা পড়লে আমাদের গায়ে লাগে না?"

যুবক। কাল-স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে দুঃখ ত ডেকে আনা হয়। ক'টি স্ত্রীলোক-বালকের খাতিরে বিপ্লব আটকে থাকতে পারে না। আগেকার আমলের বিকট অত্যোচারের কথা তোমরা ভুলেই যাচ্ছ। তার জন্যে যদি সম্রাট আমলা জমিদার পাদ্রী সবই সরাতে হ'ল, তবে কুধনীর শেষ রাখলেই বা চলবে কেন? বিপ্লব আমাদের পিঠে হাত বুলোতে আসে নি, মানুষ ক'রতে এসেছে। কর্মীরা দেবতা নয় সে ত জানা কথা,—মানলাম মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি ক'রে বসে; কিন্তু ধরা পড়লে উপর থেকে সাজা ত পায়।"

এমন সময় এসে প'ড়লো ফিটফাট পোষাক বুট-জুতো-পরা সদরের প্রচারক, গ্রামে গ্রামে যারা সমবায় পত্তন ক'রে বেড়াচ্ছে, তাদের এক জন। ওকে দেখে সকলে একটু শশব্যস্ত হয়ে পড়লো বটে, কিন্তু বিরক্ত হ'ল না, ভালভাবেই আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলে।

সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আরম্ভ ক'রে দিলে—"কি গো! নাকে কান্না হচ্ছিল বুঝি? বেশ, বেশ, প্রাণ ভ'রে কাঁদুনি গাও! দেখুন, প্রবাসী মশায়, এরা সব শিশু; দিনে খুব ক'রে কেঁদে না নিলে রাতে ভাল ঘুম হয় না।

"শোনো হে, হতভাগা অসমবায়ী যারা আছ! আমার কথাগুলো

একটু মন দিয়ে শুনে যাও। বলি, তোমরা কি সুখে টুকরো টুকরো জমি-গুলো এখনো ধরে আছ? এই মার্কিন ভদ্রলোকের সামনেই বিচার হোক, ইনিও শুনুন। বছরে বছরে বুড়োরা স'রে যাচ্ছে, রেখে যাচ্ছে অনেক ছেলে, জমির ভাগ ছোট থেকে আরো ছোট হতে চলেছে। আলে আলে কত জমি খেয়ে যায় সেটা হিসেবে আনো কি? আর আজ-কাল হ'ল কলের যুগ, আল থাকলে কলের লাঙ্গলের সুবিধে পাও না। পুরোনোর মায়া কাটাতে পারছো না, শেষটা কি আমার, আমার ব'লে বাড়ি আঁকড়ে না খেয়ে মরবে?"

এক শ্রোতা। "আপনাদের সমবায় আসার আগে কি খেতে পেতাম না?"

প্রচারক। "কেন বাজে কথা বল, বাপু? তোমাদের সে খাওয়া কি খাওয়া ছিল,—না আধমরা থাকাকে বাঁচা বলে? দশ বিশ বছর পরে কি হবে সেটা ভাবা ত তোমাদের ধর্মে নেই, নইলে বুঝতে দেশের ছেলেদের উন্নতির জন্যে কি রকম আয়োজন চলেছে। তোমরা যে কত বোকা, সেটুকু বুঝলেও কাজ হয়। এই ক'বছর আগে যখন ও গ্রামের জমিদার বাড়ী ভাঙা হ'ল, তখন তোমাদের স্কুল-তৈরীর জন্যে মাল-মসলা দিতে চেয়েছিল,—ব'য়ে আনতে হবে ব'লে তোমরা নিলে না। পরে ত চাঁদা তুলে সেই স্কুল করতে হ'ল, তাও কি সোজায়,—চাঁদার টাকা আদায়ই হয় না। স্কুল হ'য়ে খুসী হও নি, এখন বুকে হাত দিয়ে বলতে পার? সমবায়ের কোন্ কাজটা অন্যায় হয়েছে বল ত দেখি? দমকল ক'রে দিয়েছে, জলাগুলোর উপর সাঁকো বসিয়েছে, সমবায়ে যোগ দিলে কত শস্তায় জিনিষপত্র পাও—"

২য় শ্রোতা। "রেখে দিন আপনার সমবায়, সমবায়ের কথা আলাদা"—

প্রচারক। "আলাদা ত বটেই। যেমন-কে-তেমনি থাকলে আজও সম্রাটের আমলার ঠেলার মজা বুঝতে,—সে সব দিনের যন্ত্রণা ত হজম ক'রে বসে আছ।

"আসল ব্যাপার কি, তা বুঝেছি। ফাঁক তালে ধনী হবার লোভ ছাড়তে পারছ না! কিন্তু খবরদার! সে পথে গেলে ম'রবে। ও মায়া পুষে রেখো না। কর্তারা কুধনীর ওষুধ জানে, তা ত দেখতেই পেয়েছ। ধরা পড়লে ছাড়নছোড়নের আশা ক'রো না। প্রবাসী মশায় নতুন এসেছেন, তোমাদের ফোঁপানিতে তিনি ভুলতে পারেন, আমরা ভুলবো না। তোমরা ইচ্ছে করো, আর নাই করো, তোমাদের সকলকে সমবায়ী শ্রমিক ক'রে মানুষ ক'রবো তবে ছাড়বো!"

বেলা হ'য়ে এল, মজলিস ভেঙে গেল, আমরা যে-যার বাড়ী চলে এলাম।

জমিদার-রাখালের কথা

ইহুদি জমিদার ইব্রাহিম-দাদাকে আমার বেশ মনে ছিল। লম্বা শরীর, চোস্ত চেহারা, ফিট-ফাট পোষাক, হাসি-খুসী মানুষ। ইহুদীদের অবশ্য জমিদারী সত্ব পাওয়ার অধিকার ছিল না, তবে তিনি ছিলেন বড় জোতদার, ব্যবসাদারও বটে। প্রদেশের মধ্যে তার গোরুর পাল বিখ্যাত। রাস্তা থেকে একটু ভিতরের দিকে তাঁর সুন্দর সাজানো বাড়ী, ফুলবাগান, ফলবাগান সমেত বেশ পরিপাটী।

আমরা যখন গ্রামে ছিলাম, এ পাড়ায় এলে ইব্রাহিম-দাদা প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে চা* খেয়ে যেতেন, সে সূত্রে আমাদের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্বও হয়েছিল। বিপ্লবের পর তাঁর আর খোঁজ রাখতে পারি নি। এখন শুনলাম তিনি সমবায়-ভুক্ত হ'য়ে বাড়ীতেই আছেন।

কথাটা একটু আশ্চর্য লাগলো, কারণ সমবায় হ'ল চাষীদের, জমিদার বা জোতদারদের তাতে কেমন ক'রে স্থান হতে পারে? তবে সম্রাটের আমলে ইহুদীদের উপর অমানুষিক উপদ্রব হয়েছিল ব'লে বিপ্লবের পর তারা অনেক বিষয়ে আসান পেয়েছে শোনা যায়। শুনলাম ইব্রাহিম নাকি সমবায়ের গোরুর পালের খবরদারী করার ভার পেয়েছেন। আগেকার দিনে কাওকে রাখাল বল্লে গাল দেওয়া হ'ত,—আজকাল অবশ্য ওটা সম্মানের পদ। তবু সেই সৌখীন-প্রাণ ভদ্রলোক রাখাল-গিরি করছেন,—কেমন খাপছাড়া ঠেকলো। ভাবলাম যাই, দেখে আসি।

বাড়ীর হাতায় ঢুকেই তফাৎ বুঝতে দেরী হ'ল না। একি সেই বাড়ী? কোথা সে চেকনাই, কোথায় সে ফুলের বাহার? বাগানের বেড়া ভাঙা, রাস্তায় আগাছা ঠেলে উঠেছে, সব শুদ্ধ পোড়ো চেহারা। এখন ঘরে ঘরে অনেক সমবায়ী পরিবারকে থাকতে দেওয়া হয়েছে, তাদের ছেলে পিলেরা চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে; গাছে গাছে দড়ি টাঙ্গানো, তার উপর সকলের কাপড় শুখোচ্ছে।

"ইব্রাহিম কোথায়?"—জিজ্ঞেস করায় একটি ছোট মেয়ে বল্লে তিনি মাঠে গোরু চরাচ্ছেন।

---

* রুষ গৃহস্থদের বাড়ীতে সারাদিন samovar-এ চা চড়ানো থাকে। কেও দেখা করতে এলে এক গেলাস গরম চা, দুধ চিনি দিয়ে নয়, নেবুর রস দিয়ে তৈরী করে আতিথ্য করা রীতি।

বিলের ধারে মাঠে গিয়ে দেখি, ঘাসের উপর ইব্রাহিমদাদা ব'সে, হাতে গোরু খেদাবার চাবুক। চেহারার সে চাকচিক্য আর নেই, অনেক দিন দাড়ি কামানো হয় নি, পাজামা গুটোনো, খালি পা, বেশ একটু বুড়িয়ে গেছেন। সামনে এক পাল গোরু আরামে ঘাস খাচ্ছে।

প্রথমটা ইব্রাহিম আমায় চিনতে পারেন নি, নাম বলতে খুসী হ'য়ে উঠলেন; তখন মুখে আগেকার জেল্লা কতক ফিরে এলো। তাঁর পাশে ঘাসের উপর ব'সে তাঁকে আমার দেশে আসার কারণ জানিয়ে দিলে পর তিনি নিজের কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

"বুড়ো হয়ে গেছি, না? কিন্তু যত দেখাচ্ছে তত নয়। বুড়ো বয়সের উপযুক্ত হাল্কা কাজও পেয়েছি। এই দেখ আমার হাতিয়ার! সেনানায়কের যেমন তলোয়ার, আজ এরও তেমনি মহিমা।" ব'লে তার হাতের চাবুকটা আমার সামনে তুলে ধরলেন।

"মার্কিন-দেশে যখন ফিরে যাবে, তোমার মাকে যদি বলো আমায় রাখাল করে দিয়েছে, তিনি হয়ত কেঁদেই ফেলবেন! তোমরা আমায় কত বড়-লোক ঠাওরাতে মনে আছে?"—ব'লে ইব্রাহিম হেসে উঠলেন।

প্রথমটা সন্দেহ হ'ল, বুঝি কাষ্ঠ-হাসি। কিন্তু কৈ, না গলার স্বরে, না চোখের চাউনীতে, খেদের লক্ষণ কিছুই দেখলাম না। বেশ সহজ প্রশান্ত ভাবে তিনি ব'লে চল্লেন—

"মাকে বুঝিয়ে ব'লো, কাঁদবার কিছু নেই,—সুখেরই কথা। আমি নিজে, কাঁদা দূরে থাক, যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝছি যা হয়েছে ভালই হয়েছে। বিপ্লবের মধ্যিখানে বাস করলে কত রকম প্রশ্ন মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে,—আগেকার দিনে সে সব কথা তুল্লে ব'লতে

পাগল। হ'তে পারে আমরা সকলে পাগলই হয়েছি, আবার এও হতে পারে, আগেই ছিলাম পাগল এখন সহজ মানুষ হয়েছি। আমায় তোমার খুব অদ্ভুত লাগছে,—না?"

"ও কথা কেন বলছেন, দাদা?"—অমি আপত্তি ক'রে উঠলাম।

"তুমি যে দেশ থেকে আসছ, সেখানকার লোকের কাছে আমাদের এ সব ব্যাপার কত অদ্ভুত ঠেকে, তা জানি, তাই কথাটা মনে হ'ল, ভাই।"

ইতিমধ্যে এক গোরু দল ছেড়ে ফসল-ক্ষেতে গিয়ে পড়লো। তাই দেখে, ইব্রাহিম লাফ দিয়ে উঠে, তার পিছন পিছন ছুটে, চাবুকের ফটাস ফটাস আওয়াজে তাকে ঘুরিয়ে আনলেন। মুখের ঘাম মুছে আবার এসে ব'সতে, তাঁর অনেকখানি বয়স যেন ঝরে গেল। নিজের কাহিনী তিনি আবার বলে যেতে লাগলেন—

"আমাদের সমবায়ে এক বুড়ো চাষা আছে সে লেখাপড়া জানে না বটে, কিন্তু বুদ্ধি টন্‌টনে। আমায় সমবায়-ভুক্ত হতে দেখে সে আহ্লাদে আটখানা। হাতে ধরে বল্লে—বেশ ক'রেছ ভাই। টঙে চ'ড়ে ব'সে থাকো নি, আমাদের দলে নেমে এসেছ, তোমার সুবুদ্ধির উপযুক্ত হয়েছে। একলসেঁড়েপণায় লাভটা কি? প্রতিবাসী যে জিনিষের নাগাল পায় না, তা একা ভোগ ক'রে কি সত্যিকার তৃপ্তি হয়?

"সেকালে এ প্রশ্ন শুনলে হেসে উড়িয়ে দিতাম; এখন তা পারি না, নিজের মনেই সে কথা দিন রাত উঠছে। এই কথাই তোমাকে বলবার আছে। আমাকে সমীকরণপন্থী কি অরাজকপন্থী, কি কোনো একটা পন্থী মনে ভেবো না। আমি যে কি তা নিজেই জানিনে, জানার দরকারও দেখিনে। মোট কথা পুরোনোর জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলে বেঁচেছি, আগের ভাব এখন মনে ক'রলে লজ্জা হয়।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম—"আপনার স্ত্রী, ছেলেরা,—তাঁদের ভাব কি?"

"ছেলেরা ত অনেক দিন থেকে বিপ্লবের পক্ষে। স্ত্রীও আস্তে আস্তে মন ঘুরিয়ে আনছেন। ইহুদী ব'লে আমরা অনেক বিষয়ে রেহাই পেতাম, তবু জোতদার থাকতে এ টেক্স সে টেক্স দিতে শাঁস ক্রমশই কমে আসছিল। অন্য দিকে যে প্রশ্নের কথা তোমায় বল্লাম, মনের মধ্যে তাও খেলছিল—আমরা খাব মাংস মাখন পনীর শাদাময়দার রুটি, আর আশপাশের মানুষের জুটবে খালি শাক-সবজীর ঝোল দিয়ে বাজরার কালো রুটি,—এটা কি ঠিক?

"বুঝলাম, ঐহিক পারত্রিক দুদিকের ঠেলায় দুনৌকোয় পা দিয়ে থাকা চলে না। গত শরৎকালে একদিন পরিবারের সকলকে ডেকে পরামর্শে ব'সলাম। আমি বল্লাম—দেখো এভাবে থাকা পোষাচ্ছে না; এসো, পুরোনোর মায়া কাটিয়ে নতুনকে ধরা যাক।

"রাত ভোর বকাবকি, চোখের জল ফেলাফেলি চল্লো; শেষে সকলের মন খোলসা হ'য়ে গেল, পরস্পরের প্রতি আড় ভাব রইল না। সবাই মিলে স্থির করলাম—ভাল মনে সমবায়ী হব। শুধু জমি কেন, বাড়ী ঘর জানোয়ার আসবাব পত্র, নিজের ব'লে আর কিছুই রাখবো না, সত্যিকার নিস্ব হয়ে ব'লবো—যা করে সমবায়।

"এ রকম কাজ আধা-খেঁচড়া করা কিছু নয়, ইসপার নয় উসপার! তাই আমরা খালি হাতে পরিষ্কার মনে সমবায়ে যোগ দিলাম।

"সবই সুখের হয়েছে, তা মিথ্যে ক'রে বলবো কেন? সমবায়ের হাত এখনো পাকে নি, কিছু ঢিলেমী আছে, কিছু বা নষ্টামি, অনেক গলতি আছে যেগুলো মাঝে মাঝে পীড়া দেয়। আগেকার মতো

ভাল খেতে পরতে পাই, তাও নয়। দেখছ ত খালি পায়ে আছি, জুতো বাঁচিয়ে না চল্লে শীতকালে করবো কি?

"কিন্তু দুঃখের কথাই বা এমন কি আছে? এই পুরোনো বাড়ীর দুটি ঘরে আমাদিকে থাকতে দিয়েছে। দুধ রুটি যথেষ্ট দেয়, মাঝে মাঝে ডিম পাই, হপ্তায় একদিন মাংস,—পুষ্টির কমতি নেই।

"আসল লাভ হয়েছে কি জান? হৃদয়ের খিল খুলে গেছে, মনের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। আমার সেই একার বাড়ী এখন কত লোককে আশ্রয় দিচ্ছে। তাদের ছেলেপিলের সঙ্গে খেলা ক'রে যে আনন্দ পাই, তার রস আগে জানাই ছিল না।—এই ত ব্যাপার, বুঝলে হে ভায়া!"

সমবায়-নেতার কথা

আমাদের গ্রামের চাষারা সমবায়ে অনেকে ঢুকতে পিছপাও বটে, কিন্তু সকলেই আমায় বলে—সমবায় দেখবে ত ক-গ্রামেরটা দেখো, ও রকম পেলে আমরা সবাই যোগ দিতাম। ক—গ্রাম বেশী দূর নয়, তাই অবসর মতো এক দিন হেঁটে চ'লে গেলাম।

সে গ্রামে পৌছে প্রথমটা নতুন কিছু চোখে পড়লো না,—

চার দিকে সেই অযত্নের লক্ষণ, শুয়োর মুর্গিগুলো রাস্তায় উঠনে, বাড়ীর ভিতর, যেখানে সেখানে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমবায়ের আস্তানাটা গ্রামের ও-পারে, সেদিকে যেতে তবে নতুন জীবনের নড়াচড়া জানান দিলো। ইটকাঠ খড় বোঝাই গাড়ীর উপর গাড়ী আনাগোনা করছে—এ দৃশ্য গ্রামে বড় একটা দেখা যায় না।

সমবায়ের আপিস ঘরের সামনে এসে, না ব'লে ক'য়ে ঢুকে পড়লাম। সবে তৈরী বাড়ী, এখনো টাটকা কাঠের সুগন্ধ ছাড়ছে। ঘরের দেয়ালে বিপ্লবীকর্তাদের ছবি টাঙানো, একটা তাকে মলাটের উপর কাগজ-মোড়া বই সাজানো, বড় বড় দুই জানলা দিয়ে হাওয়া আলো আসছে।

আমার দিকে পিঠ ক'রে দুটি যুবা এক লম্বা টেবিলে ব'সে একমনে হিসেব মেলাচ্ছে। আমি গলার আওয়াজ দিতে তারা আমার দিকে ফিরে, তখনি অভিবাদন ক'রে আমাকে বসতে বল্লে। এদের মধ্যে একজন সমবায়ের নেতা, বছর ত্রিশেক বয়স হবে, প্রফুল্ল তেজী চেহারা; অন্যটি তার সহকারী, বাইশ বছরের সুন্দর নীল-চোখো ছোকরা। দুজনেই চাষার ছেলে। আমার দেশে আসার সংবাদ এরা আগেই পেয়েছিল, বল্লে আমাকে ডেকে এনে সব দেখাবার ইচ্ছে ছিল। আমি আপনি এসে পড়ায় আনন্দ প্রকাশ করলে।

নেতার ইঙ্গিতে সহকারী উঠে গেল; একটু পরে আমার জন্যে একটি রেকাবে বাজরার রুটি আর একপাত্র দুধ এনে দিলে। আমি খেতে বসলে নেতা বলতে লাগলো—

"আপনি চাষাদের সব কাঁদুনি শুনেছেন নিশ্চয়ই?"

"খুব শুনেছি!"

দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ী ক'রে মুচকে হাসলো। নেতা বল্লে—"কিছু-দিন থাকলে আরো অনেক শুনবেন। যে কাঁদে না সে চাষাই না!

আমি ভুক্ত-ভোগী, জেনে বুঝেই বলছি। আমার এক খুড়োমশায় আছেন, তিনি কাঁহুনের সরদার।"

আর এক পত্তন হেসে—"আসুন আপনাকে সব দেখাই"—ব'লে দুজনে উঠে প'ড়লো।

বেরিয়ে আসতেই আপিস ঘরের লাইনে, এক সার নতুন বাড়ী দেখা গেল। অনেকটা গ্রামবাসীদের বাড়ীর ধাঁচার, তবে চাল উঁচু, দরজা-জানলা বড়, দুটি ক'রে ঘর, সাজসরঞ্জাম সামান্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এগুলি সমবায়ীদের থাকার বাড়ী।

পরে যাওয়া গেল গোয়াল দেখতে। তিনটি মস্ত লম্বা চালা ঘর, এক-একটিতে দেড়শ' দু'শ' গোরু আরামে থাকতে পারে। চাষাদের গোয়ালের তুলনায় বেশ ফাঁকা খটখটে চেহারা। এরা আশা করে এই বছরের শেষ-নাগাদ শ' আষ্টেক গোরু বাছুর দাঁড়িয়ে যাবে; বাকি গ্রামের সব গোরু ধরলেও এত হয় না। শীতকালে চাষারা গোরুকে খড়-বিচিলির কুটির সঙ্গে একটু আধটু ভুষি কিম্বা আলুর খোসা ছাড়া কিছু দিতে পারে না। এদের ব্যবস্থা ভাল, মার্কিন পদ্ধতি (silo) অনুসারে গর্মিকালে কাঁচা ঘাস-পাতা-ডাঁটা মাটির তলে পুঁতে রাখে, তাই দিয়ে বারো মাস রসালো জাব দিতে পারে।

আর এক চালায় শুয়োর রাখার জায়গা,—সচরাচর যেমন জঘন্য নোংরা দুর্গন্ধ হয়, এ তা নয়, বেশ সাফসুৎরো। দুটি মেয়ে দেখলাম সিদ্ধ আলু থেঁৎলে শুয়োরদের সান্ধ্যভোজনের যোগাড় করছে। এদের হিসেব মতো এ বছরেই ২৫০ শুয়োর হবে।

চালাগুলো পার হ'য়ে এক মনোরম উপবনে প্রবেশ করা গেল। আগে এটা ছিল জমিদারের খাস নন্দনকানন,—ইতর লোকের প্রবেশ নিষেধ। এখন হয়েছে সমবায়ী অসমবায়ী সকল গ্রামবাসীর মেলা-মেশা

আমোদ-প্রমোদের আড্ডা; এখানেই সভাসমিতি নাটক সিনেমা গান বাজনা হ'য়ে থাকে।

এর পর নিয়ে গেল এক ফাঁকা জায়গায়, সেখানে অনেক বাড়ী তৈরী আরম্ভ হয়েছে—তাতে ব'সবে কারখানা, ভাণ্ডার, স্কুল, হাঁসপাতাল; পরে কুলোলে ক্লাবের জন্যেও একটা বাড়ি হতে পারে। এটা হবে গ্রামের ভাবী কৃষ্টি-কেন্দ্র।

শেষে এক মাঠ দেখতে গেলাম যাতে ফল বাগান ফাঁদা হয়েছে। যতদূর চোখ যায়, রকম বেরকম ফল গাছের চারার সার চলেছে। উৎসাহে উজ্জ্বল-মুখ নেতা বল্লে—"আপনি আর বছর কয়েক পর ঘুরে আসবেন, এমন সব ফল খাওয়াব যা কখনো খান নি! এবার চলুন, একটা মজার জিনিষ দেখাই।"

আপিসের কাছে ফিরে এসে, লাইন-ছাড়া একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখালে—মুরগীর ডিমে তা দেবার কল।

নেতা বল্লে—"এর ইতিহাসে একটু মজা আছে, শুনুন। এই কল আনার বিষয়ে ত সমবায়-সভা ডাকা গেল, অন্য দেশের দৃষ্টান্ত দেখানো হ'ল, কত হাঙ্গাম ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করলাম এর সুবিধেটা কি। সমবায়ীদের দল থেকে কত আপত্তি উঠলো,—এরকম অস্বাভাবিক উপায়ে কখনোই কাজ হতে পারে না; জমিদারদের ত অর্থের অভাব ছিল না, তারা এ কল আনায় নি কেন? মার্কিন দেশে আছে ত কি হ'ল, তাদের সবই ছিষ্টি-ছাড়া। এ দেশে ও কল চলবে না। অনেক বকাবকি অনুনয় বিনয় ক'রে শেষ কল আনাবার অনুমতি পেলাম।

"সহরে কল ত ফরমাস দেওয়া গেল। যখন এসে পৌছলো, ওর অন্ধি-সন্ধি কেও ভেদ করতে পারলাম না। কোথায় রে বই—বই আনিয়ে প'ড়ে যা বুঝলাম সেইমতো কল ত চালানো হ'ল, কিন্তু এমনি

কপাল, একশ'র মধ্যে মোটে দুটি তিনটি ডিম ফুটলো। তখন হাসি টিটকারীর ধূম দেখে কে! ফিরিয়ে দাও কল, বেচে ফেলো কল, বল্লাম ও কল এখানে চলবে না,—মহা শোরশরাবৎ পড়ে গেল।

"আমরাও ছাড়বার ছেলে নই। আবার বোঝাতে বসলাম—দেখ, ভাইসকল, কলের ত দোষ নয়, দোষ আমাদের আনাড়ীপণার। ওস্তাদ নইলে কি কল চলে, বলো ত ওস্তাদ আনাই। কি ভাগ্যি কথাটা লেগে গেল, বল্লে,—আচ্ছা আনাও, কিন্তু এবার খরচ নষ্ট গেলে আর হাসি নয়, মারধর হবে বলে রাখছি!

"সদরে লিখতে তাঁরা এই ওস্তাদনী পাঠিয়ে দিলেন"—ব'লে, নেতা এক মেয়েকে দেখিয়ে দিলে। "ইনি আসতেই আমি বল্লাম—দেখ, ওস্তাদনী, তোমার উপর বড় গুরুভার। এবার ফেল হ'লে আর রক্ষে নেই। মেয়েটি এক কথায় বুঝে নিলে, কাজও যেমন জানে খাটুনিও খাটলো তেমনি—না ওস্তাদনী?" মেয়েটি একটু সলজ্জ হাসি হাসলো। "যা হোক, সেবার মানটা-রইলো, শতকরা ৭০টা ডিম ফুটে বাচ্ছা হ'ল। চাষারা মহা খুসী, এখন বলে আরো কল চাই!"

হায়রাণ হ'য়ে ত আপিসে ফেরা গেল। শ্রান্তি দূর করাবার জন্যে আবার রুটি মাখন পনীর আনালো। খেতে খেতে ওরা জিজ্ঞেস করলে—"আপনার কেমন লাগলো?"

"আমি ত বলি খুব চটকদার, কিন্তু গ্রামবাসী চাষারা কি বলে?"

"চাষাদের কথা ছেড়ে দিন, ওদের গাঁই গুঁই লেগেই আছে।"

সহকারী একটু টিপ্পনী কাটলো—"এবার কিন্তু আপত্তির সুর বদলেছে। এখন বলে—সমবায়ের কাজ আরো তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে না কেন?"

গ্রামের ভিতর দিয়ে বাড়ী ফেরার পথে এক বুড়োর বাড়ীতে একটু

জিরিয়ে নিলাম। সে সময় তার দুই হৃষ্টপুষ্ট ছেলে সমবায়ের কাজ সেরে এসে খেতে ব'সলো।

"বুড়োকে বল্লাম—"তোমরা ত দেখছি সমবায়ে আছ।"

"না থাকার কি উপায় রেখেছে ?"

"দেখলাম ত কাজ ভালই চলছে, কত রকম নতুন বাড়ী হ'চ্ছে।"

"হাঁ, বাড়ী, বাড়ী, বাড়ী! লোকে বাড়ী খাবে না কি? কত ক'রে বল্লাম, বাছুর শুয়োর বেশী ক'রে মারো, আশ মিটিয়ে সকলে মাংস খাই। কে কার কথা শোনে। জানোয়ার বাড়িয়েই চলেছে।"

বুড়োর কথায় ছেলেরা মুখ টিপে হাসছে, আর রুটি আলু ঘোল খুব তৃপ্তি ক'রে খাচ্ছে।

বুড়োর গন্‌গন্‌ থামে না—"কালে কি হয় বলতে পারি নে, এখন ত বে-বন্দোবস্তের এক শেষ। খালি খাটো আর খাটো, কার জন্যে তার ঠিক নেই। ছুটি নেই, উপরি নেই, ফুর্ত্তিটুকু করার যো নেই। গোরু শুয়োরের মতো আমাদেরও না হয় ভাল বাড়ীতে রাখে, ভর পেট খেতে দেয়, তাতেই কি সব হ'ল? নিজের খেয়ালে চলতে না পেলে কি মনে সুখ থাকে? নিজের বল্লে যদি দোষ হয়, তবে নিজের উপর, নিজের সম্পত্তির উপর ভিতরে ভিতরে এত মায়া কেন?"

বুড়োর কথার ছিরিতে ছেলেদের হাসি চাপা দায় হ'ল।

গোপিকা-কর্ত্রীর কথা

নিকটের আর এক সমবায়-সম্পাদকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হ'ল—একটু ভারিক্কি ধরণের লোক। তাঁর বড় সাধ তাঁদের পরিদর্শিকার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সেই উপলক্ষ্যে একদিন আমাকে তাঁদের আস্তানায় নিয়ে গেলেন।

সেখানে পৌঁছে দেখি লাল-ফিতে-বাঁধা এক মাথা বাবড়িকাটা চুল নিয়ে, একটি মজবুত চেহারার ১৮ বছর বয়সের মেয়ে এক মস্ত কালো গোরুর দুধ দুইতে বসেছে। মেয়েটির নাম বীরা (Vera)। তার দুধ-দোয়ায় আশ্চর্য কিছুই নেই, সমবায়তে দুহিতার কাজ মেয়েকেই দিয়ে থাকে।

"এই আমাদের কর্ত্রী"—বলে সম্পাদক আলাপ করিয়ে দিলেন।

"সামান্য গোয়ালিনীকে লজ্জা দেন কেন?"—মেয়েটি এই উত্তর দিতে না দিতে, আমাদের চেহারা দেখেই হোক, আর গলার আওয়াজ শুনেই হোক, গোরুটা চ'মকে উঠে দুধের বালতিটা উল্টে পাল্টে বীরার কাপড় ছিঁড়ে দিলে।

সম্পাদক ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে আক্ষেপ ক'রে উঠলেন—"আহা, বাছা রে! বেচারীর কাপড়ের বড় টানাটানি, তার উপর আজকাল ভাণ্ডারে ভাল কাপড় পাওয়াই যায় না।"

এদিকে বীরা ত ছেঁড়া কাপড় ধ'রে অন্তর্ধান হ'ল। সেই ফাঁকে সম্পাদক আমাকে তার বৃত্তান্ত কিছু শুনিয়ে দিলেন।

বীরা ছিল দরজীর মেয়ে। বিপ্লবের আরম্ভে বাপ মারা যায়। শ্রমিকের সন্তানের পক্ষে সব বিদ্যালয়ের দ্বার খোলা, জায়গা পাবার জন্যে

উমেদারী করতে হয় না। বীরা শীঘ্রই বিদুষী হয়ে উঠে কৃষিতত্ত্বের ডিগ্রী নিলে। তার পর রাজধানীর বড় বিদ্যালয়ে আরো পড়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ওর গুণপণা দেখে কর্তৃপক্ষেরা তা করতে দিলেন না, ওকে সমবায়ের কাজে টেনে নিলেন। বীরার বিপ্লবে জ্বলন্ত নিষ্ঠা, সমবায়ের নিয়ম কানুন কণ্ঠস্থ, বলতে কইতে, লোককে বাগাতে, বশ করতে ওর জুড়ী নেই, তাই ওকে এখানে নেত্রী ক'রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ সমবায়ের বিশেষত্ব এই যে, এতে শুধু রুষ নয়, ইহুদী, পোল, লেট, লিথুয়েনীয়, পাঁচ দেশের লোক জুটেছে, সমবায়ী ক্রমাগত বেড়েও চলেছে। তাই উপযুক্ত নেতা চাই।

বীরার ঘাড়ে পড়েছে অশেষ রকমের কাজ। লেকচার, পাঠ, আলোচনা, আমোদ-প্রমোদ, এ সবের আয়োজন করা ত চাই, তার উপর সমবায়ের সাপ্তাহিকপত্র চালানো, নানা জাতের সমবায়ীদের মিল-মিশ করানো, ফাঁক পেলে গ্রামে গ্রামে প্রচারে বেরোনো। ওর সরকারী পদ হ'ল পশুবেত্তা-দুহিতা, সে হিসেবে ওকে দিন তিনবার আটটি গোরু নিজে দুইতে হয়, তাতেও ঢিলেমী নেই। রাতভোর আলোচনা সভা চালিয়ে এলেও দোয়াবার সময় বীরা ঠিক হাজির।

একটু পরে কাপড় ছেড়ে বীরা হাসিমুখে ফিরে এলো, আবার সেই গোরু দুইতে বসলো, যেন কিছুই হয় নি। আমি দোয়া দেখছি আর অবাক হয়ে ভাবছি, বিশ্বাসই হচ্ছে না যে এই সবে কৈশোর-পেরোনো মেয়েটুকুর ভিতর এত থাকতে পারে। দোয়া হ'য়ে গেলে গোরুকে গোয়ালে তুলে, সেখানকার অবস্থা ঠিক আছে কি না দেখে নিয়ে, বীরা একপত্তন ছুটি পেলো। তখন আমরা বাইরে এসে কাটাগাছের গুঁড়ির উপর গল্প করতে বসলাম।

সম্পাদক তামাসা ক'রে আরম্ভ করলেন—"মোটরগাড়ি চড়বে বীরা?"

সে উৎফুল্ল হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠলো—"চড়বো বৈ কি! কোথায়, কার মোটর?"

"এই প্রবাসী ভায়ার।"

"কৈ? দেখছি নে ত।"

"না, না, আমি মজা করছিলাম। ইনি হেঁটে এসেছেন।—জানো, প্রবাসী ভাই, আমাদের বীরার সখ সাধের অন্ত নেই। বল না বীরা তোমার সব মনের কথা!"

বীরা। "আমার এমন কি বেশী সখ দেখতে পেলেন?"

সম্পাদক। "তব, তোমার কি কি করতে ইচ্ছে করে বলো না।"

বীরা। "মোটর গাড়িতে বোঁ বোঁ ক'রে লম্বা পাড়ী দিতে সত্যি বড় মজা। আর রাজধানীতে প্রধান বিদ্যালয়ের ডিগ্রীটা নিয়ে আসতে পারলে হ'ত। আর এরোপ্লেনে উড়তে ইচ্ছে করে। আর কলের লাঙ্গল চালাতে। আর-আর—একটা ভাল সিনেমার ছবি দেখতে,—এখানে যত পচা ছবি আসে। আচ্ছা, প্রবাসী মশায়, আপনাদের মার্কিন দেশের ছোট গ্রামেও ভাল ছবি দেখায়?"

আমি। "তা দেখায় বৈ কি।"

বীরা। "একেই ত বলি সুবন্দোবস্ত। আমরা এখনো অতটা এগোতে পারি নি। কিন্তু ক্রমে ক'রে তোলা যাবে। তাহ'লে আপনাদের বিপ্লব আরম্ভ হ'লে এখানে ব'সে তার ছবি দেখবো। তার আর দেরী কত বলুন ত?"

আমি ভাবলাম আচ্ছা ছেলেমানুষের পাল্লায় পড়েছি। বয়স না ধরতেই একে নেত্রী বানিয়ে দিলে কোন্ বুদ্ধিতে?

সম্পাদক একটু হেসে বল্লেন—"একে যদি খুসী করতে চাও তাহলে ব'লে দাও পৃথিবীময় বিপ্লবের আয়োজন লেগে গেছে।"—পরে, আমাদের দুজনকে বসিয়ে রেখে তিনি নিজের কাজে চ'লে গেলেন।

তাঁর শেষ কথার প্রতিবাদ ক'রে বীরা বলে উঠলো—"বাজে কথা কে শুনতে চাচ্ছে? সত্যি যা, তাই বলুন। মার্কিন দেশের শ্রমিককে ত কম উৎপীড়ন সইতে হয় না, তবে সে কেন ভোম্বলদাসের মতো চুপ-চাপ ব'সে আছে?"

আমি বুঝিয়ে বল্লাম, যে-সব মধ্যবিত্তেরা ধনীর খায় পরে, ধনীর দৌলতে বিলাসে থাকে, তারা দলে এত ভারী, তাদের অস্ত্রশস্ত্র রসদের যোগাড় এত বেশী, শ্রমিকেরা জানে বাদাবাদী করলে পেরে উঠবে না, তাই বিপ্লব পর্যন্ত এগোয় না।

বীরা। "আমার তা বিশ্বাস নয়। বল পরীক্ষায় নামলে শ্রমিকের জয় হবেই হবে। সে যাই হোক, মার্কিন দেশের আরো অনেক কথা জানতে ইচ্ছে করে, আপনি সব বলুন।"

আমি। "বিশেষ ক'রে কোন্ কথাটা শুনতে চাও, বলো।"

বীরা। "এই ধরুন না, আমার বয়সী মার্কিন মেয়েরা কি করে?"

আমি। "স্কুল-কলেজে যায়, বই পড়ে, আমোদ-আহ্লাদ করে।"

বীরা। "রোজগার করে না?"

আমি। "আজকাল অনেকে তাও করে।"

বীরা। "সে কথা ভাল। মেয়েরা নিজের জোরে না থাকলে তাদের গতিমুক্তি নেই। কিন্তু আপনাদের মেয়েরা আর কি করে বলুন।"

আমি। "কেও কেও রবিবারে গির্জেয় যায়।"

বীরা। "তাতে কি হয়?"

আমি। "মনে শান্তি পায় বোধ করি।"

বীরা। "চারদিকে যেখানে অশান্তি, নিজের মনে শান্তি পাওয়াটা কি বড় জিনিষ? সে দিন চাষীদের বৈঠকে বলছিলাম—তোমাদের এই পিশু-ছারপোকা-ভরা বাড়ী ছেড়ে সমবায়ে এসে মানুষের মতো থাকতে শেখো। তাতে তারা বল্লে—আমরা এইভাবেই বেশ শান্তিতে আছি। —নিজের বাড়ী, নিজের ধন, নিজের শান্তি, এ কথাগুলোর উপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে! কিন্তু আপনাদের মেয়েদের বিষয়ে আসলে যা জানতে চাচ্ছি, তাই বলছেন না,—তাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি?"

আমি। "উদ্দেশ্য তারা নিজেরাই।"

বীরা হতভম্ব হয়ে আমার দিকে ড্যাবড্যাবে চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো।—"আপনি কি বলতে চান তারা নিজে বৈ আর কিছু জানে না? মাকিন সমাজে কু-সংস্কার কু-প্রথা কিছু নেই, দীন দুঃখী বিপন্ন উৎপীড়িত নেই, যাদের জন্যে মেয়েদের কিছু করতে ইচ্ছে যায়?"

আমি। "সে রকম ইচ্ছে ত বড় একটা দেখতে পাই নে।"

বীরা। "কি আশ্চর্য! আমার অমন জীবন হ'লে হাঁপিয়ে মারা যেতাম—মনে হ'ত কোন্ অকূলে হারিয়ে গেছি। বিপুল ভবে আমি একা—কি সর্বনাশ!"—সে শিউরে উঠলো।

এমন সময় বাড়ী-ভাঙা-কাঠকাঠরা-বোঝাই গাড়ী সামনের রাস্তা দিয়ে আসছে দেখে বীরা গাড়োয়ানকে হেঁকে কিছু শিষ্টালাপ ক'রে, পরে আমায়—বল্লে "পাশের গ্রামে কু-ধনীদের বাড়ী ভাঙা হ'ল, তারি মাল-মসলা কর্তারা এ গ্রামকে দান ক'রেছেন, তাই নিয়ে আমাদের গাড়ী ফিরলো।"

কু-ধনীর বাড়ী ভাঙা শুনে, মনে যে দুঃখ নিয়ে দেশে এসেছিলাম তাই উথলে উঠলো, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"কি সাঙ্ঘাতিক!"

বীরা। "কিসে সাঙ্ঘাতিক ?"

আমি। বলো কি ? সদ্‌গৃহস্থ স্ত্রীপুরুষ ছেলে মেয়ে কচিকাচা সব পৈত্রিক ভিটে থেকে আচমকা ঝেঁটিয়ে বার ক'রে দিয়ে অচেনা অজানা জায়গায় মজুরী করতে চালান দেওয়া—কি ভয়ঙ্কর কথা !"

বীরা। "আপনার মতের সবাই হলে ত বিপ্লবই হ'ত না।"

আমি। "তোমার নিজের কি মনে হয়,—কাজটা নিষ্ঠুর নয় ?"

বীরা। "নিষ্ঠুর নিশ্চয়ই। আপনারা কি মনে করেন কুধনীকে নির্ধনী করতে আমরা আমোদ পাই ? কত বার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, তবু না করলে নয় ব'লে ক'রে যাই। হয় রোগবীজ মারতে হবে, নয় রোগী মরবে। হয় ধনী, নয় সমবায়—দুটো এক সঙ্গে থাকতে পারে না।—দুঃখ প্রকাশ করছেন বটে, কিন্তু আপনি কি সত্যি কাঁদতে জানেন ? জগৎ-জোড়া শ্রমিকের আর্তনাদে যদি আপনার প্রাণ কাঁদতো, তাহ'লে মনও শক্ত হ'ত। শ্রমিকে শ্রমিকে দেশভেদ জাতভেদ ধর্ম্মভেদ নিয়ে লড়ালড়ি হয় না, সে সব খুঁচিয়ে তোলে মধ্যবিত্তেরা, নিজের নিজের কাজ হাসিল করার জন্যে ; মরতে মরে শ্রমিকেরা।" —বলতে বলতে বীরা রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি হ'য়ে উঠলো।

এ কথার পর কি আর বলি, জিজ্ঞেস করলাম—"তুমি কি বন্দুক চালাতে জানো বীরা ?"

বীরা। "তা না জানলে বিপ্লবের ভিতর আসি ?"

আমি। "আবার যদি যুদ্ধ বাধে, তুমি লড়াইয়ে যাবে ?"

বীরা। "আমায় কে ঠেকিয়ে রাখে , তাই দেখবো !"

আমি। "সে কি ? সঙীন নিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে বাধবে না ?"

বীরা। দেখুন, প্রবাসী মশায়, ধনী আর ধনীর পুষ্যি মধ্যবিত্ত ছাড়া জগতে আমাদের কেও শত্রু নেই। তারা যদি কোনো দিন বাগে পায়, আমাদিকে যে কী করবে আপনি তা কল্পনাও করতে পারেন না ; স্ত্রীলোক বালক কারো নিস্তার থাকবে না। নিজেকে বাঁচাতে হ'লে তখন যে অস্ত্র হাতে পাই তাই চালাবো। বীরত্ব কি পুরুষমানুষের একচেটে করতে চান ?"

বীরাকে আর ছেলেমানুষ মনে হ'ল না। ওর কথায় বাহাদুরীর স্বর নেই, মুখে যা বলছে দরকার হলে তাই করবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইলো না। ধর্মের দোহাই, রাজার হুকুম, স্বদেশের প্রতিপত্তি, এই সব উত্তেজনার জোরে অন্য দেশে অন্য কালে লোকে ভগবানকে ডাকতে ডাকতে মারতে মরতে গেছে,—তা ত জানা আছে। এরা ত বাইরের কোনো শক্তিকে ডাকে না ; সাধারণ মানুষের দুঃখের দরদে এদের আত্মশক্তি জেগে উঠেছে ; এরাও মারতে মরতে প্রস্তুত। না জানি কিসের জোরে এরা খাড়া আছে, এত তেজে চলছে ?

বীরার নিজের মুখে শুনবো ব'লে জিজ্ঞেস করলাম—"তুমি ত দেখছি ধর্ম মানো না, শান্তি চাও না, তবে তোমার মন কিসের প্রয়াসী ?"

বীরা। "আমি চাই প্রেম, আরো প্রেম !"

আমি। দাম্পত্য প্রেম ?"

বীরা। "সে জিনিষটা কি তা জানিনে।"

আমি। "তবে যাকে বলে স্বাধীন প্রেম, তাই নাকি ?"

বীরা। "তা নয় ত কি ?* ফরমাসী প্রেমকে প্রেম বলেন ?"

---

* য়ুরোপীয় ভাষায় "স্বাধীন প্রেম" বলতে স্বেচ্ছাচার বোঝায়। বীরা কথাটার ভাল মানে ধরলো।

আমি লিখে যাচ্ছি দেখে বীরার কৌতূহল হ'ল। আমার কাছে উঠে এসে জিজ্ঞেস করলে—"আমার কথা টুঁকে রাখছেন না কি?"

আমি। "হাঁ, যতটা পারি।"

বীরা। "দেখবেন, আমার মুখে উল্টো কথা বসিয়ে দেবেন না।"

আমি। সে বিষয়ে সাবধান থাকবো, ভয় নেই।

লেখা শেষ না হ'তেই বাইসিকেল চ'ড়ে এক যুবক উপস্থিত—ফিট-ফাট নীল বিপ্লবীকুর্তা গায়ে, মাথায় নতুন টুপি, পায়ে পালিশ-করা জুতো, ভাষাও মার্জিত,—চাষার ছাঁদের নয়। "ইনি জেলাস্কুলের শিক্ষক,"—বলে বীরা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। তিনি এসেছেন ছেলেমেয়েদের এক আলোচনা সভায় বীরাকে নিয়ে যেতে। বীরা তখনি রাজি। "চট্ ক'রে একটু মুখে হাতে জল দিয়ে আসি"—বলে আমার কাছে বিদায় নিয়ে গেল।

চমৎকার সন্ধ্যেটি হয়েছে, ঝক্‌ঝকে আকাশ, ফুর্‌ফুরে মিঠে বাতাস,—এর সঙ্গে মানায়, গল্প-সল্প, হাসি-খেলা, নাচগান, না হয় আনমনে একা বসা। কিন্তু সমস্ত দিন বেদম খাটুনির পর এ মেয়ে চল্লো কোথায়, না ক্রোশ খানেক পথ হেঁটে এক বদ্ধ স্কুলঘরের ভিতর রাত দুপুর পর্যন্ত আলোচনা করতে! যারা বৈঠকে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, তারাও সারাদিন খেটেখুটে এসে জমায়েৎ হয়েছে। আলোচনার বিষয় যে ক্লিষ্ট-তত্ত্ব, তা ভাল ক'রে বুঝতে বোঝাতে পণ্ডিতেও হার মানে—

ধন্য তোমরা বিপ্লবের ছেলেমেয়েরা! তোমরা কোন্ আলো দেখে ছুটে চলেছ, জানিনে,—কিন্তু তোমাদের মার নেই!

প্রবাসীর কথা এই পর্যন্ত।

তাঁর সঙ্গে স্বর মিলিয়ে আমরাও ধুয়ো ধরি—বীরার মুখে ফুল চন্দন

পড়ুক। USSR যদি সত্যি প্রেমের প্রেরণায় চলতে থাকেন, তাহলে অন্তরের হোক, বাইরের হোক রিপুর কি সাধ্যি তার লক্ষ্মী-সমেত নারায়ণ লাভের পথ আটকায়।

পঞ্চম পালা

চতুর্বর্গের ফল-বিচার

ফলেন পরিচীয়তে

ফল দিয়ে শুধু গাছের নয়, বীজ থেকে আরম্ভ ক'রে, মাটির, মালীর, মালিকের,—সকলেরই কিছু না কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সেইজন্যে যত্ন করা হয়ে থাকলেও কোনো একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হ'লে প্রবচনের দোহাই দিয়ে "তবে দোষ কি?" ব'লে ব'সে থাকলে হয় না। বরং প্রবচনটার মানে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে, দোষটা কোথায়, মাঝের নানান ধাপের মধ্যে গলতিটা ঠিক কোনখানে ঘটেছিল, খুঁজে বার করার মজুরী পোষায়। বিজ্ঞানীদের সেই ত্রীন-করবি* মন্ত্রই এ যুগের উপযোগী—**try, try, try again !**

ফলের বিষয়ে ভাবার আরো কথা আছে। একই ফল ফলাতে অনেক উপকরণ লাগে, আবার একই আয়োজনে রকম-বেরকমের ফল পাওয়া যায়,—বিশেষত যদি সমীকরণ যজ্ঞের মতো জটিল আয়োজন চলতে থাকে। তার মধ্যে কোন্ ফলটা ধরে গুণাগুণ যাচাই হবে, সেটা যাচনদারের নিজের ধাতের উপর অনেকটা নির্ভর করে।

য়ুরোপের এখন লড়াকে মেজাজ; USSR-এর ফৌজ, যুদ্ধ-জাহাজ, এরোপ্লেন,—এ সবের চেকনাই দেখলে য়ুরোপীয় বিচারক খুসী না হোক, তার ভক্তি আসে। মার্কিন দেশে বস্তু বোঝে; USSR-এর কারখানার

---

* শ্রোতাকে সাবধান ক'রে দিতে হয়; সংস্কৃত শাস্ত্র মন্থন করলে এ নামের মন্ত্র মিলবে না।

অশেষ মাল, খনির অফুরন্ত তেল, ক্ষেত্রের বাড়ন্ত ফসল, এ সবের রটনা কানে গেলে কেজো মার্কিন প্রশংসা না করুক, ভাগ বসাতে লালায়িত হয়ে খোসামোদ লাগায়।

এক এক দেশের নাম দিয়ে উদাহরণ দেওয়া হ'ল বটে, কিন্তু সব দেশে নানা ভাবের লোক থাকে যারা বিচারে বসলে নিজের রুচিমতে পরদেশ সম্বন্ধে একতরফা রায় দিয়ে খালাস হয়। তাই নির্বিচারে পরের সম্বন্ধে লোকের কথা মেনে নিলে প্রায়ই ঠক্‌তে হয়; এমন কি নিজের বিষয়ে যে যা বলে তাও বুঝে সুঝে নেওয়া ভাল। না দেখে শুনে পোকাধরা ফল চিবতে চিবতে আমি নিরামিষাশী বলে বড়াই করলে ত হয় না; অন্য দিকে পরের হিতের ভাবনায় যে পাগল, সে নিজেকে নাস্তিক বল্লে আমরা কি তা মানতে বাধ্য?

USSR-এর বস্তু ভালই বাড়ছে, আরো বাড়বে বলে লক্ষণ দেখা যায়। তবে, বস্তু যে-দেশের সে দেশেই আগলানো থাকে, তাতে লোভ ক'রে লাভ কি? কিন্তু ভাবের দেশ-কাল নেই, একার ভোগে তাকে আটকে রাখা যায় না। সেজন্যে আমরা চাই USSR-এর ভাব বুঝতে, লোভনীয় লাগলে আদায় ক'রে নিতে।

ভাব কথাটাই বেশ রসে ভরা। ভাব হ'ল মনের বাস্তু-ভিটে, বিশ্ব-রাজ্যের যে জায়গা-টুকু আপনার করে নিয়ে মন গুছিয়ে বসেছে। "দু'জনে বড় ভাব"—মানে দু'জনের মন এক বাসায় থাকে, অন্তত পরস্পরের কাছে ঘন ঘন যাওয়া আসা করে। এমন কুনো মনও দেখা যায় যে নিজের বাড়ী ছেড়ে বেরতে পারে না; তার পক্ষে অন্যের ভাব বোঝা অসাধ্য। জন-বৃষের বাচ্ছা বৃন্দাবনে গিয়ে পড়লে না জানি কি ঢঙে সেখানকার লীলা খেলতো!

ভাবের পরীক্ষা সম্বন্ধে সাবধানে থাকার বিষয় এই, যার পরীক্ষা করা

হয় আর যে পরীক্ষা করে, বিচার-ফলের মধ্যে দুজনেরই ভাব মিশে যায়। আবার রায় যে দেয় আর রায় যে শোনে, এদেরও ভাব মেশামেশি না হয়ে যায় না। ভাবের মতো সূক্ষ্ম জিনিষ নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে গেলে তা হবেই। কিন্তু তাতে দোষই বা কি? শেষে যে ভাব ফুটে ওঠে সেটা যদি উপাদেয় হয়, তাহলে কার মনে কতখানি ছিল তাই নিয়ে ঘোঁট না ক'রে তাকে পরমানন্দে আত্মসাৎ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

চতুর্বর্গ বলতে কি বোঝায়, তাও আগে থেকে ঠিক ক'রে নেওয়া মন্দ নয়। মান্ধাতার আমলের এই সব কথার আজকাল মা-বাপ নেই, যে যেমন খুসী ব্যবহার করে। তাই কথকের মানেটা শ্রোতার কাছে প্রথমেই গেয়ে রাখা ভাল; আখর দেওয়ার সময় তাহলে ভুল বোঝা-বুঝির ভয় থাকবে না।

এই দেখ না কেন, আজকাল আমাদের দেশে বল, আর যে দেশেই বল, ধর্ম বলতে বোঝায় কাড়াকাড়ি করার, অন্তত মানুষ থেকে মানুষকে তফাৎ রাখার একটা ছুতো। সমীকরণের কথা ভাল মনে বলতে শুনতে ব'সে ধর্মের সে মানে নিয়ে আমরা কি ক'রবো? যাতে ধরে রাখে সেই ধর্ম—ভারতবর্ষে আগে চলতি এ মানে ত বেশ ছিল। কোন্ কোন্ ভাব USSR-কে বজায় রেখেছে, শক্তি যোগাচ্ছে, সে ভাব অন্যেরও কাজে লাগতে পারে কিনা, ধর্মের বর্গে তাই বোঝার চেষ্টা করা যাবে।

তার পর হ'ল, অর্থ। এ কথাটা এমন হাত পা ছড়িয়ে বসেছে, যাতে লাগাও তাতেই লাগে। আপাতত ওকে সম্পত্তির উপর আটকে রাখলে আমাদের কথার সুবিধে হবে। ব্যক্তির পক্ষে সম্পত্তি অনর্থের কারণ, সে বিষয়ে হিন্দু আচার্যের সঙ্গে USSR-এর একমত। এখন দেখতে হবে, USSR-এর নব-বিধানে সমবায়ের হাতেও সম্পত্তি পরমার্থের ব্যাঘাত করছে কি না। এটাও দেখার বিষয়, ব্যক্তিকে

সম্পত্তি-ছাড়া আর লক্ষ্মী-ছাড়া করা এক কথা হ'য়ে দাঁড়ায় কি না, ঐহিক উৎকর্ষ সাধনে তাকে উদাসীন ক'রে তোলে কি না। লক্ষ্মীর মান রেখে বিচার করতে হ'লে, দেবীর বস্তুতান্ত্রিক স্থূল মূর্ত্তি গ'ড়লে চলবে না, আনন্দ-লাভ দিয়ে তাঁর প্রসাদকে মাপতে হবে।

তৃতীয়বর্গ, কাম। ব্যবহারের দোষে কথাটা যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে। আমাদের কথা গোড়ায়ও যা ছিল, শেষেও তাই,—মানুষের মূল ঐহিক কামনা হচ্ছে, জগতে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা। সেটা সম্ভব করতে হ'লে নরনারীর আপনাদিকে নারায়ণের, বিশ্বমানবের, অংশ বলে বোঝা দরকার। সে বোধ অন্তত আমাদের দেশে এ পর্যন্ত হয় নি।

দেবী ব'লে হোক, আর রমণী-কামিনী বলেই হোক, হিন্দুর মন স্ত্রীজাতির ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরতে থাকে বটে, কিন্তু সেরেফ নারী বলে তাঁদিকে নিজের মহিমায় ফুটতে না দেওয়ায় বেচারীদের মন একেবারে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে পড়েছে। দিদিমার বা বাড়ীর পুরোণো ঝীর পরামর্শ-মতো এর পায়ে ওর পায়ে মাথা নোয়াতে, পাণ্ডা-পুরুতের ফরমাস-মতো এ-জলে ও-জলে মাথা চোবাতে ত শেখে, কিন্তু কালের উপযোগী কোনো ভাব কি আদর্শ শেখায় কে? আরো মুশকিল এই, যাঁদের শিক্ষার ত্রুটিতে হিন্দু-নারীর এই দশা, তারাই তাচ্ছিল্য ক'রে তাদিকে ধর্ম-অর্থ উপার্জনের পথের কাঁটা বলেন।

বৃথা আক্ষেপ করার জন্যে এ কথা তোলা হয় নি। শাস্ত্রে বলে "নয়"কে বেশ ক'রে চিনে ফেলাই "হয়"কে পাবার একটা উপায়। USSR-এর বিধানে নরনারীর যা সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে, সেখানকার বিপ্লবী সমাজে নারী যে স্থান পেয়েছে, তাতে আত্মোন্নতির সুবিধে-অসুবিধে কেমন, তাই আমাদের এ পালায় বোঝার বিষয় হবে, সে জন্যেই এই তুলনা-মূলক সমালোচনা।

বাকি রইলো মোক্ষ,—আকাশের মতো একটা মস্ত ফাঁকা কথা। পণ্ডিতী চালে আলোচনায় বসলে না-বোঝার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার ভয়, তাই সাদা ভাবেই কথা পাড়তে হবে।

মানুষমাত্রেই মুক্তি পথের যাত্রী, পদে পদে পুরোণোর খোলস-মুক্ত হ'য়ে তাজা জীবনে পা বাড়াতে না পারলে সে জেয়াস্তে মরা হ'য়ে থাকে। কিন্তু বাকির বহর দিয়ে নয়, কাজ দেখে বুঝতে হয় মুক্তির পথে কে কতটা চলতে পেরেছে। মুখে "বসুধৈব কুটুম্বকম্,"—কাজে একে ছুঁই নে, ওর পাশে বসি নে, তার হাতে খাই নে ; চাই "মনের মানুষকে," —সামনের মানুষের সুখ-দুঃখ মনে লাগে না ; যাবো আনন্দধামে,—বিধাতার নিত্যদানের রস তৃপ্তি ক'রে গ্রহণ করতে জানিনে, এই কি মুক্তির পথে এগোবার চেহারা ?

USSR-এর নরনারীরা নানা সমবায়ের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ায় তারা অন্তত এক পত্তন "আমি, আমার", থেকে "আমাদের" বড় কোঠার মধ্যে মুক্ত হয়েছে। এখন দেখার, ভাবার এইটুকু বাকি যে, সঙ্ঘে জড়িয়ে প'ড়ে, নিজত্ব হারিয়ে, ব্যক্তির চরম বিকাশের বাধা কিছু ঘটছে কি না। এই আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চতুর্বর্গের বিচারও সাঙ্গ হবে।

ধর্ম-এর হতোহস্তি

বিপ্লবের আগে, রুষ ভক্তির দেশ, ভক্তের দেশ, ধন্য-রাজার পুণ্য-প্রজার দেশ, ব'লে য়ুরোপে তার নাম-ডাক ছিল। Kiev-নগর ছিল রুষের কাশী, পাহাড়ে-উপত্যকায় বনে-বাগানে মিলিয়ে অতি মনোরম স্থানে পত্তন করা। সেখানে কিবা মঠ মন্দির পাণ্ডা-পুরোহিতের ধুম,

মন্দির-গির্জের ভিতরে সোনারূপো জহরতের বাহার, ঝলমলে ঝাপ্পা-ঝোপ্পা-পরা পূজারি-পাদ্রীদের সকাল-সন্ধ্যে মন্ত্র আওড়ানোর ঘটা, কঠোরতার নানা চিহ্ন-ধারী গুহা-বাসী * তাপসদের ভিড়, দেহ-রাখা সাধু-সন্তদের সমাধি-স্থানের ছড়াছড়ি, ব্যাধি-হরা পুণ্য-ভরা জলের রকমারি আধার—সে দেশকালের ধারণা-মতো ধর্ম্মের যা-কিছু তোড়-জোড় দরকার, কোনোটারই ত্রুটি ছিল না।

আর তেমনি বিনয়ে-হেঁট-মাথা, যা-বল-তাই-সই-গোছের নিষ্ঠাবান প্রজার দল। তারাই মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলা রোজগারের ভাগ যুগিয়ে এই বিরাট ধর্ম্ম-ব্যাপার বজায় রেখেছিল। রোগ-শোক শান্তকরার প্রয়োজন বোধ করলে, কিম্বা লাল-দিনে †পুণ্যসঞ্চয় করার ঝোঁক চাপলে, ছেলে-বুড়ো-স্ত্রীলোক মিলে তারা লাঠিহাতে বোঁচকা-কাঁধে, পায়ে হাঁটতে হাঁটতে এই সব মঠ মন্দিরে লাখে লাখে গড় করতে যেতো; ইষ্ট-মূর্ত্তির সামনে বাতি চড়াতো; মৃতসন্তদের তুলে-রাখা গায়ের কাপড়ে চুমো খেতো; পাণ্ডা পাদ্রীর কাছ থেকে পবিত্র জল কিম্বা আশীর্বাদ কিনে আনতো।

সেখানকার বিগ্রহদের পশু-রক্তে রুচি ছিল না বটে, তবে তাদের কাছে বর আদায়ের আশায় ছোট-বড় মোম-বাতি থেকে আরম্ভ ক'রে দামী দামী গয়না পর্যন্ত মানত করা হতো,—তা অপরকে ঠকানো, জব্দকরা, পীড়া দেওয়ার বর চাইলেও সে সব অমায়িক বিগ্রহ-বৃন্দের বিরক্তির কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেতো না।

---

* মাটির তলায় সুরঙ্গের মধ্যে অসংখ্য গুহা ছিল, যেখানে তাপসেরা কালক্ষেপ করতো; তাকে জীবন যাপন বলা যায় কি না সন্দেহ।

† সন্তদের আবির্ভাব তিরোভাবের পর্বদিন খৃষ্টান পাঁজিতে লাল অক্ষরে লেখা।

কয়েকটি ক'রে গ্রাম মিলিয়ে একটা ক'রে গির্জে, আর সেই সঙ্গে একটি পাদ্রী-বাবাজি (batushka) বরাদ্দ ছিল—তাদেরও খরচ অবশ্য চাষাভূষোকেই বইতে হতো। সাধারণ প্রজার তুলনায় থাকার বাড়ীটা বাবাজি ভালই পেতেন, আর লাগাও অনেকখানি জমি থাকতো যাতে যজমানদের সাহায্যে বাবাজির পরিবারবর্গের ফল-মূল-সবজীর চাষ ক'রে সৌখীন খাবারের যোগাড়টা হ'তো। তা ছাড়া অতিথি উপস্থিত হ'লে সেবার আয়োজন—দুধ ডিম পনীর মাংস—দেখলে মাসহারার হারটা মন্দ ছিল বলে মনে হ'ত না। তার উপর রুষের প্রথামতো চৌপর দিন গরম চা ত চলতোই।

বাবাজির কাজের মধ্যে গ্রামবাসীদের জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, নামকরণ, উপলক্ষে ধর্ম-সঙ্গত ক্রিয়া-কর্ম তিনি চালিয়ে দিতেন; আর রবিবারে পর্ববারে সদুপদেশ দিতেন, বিধাতার খাতিরে নিজের হীনাবস্থা নির্বিবাদে মেনে নিতে, পরলোকের দিকে তাকিয়ে রাজার কর, ধর্মের বৃত্তি, যোগাবার ক্লেশ ভুলে থাকতে! শুধু মৌখিক উপদেশই বা কেন, বাবাজির সুখ-শান্তিময় জীবন-যাত্রা দেখলে, ভগবান যা করেন ভালর জন্যে সে বিষয়ে কি সন্দেহ থাকতে পারতো?

হঠাৎ এসে পড়লো বিপ্লব। সর্বত্র যেমন দেখা যায়, এখানেও তাই, —পায়ের-তলার-মানুষের মাথা-তোলার বিপক্ষে কর্ম-কর্তায় ধর্ম-কর্তায় এক জোট হলেন। মোহন্ত পুরুত পূজারি যতরকমের পাদ্রী ছিল সকলে মিলে ভগবানের নামে ধর্মের ধ্বজা তুলে, ইহকাল পরকাল নাশের ভয় দেখিয়ে বিপ্লবীদের ঠাণ্ডা করার চেষ্টা পেলেন। কিন্তু তারা ভোল-বারও নয়, ডরাবারও নয়, যেমন গোঁয়ার তেমনি ঠোঁটকাটা!

বিপ্লবীরা ব'লে ব'সলো—দলে না থাকলেই শত্রু; কাজেও দেখালো তাই। মঠ মন্দির গির্জে সমাধি যার যার সম্পত্তি সব কেড়ে নিয়ে, পাদ্রী-

বাবাজিদের ছোটবড় সবাইকে ইতরের কোঠায় নামিয়ে এনে, তাদেরই দেওয়া উপদেশমতো পরকালের আসার আশে ইহকালের জ্বালা জুড়োবার সুযোগ পাইয়ে দিলে।

ধার্মিকেরা অবাক! ধর্ম-স্থানের ধর্ম-অনুষ্ঠানের ধর্ম-যাজকের এ হেন অপমান, অথচ ভগবানের কোপের কোনো চিহ্ন নেই! ধরণী দ্বিধা হওয়া দূরে থাক, একটুও কাঁপলো না, কারো মাথায় বাজও প'ড়লো না। আর রূষের সেই ডাকসাইটে ধর্মপ্রাণ চাষী-বৃন্দ,—তারাই বা কোন্ প্রাণে এই সর্বনাশ স'য়ে গেল? এমন না যে তারা একেবারে মাটির মানুষ, রা কাড়তেই জানে না। খেতে না পেলে তারা কতবার খুনোখুনি কাণ্ড করেছে। কী সম্মোহন মন্ত্র জানে বিপ্লবীরা যে তাদিকে এমন কেঁচো বানিয়ে দিলে।

যাঁরা চোখ চেয়ে দেখলেন, তাঁরা কিন্তু এমন কিছু তাজ্জব হবার কারণ পেলেন না। শিখিয়েছ নির্বিবাদী হতে, হয়েছে নির্বিবাদী, তাতে আর আশ্চর্য কি? দিশাহারা হ'লে চাষারা যাদের কাছে বিধান নিতো তাদের বিপদে এখন বিধান দেয় কে? কাজেই ধর্ম ব'লে যা জানতো, এখন জানলো তার উপর নির্ভর করা চলে না। গির্জের কর্তাই শ্রীহীন, কার খাতিরে গির্জেয় যাবে? কাজেই চাষায় নিজের পথ নিজে দেখতে লাগলো।

দেখা-শোনার লোক নেই, গির্জে ভেঙে প'ড়ছে, ভাঙা ইট-কাঠ যে-যার বাড়ীর কাজে লাগিয়ে নিলে। রবিবার এখন হ'ল গ্রামবাসীর আরামের দিন,—বাড়ী ব'সে গৃহস্থালী তদারক, খোস-গল্প, হাসি-খেলা এই সবের অবসর পায়। এতে বিচলিত হবার কোনো কারণও দেখে না, ভগবানের অসন্তোষের লক্ষণ ত নেই; জীবনের সুখ দুঃখ আগের মতোই, বরং কর-বৃত্তি উঠে যাওয়ায় অবস্থা হয়েছে সচ্ছল। এমন বিপ্লব মেনে নেওয়ার জন্যে কি কোনো মন্ত্রতন্ত্র লাগে!

তবে বিপ্লবী কর্তারা একটু কৌশলও খেলেছিলেন। জমির স্বত্ববদল নিয়ে তাঁরা চাষাদিকে অকালে ঘাঁটান নি। বিপ্লবের নতুন ধারা গা সওয়া হয়ে যাবার পর তবে সমবায়ে চাষাদের ডাক পড়লো, তখন কাজ হাসিল করতে বেশী বেগ পেতে হ'ল না।

তার পর খৃষ্টান মহলে রব উঠলো—বিপ্লবী-পুঁথির কুশিক্ষায় চাষাদের ধর্ম নষ্ট ক'রে, তাদিকে নাস্তিক বানিয়েছে।

এ সিকায়তে আমরা কি সায় দিতে পারি? প্রথমত একটি বিশেষ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিগ্রহে, ক্রিয়াকর্মে, আস্থা হারানোকে, বা তারা ভগবানের যে স্বরূপ প্রচার করে তার মাহাত্ম্য স্বীকার না করাকে, কেমন ক'রে নাস্তিকতা বলা যায়?

তবে বিপ্লবীরা এমন কথা কেন বলে—"গরীবের তিন শত্রু,—ধনী, সয়তান, আর ভগবান। ধনীকে তাড়িয়েছি, সয়তানে আর বিশ্বাস করি নে, এখন ভগবানকে বিদায় দিলেই হয়!" এ কথা শুনে ভক্তেরা কানে হাত দেবেন, আমাদের বদন কিন্তু অম্লান থাকে। এমন কি, জানতে ইচ্ছে করে, "ভক্তদের হাত থেকে বাঁচাও"—ভগবান কখনো এমন আক্ষেপ করেন কি না।

চাষারা যখন রাজ-আমলার আর জমিদারের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে জেরবার হ'য়ে পড়েছিল, দিনের পর দিন বছরের পর বছর সুখ দূরে থাক, সোয়াস্তি কাকে বলে তাই জানতো না, তখন ধর্ম-যাজকদের কাছে না মিল্লো অন্যায়ের প্রতীকার না প্রতিবাদ, পেতে পেলো ফাঁকা উপদেশ —"সবই তাঁর ইচ্ছে, নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট না থাকা মহাপাপ।"

বিপ্লবের ঝাঁকানি খেয়ে তাদের বুদ্ধি যখন একটু খুলে গেল, তখন যাঁকে যন্ত্রণাময় অবস্থার মূল কারণ ব'লে বুঝিয়ে দিয়েছিল, তাঁকে "মিত্র" বল্লে ভাষার একটু উল্টো প্রয়োগ হ'ত না কি?

তার চেয়ে, আমাদের শাস্ত্রের উপদেশমতো তাদিকে যদি বোঝানো হ'ত যে,—"তাঁর শক্তি তোমার মধ্যেই ; তাঁর ইচ্ছায় নয়, তাঁর অভাবে তোমরা হীন হ'য়ে আছ ; আত্ম-শক্তি জাগাও, তাঁকেও পাবে।" তাহলে চাষার মনে ভগবানকে সয়তানের সঙ্গে এক কোঠায় বাস করতে হ'ত না।

সাধে এক নাস্তিক বলেছিল—"আমরা ত ভগবানকে নিন্দে করি নে, যাকে মানিনে তার নিন্দেই বা কি প্রশংসাই বা কি ? কিন্তু তোমরা ভক্তেরা তোমাদের মন-গড়া ভগবানের বড়াই করতে গিয়ে তার রূপ যে-রকম দেখাও, তাতে মানহানির অপরাধ আসে বৈ কি।"

বাস্তবিক অদ্ভুত ভাবে ভগবৎ-রূপ-ব্যাখ্যা মাঝে মাঝে করা হয় বলেই আমাদের আলোচনায় ভগবানের নাম আনতেই ভয় হয়, পাছে শ্রোতা অনবধানে আমাদের কথার সঙ্গে সে রকম ভাব জড়িয়ে ফেলেন।

যাই হোক, অনেক দিনের চাপা-পড়া আত্ম-শক্তি গতানুগতিকের বাঁধ ভেঙে যখন প্লাবনের মতো রূষে দেখা দিলো, তাতে "আমরা আছি, আমরা থাকবো" "আমরা উঠবো, আমরা ওঠাবো," চার দিকে এই সব ভরসার ধ্বনি শোনা যেতো, এখনো যাচ্ছে। নাস্তিকতার "কৈই কৈই, নেই নেই" বিলাপ তার মধ্যে কোথায় ?

মানুষের প্রতি মানুষ স্বাভাবিক প্রীতি নিয়ে ধরায় আসে। রিপুর আক্রমণে সে-প্রীতি চাপাপড়ে যায় ব'লে "ভব"টা এত নিরানন্দ। বিপ্লবের ধাক্কায় রিপুগুলো একপত্তন সরে যেতে রূষবাসীর পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক টান ফুটতে পেয়ে তাদিকে সমবায়ে বেঁধে ফেল্লে। প্রীতির বাড়া কি ধর্ম আছে, ভালবাসার চেয়ে জোর বাঁধন কি থাকতে পারে ?

প্রীতির অভাবে ক্রিয়াকর্ম বলো, মন্ত্রতন্ত্র বলো, সে সব শুধু বৃথা

নয় আফিমের নেশার মতো অনিষ্টকর,—প্রীতির অভাবের জ্বালা উপস্থিত মতো ভুলিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি-রুচির অধঃপতন ঘটায়। দেশবাসীকে খাড়া ক'রে তোলার জন্যে বিপ্লবী কর্তারা সেই আফিম বন্ধ করলেন, তাতে পুরোনো নেশাখোর যারা ছিল তাদের কিছু কষ্ট হ'ল বটে, কিন্তু ধর্মনষ্ট হওয়ার অভিযোগটা আমাদের কানে কিছু অদ্ভুত শোনায়।

মানুষে মানুষে প্রীতির যোগসাধন হ'লে কর্মের কৌশল, কর্মের সুফল, কর্মের আনন্দ সবই বাড়ে তা শাস্ত্রেও লেখে, কাজেও দেখা যাচ্ছে। তবে ধর্মের বাকি থাকে কি? যদি বল—"বাকি রইলেন ভগবান!" তবে সে কথাটা একটু ভাবতে হয়।

ভগবানকে ডাকার কত কৌশল মানুষে বার করেছে—মনে জপ, হাতে জপ, লিখে জপ, এমন কি তিব্বতী কায়দায় জলের স্রোতে কল ঘুরিয়ে জপ; মন্ত্র উচ্চারণের বিড়বিড়, গুনগুন, হুঙ্কার ছাড়ার আওয়াজ, কাঁশর ঘণ্টার কানে-তালা-লাগানো আওয়াজ, ঢাক ঢোলের আকাশ-ফাটানো আওয়াজ; কিন্তু এত ক'রেও আমাদের মতো সিধে বুদ্ধির দর্শকের মনে সেই সন্দেহ জাগতে থাকে,—"ভগবানই বাকি রইলেন বুঝি!"

কোনো কল্পিত রূপকে সারাদিন চোখের সামনে ধরলে, মানুষের দেওয়া যে-কোনো নামকে অষ্টপ্রহর আওড়াতে থাকলে, তাতে ত ভগবানকে জবরদস্তি হাজিরও করা যায় না, তাঁকে আনার সামিলও হয় না। অনেক সময় দেখা যায়, তিনি যখন স্বয়ং নিজমূর্ত্তি ধরে আসেন, আমরা চিনতেই পারিনে। তবে তাঁর আগমন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার এক লক্ষণ ঋষি বাংলে দিয়েছেন,—"তাঁর সাক্ষাতের আনন্দ যিনি পেয়েছেন, তিনি কখনো কিছুতে ভয় পান না।"

রুষের বিপ্লবী গ্রামবাসীদের আমরা যে-টুকু পরিচয় পেয়েছি, তাতে

ওদের মধ্যে পরস্পর প্রীতির অভাব দেখা যায় না, আল্লা আল্লা থেকে ধ্ব'সে পড়বার লক্ষণ কিছু নেই। দলে দলে ভেদ, জাতে জাতে ভেদ, বিচারে রুচিতে ভেদ,—এ রকম ছন্নছাড়া হয়ে ধর্মকে মারলে ধর্মের পাল্টা মার কেমন ক'রে খেতে হয়, আমরা ভুক্তভোগী তা হাড়ে হাড়ে জানি।

ধর্মকে অন্যভাবে মেরে রুষের রাজপুরুষরা তাদের ধামাধরা ধর্মজীবীদিকে সঙ্গে জড়িয়ে ধর্মের মারে সমূলে ধ্বংস হ'ল। কিন্তু ঐ রুষেরই প্রজারা ধর্ম-মারা পাপে লিপ্ত না থাকায়, বিপ্লবের দ্বারা তারা উদ্ধার পেয়ে গেল। তাদের মধ্যে আগে যারা জেগে উঠলো, কিবা নর কিবা নারী, তারা নিজেকে ভুলে অন্য যারা মোহ-নিদ্রায় আধা-অচেতন, তাদিকে বাঁচিয়ে তুলতে প্রাণপাত করছে। ফলে রুষের জাগ্রত আত্মশক্তি রাষ্ট্রকে সমবায়ে সমবায়ে জড়িয়ে এমন অভেদ্য বর্ম পরিয়েছে যে যত পাশ্চাত্য রাজতন্ত্রী আছে, তারা বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও ভয় দেখাতে পারে নি। ভয় পেতে অপর পক্ষরাই পাচ্ছে, এদের তেজ দেখে তাদের বিরুদ্ধতার ঝাঁজ আপনিই ম'রে আসছে।

এখানকার শেষ প্রশ্ন এইটুকু—এমন ভাবে অভয়ে প্রতিষ্ঠিত যারা, তারা ভগবানের কোনো বিশেষ নাম উচ্চারণ করে না ব'লে তাদের কি ধর্ম নেই? কানাই বিনা খেয়া নৌকো ত টল্‌তে টল্‌তে চলে—যদি নৌকোটা বেশ সোজা চ'লতে থাকে তাহলে চর্ম চোখে দর্শন না পেলেও, মন কি বলে না যে, হালে কানাই ঠিক আছেন? রুষের দেশে কলির শেষে বোধ হয় জয়দেব কবির কথা আর খাটছে না,—হরির নাম বাদ দিয়েই তাঁদের গতি হয় বা!

একটা ছড়া কেটে ধর্মের কাহিনী শেষ ক'রে আনা যাক—

নরের মিলন হ'লে মেলে নারায়ণ।
ফাঁকা নাম হাঁকে তাঁর দূরে পলায়ন॥

ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা

ব্যক্তির হাতে সম্পত্তি রাখা নয়, কিছুতেই নয়, এই হল USSR-এর প্রধান নিষেধ। সম্পত্তি বলতে তাঁরা বোঝেন আবশ্যকের অতিরিক্ত জমানো মূলধন * যা দিয়ে পরকে খাটিয়ে নিজের বিলাস বাড়ানো যায়। সংসারে কারো অতিরিক্ত কারো অভাব হ'য়েই থাকে। যার যা উদ্বৃত্ত সবই থাকা উচিত সমবায়ের হাতে, যার যা অভাব পুরিয়ে সামঞ্জস্য রাখার জন্যে। দরকারের বেশী মনে লোভ না রাখলে ঝঞ্ঝাট চিন্তা অনেক বেঁচে যায়, অতিরিক্ত উৎপন্ন মাল গতাবার গোলাম-চোরের খোঁজে ফিরতে হয় না। প্রত্যেকে অতিরিক্তের লোভ ত্যাগ করে সকলের সম্ভোগের বিধিমতো ব্যবস্থা করা, এই হ'ল আদর্শ।

USSR দেখে শুনে বুঝে সাব্যস্ত করেছেন, মূলধন এক জনের হাতে জমতে দিলেই তাতে রিপুর বীজ এসে বসে, স্বার্থপরতার সার পেয়ে বেড়ে ওঠে, শেষটা সমাজকে গ্রাস করে। মূলধনের জড় মেরে দিলে, ধনী-দরিদ্রের ভেদ; প্রবল-দুর্বলের আহার-বিহারের ভেদ; স্ত্রীপুরুষের আর্থিক অবস্থার ভেদ,—এ সব ঘুচে গিয়ে সমাজ পরিষ্কার হয়ে যাবে; দলে দলে, জাতে জাতে, মানুষে মানুষে আর ঝগড়া লাগবে না, মানব-হৃদয়ের যে স্বাভাবিক মৈত্রী তাই বিরাজ করবে।

ক্ষমতা অনুসারে† সকলকেই শ্রম করতে বাধ্য হওয়ায় শরীর মন ত সুস্থ থাকবেই; তাছাড়া, পরের চাপে কি নিজের লোভে অতিরিক্ত

---

* নিজের বা পরিবারবর্গের দরকারী জিনিষ ভাঁড়ারে জমা রাখতে মানা নেই।

† পালোয়ানকে দিয়ে কলার চর্চ্চা, কিম্বা ভাবুককে দিয়ে লাঙ্গল চালানো, কাজের এমন অদ্ভুত বাঁটোয়ারা হবে না, বলাই বাহুল্য।

খাটুনিতে শরীর না ভাঙলে, অনিশ্চিত অন্নের দুশ্চিন্তায় শুখিয়ে যেতে না হ'লে, পরস্পরের সুখ বাড়াবার চেষ্টায় নতুন জ্ঞান লাভ, নতুন নতুন সম্পদ সৃষ্টি করার যথেষ্ট অবসর থাকবে।

এ আদর্শ, এ মতামত মানলে, আজকাল যাকে পাশ্চাত্য সভ্যতা বলে, যার মধ্যে আমরাও জড়িয়ে পড়েছি, তার গোড়ায় কুড়ুলের ঘা পড়ে ; সে জন্যে য়ুরোপের মার্কিনদেশের লোকে, আর তাদের এ দেশের চেলারা ত, USSR-এর উপর এত খাপ্পা। কিন্তু আমাদের দেশের সনাতন ভাবের তরফ থেকে এতে আপত্তি করার কারণ পাওয়া যায় না। ভোলানাথ অন্নপূর্ণার অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তি ভারতে প্রসিদ্ধ। সম্পত্তিতে রিপুর আবির্ভাবের ভয় সম্বন্ধে আমাদের দেশ বরাবরই সচেতন ; সে জন্যে ধনীকে সমাজের মাথায় বসানো হ'ত না, ত্যাগীর উপদেশের বেশী মূল্য দেওয়া হ'ত।

সুখ-ভোগের স্বাভাবিক কামনা সকলের মধ্যে চারিয়ে দিলে তাতে অশান্তির সৃষ্টি হয় না, লোক-হিতে রত থাকলে ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, ভূমার মধ্যেই আনন্দ, এ ভাবের অনেক কথা আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু সেগুলি সংসারের কাজের মধ্যে দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। আমাদের দেশে না-ধর্মি অহিংসার এক সময় চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিল, কিন্তু প্রাণ-দিয়ে মানব-সাধারণের ঐহিক ইষ্ট-সাধনের কোনো হাঁ-ধর্মি পন্থা এ পর্যন্ত কেটে বার করা হয় নি ; প্রজাপতির সন্তানমাত্রকে এক ডোরে বাঁধবার কোনো মহামন্ত্র উদ্ভাবন হয় নি।

বর্ণাশ্রম ধর্ম অবলম্বন করায় প্রত্যেক বর্ণের নিজের নিজের গুণ-কর্ম চর্চার সুযোগ হয়েছিল বটে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বেড়া ক্রমে শক্ত হ'য়ে ওঠায় এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে আসাযাওয়ার পথ

খোলসা রইলো না। দেখা গেল যে, অধিকার ভেদ মেনে ব'সে থাকলে ভেদটাই টিঁকে যায়, অধিকার আর বাড়ে না। ক্রমশ বর্ণভেদের জায়গায় জাতিভেদ চেপে ব'সলো, গুণ-কর্মের বদল হ'লে যে ভেদটা বাধা হ'ত না, সেটা জীবন থাকতে পার হবার উপায় বন্ধ হ'ল।

তখন ধর্মের গায়ে লাগলো আঘাত,—শুধু কর্তৃপক্ষের জবরদস্তির আঘাত নয়, শুধু ধর্মযাজকের ফরমাসী আঘাত নয়, ভেদের পর ভেদ বিনা প্রতিবাদে মেনে চলায় জাত-কে-জাত নিজের হাতে-দেওয়া আঘাতের অপরাধে লিপ্ত হ'ওয়ায় সকলে মিলে সাজা পেলও তেমনি। কারো সঙ্গে মিলিনে মিশিনে করতে কবতে হিন্দু জাতটাই হ'ল একঘ'রে; যারা পরের ভাল দেখতে পারলো না, এখন তাদের ভাল কেউ দেখতে পারে না।

পরস্পর প্রীতি যে-পরম-ধর্ম তাকে চিনতে না পারায়, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করার যে সনাতন উপদেশ, আমাদের দেশের লোক তার ঠিক তাৎপর্য পেলো না। সম্পত্তি ত্যাগ করার মানে দাঁড়ালো সম্পত্তি ছেড়ে পালানো। যে-রোগীর ওষুধ-পথ্যির খরচ জুটছে না, তাকে চেঞ্জে পাঠালে সে যেমন ধনে প্রাণে মারা পড়ে. এতেও সে ধরণের ফল হ'ল। বিষয়কে বিষময় যেমন বোঝা ওমনি স্ত্রীপুত্রকে তার মধ্যে ফেলে, গেরুয়া প'রে গৃহস্থ দে পিট্টান, তাতে অন্য গৃহস্থদের গলগ্রহ হয়ে তাদের বিষাক্ত বিষয়ের ভাগ নিতে হয়, সে খেয়াল নেই। ভারতবর্ষেরই মধ্য-যুগের সাধকদের জীবনে দেখা যায়, ঐহিক জীবিকার চেষ্টা পারত্রিক উন্নতি সাধনের বিঘ্ন নয়—তবে জীবিকা অর্জনে সন্তুষ্ট থাকা, আর লাভের লোভে মাতোয়ারা হওয়া, দুটো জিনিষ আলাদা। শেষেরটা ত্যাগ করে প্রথমটা রাখলে নিজের জোরে থাকা যায়, কারও গলগ্রহ হতে হয় না।

পরের কাঁধে চাপার এ সহজ উপায়টি জাহির হওয়ায় মেকী-ও চলছে বিস্তর ; বিষয়ে যারা মোটেই বিরাগী নয়, তারাও ভেখ নিয়ে রোজগারের দায় এড়ায়। কুম্ভ-মেলার সময় একজন গেরুয়াধারীর নিজের এষ্টিমেট শোনা গিয়েছিল—লাখে একজন সাচ্চা মেলে না। এতে দেশের অবস্থা যদি কাহিল হ'য়ে থাকে, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?

আবার বলি, মিছে আক্ষেপ করার জন্যে এ সব কথা তোলা হচ্ছে না। একজনের ফেল হবার কারণ বোঝা থাকলে অন্যের পাস হবার সম্ভাবনা যাচাই করা সহজ হয়।

"যে যার কর্ম-ফল ভোগ করবে, আমি তার করবো কি ?—নিজের শান্তির চেষ্টা দেখি !"—এ ধারার নাম আর যাই হোক, একে প্রেমের পথ বলা যায় না। এর উল্টো ভাব হচ্ছে USSR-এর। "যে যেমন ক'রেই ধরায় এসে থাকি, আমরা সকলেই ভবলীলার খেলুড়ে। এসো তবে, সকলে যাতে ভাল ক'রে খেলতে পারি, পরস্পরকে সাহায্য করা যাক, খেলাটা ভাল ক'রে জমিয়ে সকলে মিলে আনন্দ করা যাক।" একে অন্তত নিরানন্দের পথ বলা যায় না।

তবে নাম নিয়ে ত নয়, পরিণাম নিয়ে কথা ! যে পথে লাখে একজন উচ্চ অবস্থা পেলেও পেতে পারে, আর বাকি সকলে দ'য় মজে, তার বিষম পাকের চেহারা ত আমরা চারদিকেই দেখছি—গোড়ায় পুষ্টির অভাবে বলক্ষয় ; বলহীনের বুদ্ধি-নাশ, ঐহিক পারত্রিক উন্নতির পথ বন্ধ ; শেষে রিক্ত আত্মার আরো বলক্ষয়। অন্য দিকে, ইহলীলা ভাল ক'রে খেল্লে তাতেই শরীর মনের পুষ্টি, সেকথা কে না মান্‌বে। ভাল ক'রে খেলা মানে ভালবেসে খেলা। প্রেমের গতি কেন্দ্রাতিগ ; বাড়ার দিকেই চলে। আশ পাশের প্রেম উপরের প্রেমকে টেনে আনে, উপর

থেকে প্রেম নামলে বিশ্বময় ছড়ায়। খেলা জমে উঠলে খেলানে-ওয়ালাকে দলে টেনে নিয়ে শেষে আরো বড় খেলা ফাঁদবার আশা থাকে না কি? অন্তত এইটুকু জোর ক'রে বলা চলে,—লীলাময়ের দেওয়া খেলা ফূর্ত্তি ক'রে খেল্লে তাঁর সঙ্গে ঝগড়ার কারণ হতেই পারে না।

আপত্তি করতে পার,—এ সব ভারতবর্ষী ভাব রুষদেশ সম্বন্ধে খাটবে না। আচ্ছা বেশ, ওদেরই পাঁচজনের কথা একজনের জবানীতে, আমাদের সেই প্রবাসীর টোঁকা থেকে শুনিয়ে দেওয়া যাক। এক বিপ্লবী সমবায়-সম্পাদক বলছেন—

"মার্কিন দেশ থেকে যারাই আমাদের বিপ্লবের খবর করতে আসে, তারা জিজ্ঞেস করে—ওহে, তোমরা যে এত ভাবছো, এত খাটছো, যতই অসুবিধে হোক ভাল মনে স'য়ে যাচ্ছ, এ কোন্ সম্পদ পাবার আশায়? তোমাদের নিজেদের পাওনা থোওনার ত কোনো ব্যবস্থাই দেখছি নে।

"আমাদের উত্তর এই—তোমরা যে সব বিলাসের উপকরণকে সম্পদ বলো, তা আমরা পাব না বটে, পাবার সখও নেই; পরের ঘাড়-ভাঙার যে ক্ষমতাকে তোমরা খ্যাতি-প্রতিপত্তি ব'লে থাকো, তাও পাব না, পেলে নিতাম না; কিন্তু আমার গ্রামের ফসল বাড়ুক, আর হাজার মাইল দূরে খাল কেটে জলদানের ব্যবস্থা হোক, আমার পাড়ার কারখানা ভাল চলুক, আর অন্য প্রদেশের খনি থেকে রত্ন উঠুক, সব তাতে আমার মনপ্রাণ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, কারণ আমি জানি, এ সব কোনো সম্পদ একজনের বা একদলের নয়, সমৃদ্ধি সকলেরই; আর সে "সকলের" মধ্যে আমিও আছি, সুতরাং আমারই! এত বড় লাভের জন্যে যে কর্তৃত্ব-টুকু ছাড়তে হয়েছে, সে ত্যাগে কাঁটা নেই, তাতে সমবেত সম্ভোগের যে ফুল ফোটে তার রাষ্ট্র-জোড়া সৌরভে আমরা

নিশিদিন মাতোয়ারা। সোনায় গিল্টি করা লাগে না, ফুলে রং দিতে হয় না, আমাদের আনন্দের লজ্জত বাড়াবার জন্যে সে-কেলে ধর্ম-জীবীদের বাসী-বচনের পালিশ আবশ্যক নেই।”

আমরা গোড়ায় প্রশ্ন তুলেছিলাম—সমবায়ের হাতে সম্পত্তি থাকায় ব্যক্তিগত আর্থিক ঔদাসিন্য, পারমার্থিক উন্নতির বাধা হয় কি না। সম্পাদকের কথা যা শোনা গেল, তাতে বেশ বোঝা যায়, নিজের উন্নতির সঙ্গে সকলের উন্নতি জড়িয়ে গেলে ব্যক্তির উৎসাহ কম পড়ে না। যদি বল এ তন্ত্রে মার্কিন দেশের মতো অত বড় বড় কারখানা জন্মায় না, তার উত্তরে বলতে হয় USSR-এর সব কারখানাই ত এক প্রকাণ্ড কারখানার শাখা, সুতরাং আয়তনের দিক থেকে ধরলেও একদল নেতার হাতে এত বড় আয়োজন আর কোথাও দেখা যায় না।

কিন্তু আমরা সাবধান ক'রে দিয়েছিলাম যে, লক্ষ্মীর প্রসাদ বড় মজার জিনিষ, তাকে ও রকম স্থূলভাবে মাপলে ঠকা হয়। তুলনা করতে হলে একদিকে রাখো প্রত্যেক সমবায়ীর কাছে সকলের আনন্দের যে ভাগ পৌছয়; অন্যদিকে রাখো সেই সমবায়ীর নিজের শ্রমের ক্লেশ। দাঁড়ি-পাল্লা তুলে ধরলেই মজাটা বেরিয়ে পড়বে। প্রথম দিকে দেখবে আনন্দকে ভাগাভাগি ক'রে নিলে গণিতের নিয়ম মানে না, ক'মে না গিয়ে বেড়ে যায়! অন্য দিকে সুস্থ সবল শরীর দুশ্চিন্তা-রহিত মন দিয়ে যে শ্রম করা যায় তাতে ত ক্লেশই থাকে না, সেও আনন্দের পাল্লায় গিয়ে বসতে চায়!

এ চমৎকার ব্যাপার দেখো আর মনের আনন্দে জয়জয়কার করো। কার জয়? যে আনন্দ দিচ্ছে, যে আনন্দ পাচ্ছে, তোমার আমার মতো যারা সে আনন্দ-দৃশ্য দেখছে, সব উপরে যিনি আনন্দের মূল উৎস,—সকলেরই জয়!

পারমাথিক উন্নতির কথা আর বেশী বাকি কি? বোঝাইত গেল,

সঙ্ঘের কারণে ঘটা দূরে থাক, বাধা আসে অভাব থেকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির রাজ্যে যে কৃতী তার একমাত্র লক্ষ্য সম্পত্তি বাড়িয়ে চলা,—ছেলে থাকলে বাড়াও, ছেলে না থাকলেও বাড়াও ছেলে ব'কে যাচ্ছে তবুও বাড়াও, ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়াও, মরতে মরতে বাড়াও—এ অবস্থায় আত্মার খবর সে কি রাখবে? আর যে অকৃতী, সে ত শুখোচ্ছে, আশায় আশায় শুখোচ্ছে, নিরাশায় শুখোচ্ছে, প্রবলের চাপে শুখোচ্ছে, অভাবে ক্ষীণ হয়ে শুখোচ্ছে,—ঠাকুর দেবতার নাম ধরে আর্তনাদ করলে কি হবে, আত্মার সন্ধান ত দুর্বলে পায় না। বাড়তি কমতি এই দুই বিষম অবস্থা থেকে সমবায়ে যে মুক্তি পেয়েছে, সে ত বেঁচে গেছে।

অতএব, সঙ্ঘের ভারে মানুষকে তরীর মতো উপরে ভাসিয়ে তোলে, জড়পিণ্ডের মতো তাকে তলিয়ে দেয় না,—এই রায় দিয়ে তৃতীয় বর্গের আলোচনায় বসা যাক।

স্বে-মহিম্নি

অন্য সভ্য সমাজের তুলনায় USSR-এর বিধানে স্ত্রীজাতির অবস্থা ভালমন্দ কেমন দাঁড়িয়েছে, সে খবর শ্রোতার কাছে ধ'রে দেওয়ার আগে যাকে বলে "নর-নারী-সমস্যা" সেটা নিয়ে আপোষে একটু বোঝাপড়া ক'রে নেওয়া মন্দ না। বাস্তবিকই যত সব সমাজের উপর এ সমস্যাটা যেন ঝোড়ো অন্ধকারের মতো চেপে আছে, সমাজ-নেতারা কূলকিনারা ঠাওর পাচ্ছেন না। কিন্তু ব'লে রাখি, আমরা ভয়ভাবনায় মন ভার ক'রে আলোচনায় ব'সছি নে।

শুধু মানুষের নয়, অনেক শ্রেণীর জীবের মধ্যে সন্তান উৎপাদন-লালন-পালনের ভার স্ত্রীপুরুষের উপর ভাগ ক'রে দেওয়া আছে। প্রকৃতির নিজের জন্মটা কিনা আনন্দ থেকে, তাই তিনিও সন্তানদের জীবন-যাত্রায় আহারে বিহারে ব্যায়ামে বিরামে, পদে পদেই আনন্দের ব্যবস্থা করেছেন। বংশ-বৃদ্ধি কাজটা জীবনের ধারা চালাবার পক্ষে যেমন দরকারী, স্ত্রী-পুরুষের আনন্দের বরাদ্দটাও তেমনি বেশী।

যে কাজের সঙ্গে যে আনন্দ দেওয়া আছে, পশুরা তাই সাদাসিধে ভাবে উপভোগ করে। যেমন আহ্লাদ ক'রে খায় দায় লাফায় ঝাঁপায় ঘুমোয়, তেমনি ফূর্তি ক'রে যথাকালে জোড় বাঁধে, বাচ্ছা দেয়, তাদিকে খোরাক যোগায়, লায়েক হ'লে সংসারে ছেড়ে দিয়ে জীবনের এক পরিচ্ছেদ খতম করে।

লোভ মানুষকে পেয়ে বসায় তার এমন বদ অভ্যেস হয়ে গেছে যে, পরিচ্ছেদ ছেড়ে সে জীবনের কোনো প্যারাগ্রাফকে ফুরোতে দিতে চায় না। প্রকৃতিমায়ের দেওয়া আনন্দ যেখানে যা পাবার, এমন কি যেখানে নাও পাবার, ক'চলে বেশী ক'রে আদায় করতে গিয়ে, জীবনটাই বিস্বাদ ক'রে ফেলে। ফলে দুর্ভোগী আর ফাঁকা-ত্যাগী দুই দলে সমস্বরে ফুকরে ওঠে—"সবি ইঃ আর উঃ আর আঃ, জীবনটাই কিছু নাঃ!"

আহারের ব্যবস্থা দেখলে মানুষ-জাতের ভাবটা পাওয়া যায়। মুখে যেই খাবার ভাল লাগা, ওমনি বুদ্ধি এসে বাৎলায়—"একা জিভটার উপর সব চাপানো কেন, চোখ-রুচি সাজাও, নাক-রুচি গন্ধ লাগাও, কান-রুচি হাপুস-হুপুসও যেন বাদ না যায়, তবে ত ষোলোআনা মজা পাবে।" সেই সঙ্গে রিপু জুটে ফোসলায়,—"ক্ষিধের কমতি থাকলে চাটনী; পেট ভার করলে হজমীগুলি!" রোমানরা ছিল বড় পাকা জাত। ভোজে একপ্রস্থ নতুন ব্যঞ্জন পরিবেশনের যোগাড় দেখলে, উঠে গিয়ে বমি ক'রে

জায়গা খালি ক'রে আসতো! এখন জাত কলির শেষে মূষলিনী প্রসব করলে কেন, যদুবংশের ইতিহাসে তার নজির পাওয়া যেতে পারে।

এই সবই বুদ্ধির আড়ালে আদি-রিপু লোভের কেরামতি। রিপুটির ছদ্ম-বেশ ভেদ ক'রে চিনে নিতে পারলে তার জারিজুরি আর খাটে না। জঠরের আগুন ওস্কাতে গিয়ে চিতার আগুণটা অকালে টেনে আনা না হয়, নিজের দাঁত দিয়ে নিজের গোর না খোঁড়া হয়, সে বিষয়ে মানুষে সাবধান হ'য়ে আসছে। আগে আগে ব্যায়ামে-বাড়ানো শরীরের বহর দেখিয়ে লোকে আস্ফালন করতে ভালবাসতো, এখন বুঝেছে মাংস-পেশী ফোলাতে গিয়ে হৃৎপিণ্ড ফেল পড়তে পারে। প্রভুত্ব যতই মিষ্টি লাগুক, আজকাল বিপ্লবের ছায়া যেখানে সেখানে যে রকম উঁকি-ঝুঁকি মারছে, তাতে যা রয়সয় তারি মধ্যে কর্তারা নিজেকে সম্বরণ করতে শিখছে।

কিন্তু নরনারী-সমস্যা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে ত বাড়ছেই,—তার মানে ওটা একা রিপুর পাকানো ফ্যাসাদ নয়, ওতে মিত্রেরও হাত আছে। এ রকম জটিল জিনিষকে ছাড়িয়ে দেখা দরকার, নইলে জটের প্যাঁচে বুদ্ধিটাও জড়িয়ে যেতে পারে। হ'লে কি হবে, এ সমস্যার কথা উঠলে লোকে হয় গদ্‌গদ, নয় জড়সড়, নয় আগুন হয়ে ওঠায় ওর খেইগুলো আলাদা ক'রে ধরাই যায় না। আচ্ছা, হয় না ত কি হয়েছে, আমরাই ঠাণ্ডা মনে বিচার করলেই ত চুকে যাবে।

রিপুর হাত কোথায় ভাবতে গেলে দেখা যায়, নারীকে নরের সম্পত্তি বানিয়ে দিয়ে সে এক আঁচড়েই কর্ম সারা করেছে। এখন সমাজের যে স্তরেই দেখ, সেই অঘটনের ক্রিয়া চলছে।

আসুরিক স্তরে পুরুষটা প্রণয়িনীকে ঘাড়ে ধ'রে নিজের আড্ডায় টেনে নিয়ে যায়, সেখানে তাকে দিয়ে দাসীগিরি, রাঁধুনি-গিরি মা-গিরি

সব করায়। স্ত্রীলোকটা ভর্তার কাছে পেটভাতা পায়, তাছাড়া সে এটাও বোঝে যে, ছুটো থেকে পশুপতির থাবা খাওয়ার চেয়ে মানুষ-পতির চড়টা চাপড়টা মন্দের ভাল, তাই চুপচাপ না থাকলেও, তার ঘরে টিঁকে থাকে ঠিক।

পৈশাচিক সমাজে সৌখীন নর-পুঙ্গব তার অর্থ-সামর্থ্যে যে পর্যন্ত কুলোয়, ততগুলি রমণী-রত্ন সে সংগ্রহ করে। অবলা মানুষ নিরাশ্রয় থাকলে পাঁচ জনের মন যুগিয়ে তাকে চালাতে হ'ত, তার চেয়ে একজনকে খুসী করে যদি খাওয়াপরা সাজসজ্জা আরামে পাওয়া যায় মন্দই বা কি, তাই এ অবস্থায়ও সে পোষ মেনে থাকে, এমন কি কামিনী-গিরি প্র্যাক্‌টিস ক'রে কিছু সুবিধেও ক'রে নেয়।

আসল বাঁধন ধর্মের ফাঁদে। শাস্ত্রে-আইনে মিলে ইহকাল-পরকাল জড়ানো শিকল বার করেছে। তন্ত্র-মতো মন্ত্র একবার আওড়ে ফেল্লে ক'নের আর ছাড়ন-ছোড়ন নেই। গৃহকর্তা বেঁচে থাকতে তার ঘরের, তার কুলের, তার সখসাধের প্রসঙ্গ নিয়েই জীবন, পতি-দেবতা মারা গেলেও নিজেকে ভুলে তার ধ্যানে মসগুল থাকতে হয়। পুরস্কার কি,—না "সতী" খেতাব। আর পায় কে? ধর্মের সিঁদ কাঠির মতো উঁচু-অঙ্গের মন চুরী করার উপায় আর নেই, স্বাধীন বিচারের মাথা ঐ খানেই খাওয়া গেল। জীবন উৎসর্গও তুচ্ছ কথা, সতী বল্লে পতিব্রতা আগুণেও ঝাঁপ দিতে রাজি!

আজকালকার রুচিতে এ সব অবস্থার কোনোটাই যদি ছেলে-মেয়েদের মনে না ধরে তাতে তাদের অপরাধ কি? যে ভাবে হোক, ভয় দেখিয়ে ঘুষ খাইয়ে বোকা বুঝিয়ে—স্ত্রীজাতিকে মানিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু তাতে তার হালটা কি দাঁড়ায়? নিজেকে কেন্দ্র ক'রে তার চারদিকে স্ত্রীকে ঘুরিয়ে যে পুরুষ সন্তুষ্ট থাকে তার সেই সঙ্কীর্ণ

মনের মাপে সেই ঘরের বৌ, সেই কুল-বধূকে খাটো হ'য়ে থাকতে হয়। তারপর সেই-মতো ছাঁটাই নারীকে শক্তিরূপিণী ব'লে হাজার খোসামোদ করলেও, সে কোনো বড় কাজ করার শক্তি পাবে কোত্থেকে?

ছেলেকে মেষ না ক'রে মানুষ করা, সংসারকে গারদ না ক'রে লীলাঘর করা, আগামী কৃত-যুগ আবাহনের আয়োজন করা,—নরনারী নিজ নিজ মহিমায় মিল্লে তবেই এ সবের আশা থাকে, কিন্তু আমরা যত গুলি সম্পত্তি-পাগল সমাজ জানি তার মধ্যে সে সম্ভাবনা কোথায়?

বলা হয়েছিল নরনারী সমস্যার মধ্যে মিত্রেরও হাত আছে। সে রহস্যটাও এবার খুলে দেখার চেষ্টা দেখা যাক।

প্রারম্ভে শ্রোতাকে সেই খাঁটি প্রেমের কথা মনে করিয়ে দিই, আনন্দলোকের সঙ্গে যে প্রেম মানুষকে যোগ ক'রে রাখে, যার ধারা একেবারে ছেড়ে গেলে মানুষ ঘোর অন্ধকারে তলিয়ে যায়। এ প্রেমের প্রকার বা ক্রিয়া এ বর্গের মধ্যে আলোচনা হ'তে পারে না, তবে আমাদের কথাটা ফোটাবার জন্যে যেটুকু দরকার তাই বলা যাক।

বিশুদ্ধ স্বাধীন ভাবই খাঁটি প্রেমের বিশেষ লক্ষণ। সংসারের কাজে এ প্রেম আমাদের সহায় নয়; এর প্রভাবে মা-বাপ সন্তানকে কোলে-পিঠে নেয় না, দম্পতি সোহাগ করে না, সন্তান মাবাপের নেওটো হয় না। স্নেহ মমতা ভক্তির সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই,—এক নিছক সখ্যের মধ্যে সংসারে একে দৈবাৎ পাওয়া যায়। গুরু-শিষ্য, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ, নর-নারী এ সব ভেদে এ প্রেমের বাধা ঘটে না, বড় জোর রং বা সৌরভের কিছু রকমারি হতে পারে। প্রয়োজন বা সম্বন্ধের দাবী এর অন্তরায়। এর আকর্ষণে মানুষ মানুষকে টানে কিন্তু বাঁধে না। আপাতত আমরা যদি মেনে নিই যে এ রকম প্রেম কদাচ লাভ হ'লেও, এ ধন জগতে আছে, তাহলেই এ বর্গের আলোচনার কাজ চ'লে যাবে।

যেখানেই পাঁচরকম সাংসারিক ভালবাসার সঙ্গে এই মুক্ত প্রেমকে গুলিয়ে ফেলা হয় সেখানেই বুদ্ধি বিপাকে প'ড়ে একটা না একটা সমস্যা পাকিয়ে উঠতে চায়। তাই এক পত্তন সাংসারিক ভাবগুলিকে ছাড়িয়ে ছুড়িয়ে শাদা বুদ্ধির আলোতে তুলে ধ'রে, মাথাটা ভাষাটা পরিষ্কার ক'রে নেওয়া যাক। বাঁধি গৎ নিয়ে গ'লে থাকলে চলে না। খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে কোনো ভাবের অপ্রচলিত চেহারা বেরিয়ে পড়লেও তাতে ভয় পাবার কিছু নেই।

প্রথমে ধর স্নেহ। এ কথাটা বেশ। যে ভাব মায়ের বুকে দুধ টেনে আনে, যে ভাবে ছেলেকে কোলে ধ'রে মা-বাপে আদর করেন, সাজান গোজান, খেলেন খেলান,—স্নেহ তার উপযুক্ত নাম। অপর পক্ষে, স্নেহের বিনিময়ে যে মিষ্টি রস মা বাপ আদায় ক'রে নেন, ছেলেকে পালন করার পরিশ্রমের তাই তাঁদের পুরস্কার,—বড় হ'য়ে ছেলে কৃতজ্ঞ হবে তার অপেক্ষা দুনিয়াদারীর অভ্যেসে মা বাপ করতে পারেন কিন্তু স্নেহতে তা করায় না। এই পুরস্কার প্রাণ ভ'রে উপভোগে কোনো দোষ নেই যদি মনে রাখা যায় স্নেহের স্বাভাবিক আয়ু শিশুকালের সীমার মধ্যে পরিমিত। শিক্ষা দীক্ষার সময় এলে স্নেহের জায়গায় মিত্রতা আসার দরকার, নইলে বুড়ো ছেলেকে আঁচল-বাঁধা করলে, কিম্বা নিজের মনের মতো তার স্বভাবকে মোচড়াবার চেষ্টা করলে, না ছেলের না মা-বাপের পক্ষে ভাল।

সে যাই হোক, আমরা যে বন্ধন-হীন প্রেমের কথা বলছিলাম এ পরিমিত বাৎসল্যবৃত্তি সে প্রেম নয়। তবে স্নেহ-ভক্তির জঞ্জাল যথা-কালে কাটিয়ে উঠতে পারলে, মা-বাপ ছেলে-মেয়ের মধ্যে সেই অহেতুকী প্রেমের সঞ্চার হতে পারে না, এমন কোনো কথা নেই।

ভক্তি জিনিষটা কিন্তু অদ্ভুত। শ্রদ্ধাতে ভক্তিতে তফাৎ এই যে,

সত্যিকার কোনো গুণ অনুভব করলে, অন্যদোষ দেখা সত্ত্বেও শ্রদ্ধা আপনি আসে, তার জন্যে ঢাক্‌ঢাক্‌ গুড় গুড় লাগে না। গুণ আরোপ ক'রে, দোষ চাপা দিয়ে তবে ভক্তি আনতে হয়; বিগ্রহে যেমন প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে, স্তবস্তুতি দিয়ে বাড়িয়ে না তুল্লে তার পূজো চলে না। এই জন্যে মা-বাপ সম্বন্ধে ছেলেপিলের যে স্বাভাবিক ভাব, তার নাম "ভক্তি" দিতে আমরা নারাজ। যাঁদের আত্ম-সম্ভ্রম-বোধ আছে এমন কোন্‌ মা-বাপ ছেলেদের কাছে মেকি দেবতা সেজে থাকতে চান? পাকা বুদ্ধি বা উদার হৃদয়ের গুণে কোনো মা-বাপ যদি ছেলেদের শ্রদ্ধা পান, ভালই; না পেলেই বা কি? নিজেদের দোষে না খোয়ালে সব মা-বাপ নিশ্চয়ই ভালবাসার অধিকারী। ভাল-বাসায় যার কুলোয় না, ভালবাসা কি সে তা জানে না।

এত কথার পর বলাই বাহুল্য আমরা যে প্রেমের কথা বলছিলাম ভক্তির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

এবার আসল কথায় আসা যাক। যে স্বাভাবিক টানে যুবক-যুবতী প্রজনার্থ পরস্পরকে চায় তার নাম দেওয়া যাক প্রণয়। এই প্রণয়ের সহজ রাস্তায় সকারণে অকারণে মানুষ নানা বাধা বিঘ্ন এনে ফেলেছে,—সমাজের বিধি নিষেধ, দুই পক্ষের মা-বাপের ইচ্ছে অনিচ্ছে, টাকাকড়ি নিয়ে টানাটানি, আরও কত কি। ফলে, সমাজের মধ্যে স্বাভাবিক প্রণয় অনুসারে পরিণয় বড় একটা ঘটে না, বিয়ের পর যেটুকু প্রণয় গজায় তাই নিয়েই দম্পতিকে ঘর করতে হয়। প্রণয়ের স্বাভাবিক স্থান গৃহের মধ্যে, ওর স্বাভাবিক আয়ু গৃহস্থাশ্রমেই শেষ। স্বস্থানে ওকে না রাখলে এক পত্তন ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়; তার উপর ওকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ওর মধ্যে যা নেই তা আদায়ের চেষ্টা করলে শরীর মনের স্বাস্থ্য ত নষ্ট হয়ই, তার উপর যেটা ছিল মাত্র ফ্যাসাদ সেটা সমস্যা হয়ে ওঠে।

প্রকৃতির জীব-ধারা-রক্ষার উপায় যে দৈহিক প্রণয়, আর মানবাত্মার মহাযাত্রার পাথেয় যে বিদেহী প্রেম, এ দুইয়ের মধ্যে মানুষের মনে অনেককাল থেকে যেন একটা গোল পাকিয়ে র'য়েছে।

কবি যখন বিলাপ করলেন—লাখো যুগ ধ'রে হিয়ায় হিয়া রেখে জুড়োনো গেল না, তখন এ সহজ কথাটা তিনি কি ভুলেছিলেন যে, হিয়ায় মিলনের আনন্দের রেশ ক্ষণ-কয়েকের বেশী থাকে না? তা ত সম্ভব নয়, তবে কী ভেবে তিনি তাতে যুগ-ভরা আশের কথা তুলেছিলেন? মনে হয়, তাঁর প্রিয়া তাঁর সঙ্গে এক আধ্যাত্মিক স্তরে ছিলেন না, তাই কাছা-কাছি আসার কারণে আত্মায় আত্মায় যে স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করতেন, সেটা সত্যিকার প্রেমের মিলন পর্যন্ত পৌছতে পেতো না,—না পেলেও কি-যেন-হ'লে-হতে-পারতো, কি-যেন-হ'য়েও-হ'ল-না এ রকমের অস্ফুট আক্ষেপ কবির গভীরে র'য়ে যেতো।

যবন-দার্শনিক Plato এই বিদেহী প্রেমকে আলাদা ক'রে চিনে-ছিলেন ব'লে মনে হয়। কিন্তু সে দেশেরই হোক, এ দেশেরই হোক, সে-কেলে কবিরা সম-স্তরের সঙ্গী-সঙ্গিনী না পাওয়ায়, বা যে কারণেই হোক, তাঁদের আদিরসের গুণগান দেহের বন্ধন ছাড়িয়ে উঠতো না, অথচ আসল প্রেমের আকাঙ্ক্ষা তাঁদের ছিল নিশ্চয়ই, তাঁদের রচনাশক্তির ত কথাই নেই, তাই তাঁদের সোনার কাঠির পরশে তাঁরা প্রণয়কেই গিল্টি ক'রে নিয়ে গেছেন। তাঁদের আধুনিক জাতভাইরাও অনেকে সেই কাজে লেগে আছেন।

ফলে, সাহিত্যজগতে প্রণয়কে যে রং চড়িয়ে রাখা হয়েছে, তাতে মানুষের বাস্তব জীবনে অনেক অলীক সাধবাসনা জেগে ওঠে, যার তৃপ্তির উপায় সাহিত্যেও দেখানো নেই, ভুল পথে খুঁজে পাঠকরাও পায় না, কাজেই হতাশ হয়, হা হুতাশ করে, নানা জালে জড়ায়। প্রণয়কে

অতি উঁচুতে তুলতে গিয়ে গোলটা বেধেছে ব'লে তাকে মিত্রের মার বলা হয়েছিল।

তবে কি না, মিত্রের উপর রাগ করা দূরে থাক, আমরা রিপুকেও বন্ধু ক'রে নেওয়ার পক্ষপাতী। সব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আহারের ব্যাপারটা পরিপাটী ক'রে আনা, সে ত সভ্যতার একটা উজ্জ্বল কীর্ত্তি। রিপুকে ভয় করার কোনো কারণ থাকে না যদি রুচিকে হামেশা বুদ্ধির সাথী ক'রে রাখা যায়। হাজার চমৎকার পশমী কাপড় যেমন ভাবুনে মহিলারও গরমী কালে গায়ে চড়াবার সখ হয় না, তেমনি খাবার বিষয়ে অখাদ্যে সহজ অরুচি বুদ্ধির সাহায্যেও চর্চা করা যায় না কি?

প্রণয় সম্বন্ধে ভাবুকের ভুলটা বুঝে চলতে পারলে তার দোষও আপনি কেটে যাবে।

নন্দন-কাননে যুগল ভ্রমণ, চাঁদনীর লজ্জত, পাখীর তান, ফুলের সুবাস, দখিনে বায়, দুঁহু দোঁহার পানে চাওয়া, এসবে যার প্রাণ না মাতে, এর এককণা রস যে বাদ দিতে চায়, তাকে ত আকাট বেরসিক বলি। ও দিকে, এক বাসা, এক জীবিকা, একই সন্তান-সন্ততি আত্মীয়-কুটুম্ব নিয়ে ঘর ক'রেও যে দম্পতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বা অন্তত রফারফি না হ'য়ে যায়, তাদিকে বেধড় বদ-মেজাজী বলি। কিন্তু কথক হলেই কথা নিয়ে পিটপিটে হতে হয়, তাই আপত্তি করি, যতই চমৎকার হোক, এ সবকে প্রেম বলা কেন?

তবে কি প্রণয়ীদের মধ্যে প্রেম হয়ই না? ধাপে ধাপে উঠতে পারলে হ'তে পারে বৈকি।

প্রজনার্থ প্রণয় (দেহের মিলনে ইন্দ্রিয়-সুখ বিনিময়)।

সহবাসে ভাব (মনের মিলে চিত্ত-বৃত্তির বাণী-বিনিময়)।

সহ-ধর্মে প্রেম (আত্মার একী-করণে সত্তার আনন্দ বিনিময়—যার ভাষা

কবি Shelly দিয়েছেন—in one another's being mingle, যদিও পাশ্চাত্য পাঠকরা এ ভাষার সে মানে ধরেন কিনা সন্দেহ)।

এই ধাপ ধ'রে উঠলে প্রণয়ীযুগল চরম অবস্থায় পৌঁছতে না পারবে কেন? কিন্তু বিয়ের মন্ত্রপড়াগোছের কোনো কৃত্রিম তুকতাকে প্রেম হয় না ; তাছাড়া, না হতেই হয়েছে মনে করায় বা বলায় লাভই বা কি? তাতে উল্টে প্রেমের পথে বাধা পড়ে।

এই ভূমিকার পর নরনারীসমস্যা আর একটু খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে।

প্রকৃতির নির্দেশ মতো বর-কনের মিলনের পথে জাতকুলমেল যত রকমের বাধা ছিল তার মধ্যে ক্রমশ প্রধান হয়ে দাঁড়াচ্ছে টাকা। তার প্রথম ফল এই যে, যে-ছেলে সুবিবেচক, দূরদর্শী, সে বিয়ে করছে না, যারা ছ্যাবলা, কাণ্ডজ্ঞান-রহিত, তারাই নিথাকী বংশ বৃদ্ধি ক'রে অশেষ যন্ত্রণার সৃষ্টি করছে। সমাজের গতি তাতে নীচের দিকেই চলেছে।

যথাকালে উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর বিয়ে না হওয়ায় প্রকৃতির তাড়নায় নানা সামাজিক উপসর্গও দেখা দিচ্ছে। কিন্তু সামান্য ত্রুটির সোজা-সুজি সংশোধন না ক'রে তার উপর মহাপাতকের বোঝা চাপিয়ে প্রণয়-ঘটিত অপরাধের এমন ভীষণ মূর্ত্তি খাড়া করা হয় যে, সাহায্য করতে কেও এগোয় না, খালি সাজার কথাই ভাবে। কিন্তু যতই রাগ হোক, সমাজ ত শক্তের বাঘ হতে সাহস পায় না, কাজেই যে অবলা আইনের আশ্রয় পায়নি, যে শিশু বিনা-মন্ত্রের আমন্ত্রণে ধরায় এসে পড়েছে, চোট্‌পাট্‌টা তাদের উপরেই গিয়ে পড়ে। নর-নারী সমস্যা ত নয়, অবলা-শিশু সমস্যাই বলতে হয়। সমাজের ক্ষয়ের এই অপর কারণ।

সমাজ বৃদ্ধেরা কপাল চাপড়ান, পাহারা কড়া করেন, সাজা বাড়াতে বসেন,—অপরাধের জড়-মারার ভাবনা ছাড়া আর সবই ভাবেন। জড় মারার উপায় করেছেন USSR-এর বিপ্লবীরা।

এক বিষে, এক ভুলে যদি নর-নারী সম্বন্ধ অসুস্থ হ'য়ে থাকে, তাহলে এক ওষুধেই বা স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে পারা যাবে না কেন? ব্যক্তির হাতে সম্পত্তি থাকায়, মানুষের সমান-ভাবে খাওয়া পরার, স্বাভাবিক ভাবে মেলামেশার যে-সব অন্তরায় হয়ে থাকে, সমবায়ের হাতে সম্পত্তি এনে ফেলায় এক বিধানে সে সব উড়ে গেল। নারীও আর সম্পত্তির কোঠায় রইলো না, সে হ'ল সব বিষয়ে নরের সম-অধিকারী।

মানুষ হ'ল অর্দ্ধ পশু-দেব ; এই জোড়া-স্বভাবের দোটানায় প'ড়ে তার যত গোল বাধে। যে সব দেহসুখ পশুরও আছে মানুষেরও আছে, একদিকে সেগুলো শাদা-ভাবে ভোগ না করে বুদ্ধির জোরে জবরদস্তি বাড়াবার যে সব দুর্ভোগ তার কথা ত আগেই বলা হয়েছে। অন্যদিকে মানুষ পেয়েছে ডেপুটি-স্রষ্টার পদ, সৃষ্টি কাজেই তার মানুষের উপযুক্ত উঁচু-দরের আনন্দ পাবার উপায়, সৃষ্টির নব নব উন্মেষে তার ব্রহ্মাস্বাদের ভূমানন্দ পর্যন্ত পাবার উপায় আছে।

কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর চলছে যে-আধুনিক সভ্যতা, তার হুড়োহুড়ির চোটে শ্রান্ত-ক্লান্ত গৃহস্থের সৃষ্টি কাজের অবসর কোথায়? তাই সে নিশি দিন অবসাদে ডুবে থাকে, তাই জলে-পড়া লোক যেমন কুটোটা-কাটাটা আঁকড়ে ধরে, সে-ও তেমনি সহজে-পাওয়া-যায় যে-ইন্দ্রিয়-সুখ, সময়ে-অসময়ে স্থানে-অস্থানে তাই নিয়ে টানা-টানি করে। অহরহ অন্নচিন্তার জ্বালা থেকে সে যদি নিস্তার পায়, উচ্চ-আনন্দ-লাভের আস্বাদ পায়, সেকি সস্তা সুখের শাস্তিভোগের ধার দিয়ে আর যেতে ইচ্ছে করবে?

যা হোক, একে একে দেখাই যাক না, সঙ্ঘ-বদ্ধ হ'লে প্রকৃতির দেওয়া স্বাভাবিক সম্বন্ধগুলোর কি অবস্থা দাঁড়ায়।

আমরা ত দেখেছিলাম, পরিবারের মধ্যে বদ্ধ থাকলে স্নেহের

স্বাভাবিক আয়ু ফুলের মতো অল্পকাল স্থায়ী, টেনে রাখতে গেলে ফল খারাপ হয়। সমবায়ের হাতে প'ড়ে, আয়ু ঠিক রেখেও, পরিসর বাড়িয়ে স্নেহকে বিরাট ক'রে তোলা হয়েছে। যে নারীর যেমন মাতৃ-ভাবের জোর, সে ধাপে ধাপে নিজের ছেলেদের মা, সমবায়ের ছেলেদের মা, রাষ্ট্রের ছেলেদের মা হয়ে উঠতে পারে,—তার জন্যে শুধু যে দরজা খোলা তা নয়, সত্যিকার মায়ের সন্ধান পেলে রাষ্ট্রনেতারা তাঁকে আদর ক'রে ডেকে নিয়ে বড় ক'রে তোলেন।

সর্ব-ঐশ্বর্য-সম্পন্ন ভগবানকে তাঁর দেওয়া ভোগ্য-বস্তু ফিরে নিবেদন করার যথার্থ তাৎপর্য কি হতে পারে? যে মানুষ প্রসাদের অধিকারী সে অনধিকারীকে নিজের আসনে তুলে নিয়ে ভাগ দেবার চেষ্টা করলে সেটা বরং বেশ দিলারাম দৃশ্য হয়। তেমনি, মাবাপকে সন্তান প্রতি-দান কিবা দিতে পারে? মাবাপের কাছে পাওয়া যা কিছু ভাল জিনিষ সুদসুদ্ধ সেগুলো তার নিজের ছেলেপিলেকে বুঝিয়ে দিয়ে তবেই তার পিতৃমাতৃ ঋণ শোধ হতে পারে।—বিপ্লবী বিধানের এই ভাব।

আর ভক্তি? রাষ্ট্রপতিদের উপর ভক্তির চর্চা যে ভাবে চলে চলুক, কিন্তু USSR-এর সমাজে আপনা-আপনির মধ্যে তার জায়গা কোথায়? যেখানে মাথা খাড়া রেখে নর-নারী পরস্পরের চোখের দিকে সোজা চাইতে শিখেছে, সেখানে সব দৃষ্টিই শুভদৃষ্টি, সেখানে কাম-ভীতু লক্ষ্মণ-দেওরের মতো ভাজের পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকা লাগে না; সাধ্বী-নাম-পিপাসী সহধর্মিণীকে পতির দেবত্ব তল্লাসে কপালে চোখ ওঠাতেও হয় না। বিপ্লবী সমাজে পুরুষকে পতি খাড়া করা হয়ই না, ছেলেকে মানুষ করে তোলাই মনে করে সাধু-সাধ্বী উভয়েরই ধর্ম।

বিপ্লবী ছেলেমেয়েরা মা-বাপের পায়ের ধূলো চায় না, চায় অনেক-সওয়া চিত্তের সরসতা, অনেক জানা মগজের সার,—মা-বাপেও তাদিকে

তাই দিতেই ভালবাসেন। যখন জরা এসে তাঁদের পায়ে ধরে, তাঁরা তখন নবীনের হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে দ্রষ্টার আসনে নেমে এসে শোভা পান। সে শোভা যে দেখে সে খুসী হয়, ভক্তির কোনো প্রসঙ্গই ওঠে না।

শেষ কথা, এ সমাজে প্রণয়ের অবস্থা কি রকম?—খুব সোজা! নারীর দিক থেকে দেখলেই পষ্ট বোঝা যাবে।

প্রকৃতির ঠেলায় নারী ত যথাকালে ছেলের বাপ পছন্দ ক'রে নেবে। এ বিষয়ে কোনো বিধি-নিষেধের হাঙ্গাম, বা ভরণপোষণের ভাবনার চাপ না থাকায়, তার লুকোচুরি রংঢং কিছুই করা লাগে না, পছন্দটা স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে করতে পারে; তার জন্যে কারো সঙ্গে যেচে আলাপও করতে হয় না, কারণ কর্মসূত্রে সমবায়ী নর-নারীদের নিয়মিত দেখাশুনো মেলামেশা চলতেই থাকে। শেষে যাকে নির্বাচন করে তার সঙ্গে শিষ্টালাপ করে, মিষ্টালাপ করে, বন্ধুত্ব করে, সোহাগ করে; কিন্তু তাকে স্বর্গের দেবতা মনে ক'রে, বা তার সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ কল্পনা ক'রে, নিজেকে ভোলায় না।

পরের পছন্দে বিয়ে করতে হ'লে যে সকল ভুলভ্রান্তি আকছার হ'য়ে থাকে, এক্ষেত্রে সেগুলো থেকে দম্পতি অনেকটা রেহাই পায়; তবে নিজের কাঁচা বয়সের বাছাইতেও মাঝে মাঝে গলতি থেকে যায়। তাতে ভয় কি? পর্বতপ্রমাণ ভুল হলেও স্বীকার করলে শুধরে নেওয়া যায়। যার বাইরের চিকনচাকন দেখে মনে ধরেছিল, ঘর করার বেলা যদি তার ভিতরের খড় বেরিয়ে পড়ে, তবে মুখ ভার না ক'রে ভাল মনে আবার আলাদা হওয়াই ত ভাল। "প্রাণ যায়, তবু ধরেছি ত সেঁপ্টে থাকি!" এ ভীষণ পণে বাহাদুরী থাকতে পারে, সুমতির পরিচয় পাওয়া যায় না। বিশেষত ছেলেদিকে সামলে দেবার জন্যে যেখানে সমবায় রয়েছে।

নারীর দিক থেকে যা যা বলা গেল নরের দিকে সবই খাটে। নির্বাচন তরুণ-তরুণী পরস্পরকে করে,—এক হাতে ত তালি বাজে না।

এ সম্পর্কে USSR-এর সমবায়-নেতার কথাটা এই—

"শোনো, ছেলে-মেয়েরা! তোমরা কে কার সঙ্গ করো, বা ছাড়ো, সে বিষয়ে তোমরা স্বাধীন। কিন্তু খবরদার! ছেলে যদি জন্মায়, তার যেন স্বাস্থ্যের, শিক্ষার, আনন্দের ব্যাঘাত না হয়, সে বিষয়ে যদি ত্রুটি ধরা পড়ে, তবে পঞ্চায়েৎ ঘাড়ে ধরে তোমাদিকে সায়েস্তা করবে।"*

স্ত্রী-পুরুষের এ ভাবের মিলনে অনেকে আপত্তি করেন—"ভগবানকে ত সাক্ষী করা হ'য় না।" ভগবানকে সাক্ষী না ক'রে কেও কোনো কাজ করতে পারে, আস্তিকের পক্ষে এ কল্পনাটা আমাদের একটু অদ্ভুত লাগে।

Andre Gide ব'লে একজন বিখ্যাত ফরাসী কবি এই শেষ যুদ্ধের আগে গিয়ে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে শ্রমিকদের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ ক'রেছেন। লোকে বলে তিনি আগে যত USSR-এর পক্ষপাতী ছিলেন এখন তা নন। লোকের কথায় কি হবে, তিনি নিজে যা বলেছেন চুম্বকে কিছু বলি শোনো।

"কারখানায়, মাঠে, কাজের সময় হোক; আর ছুটির সময় বাগানে বেড়াতে গিয়ে হোক; USSR-এর শ্রমিকের দলে যেখানে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশেছি,—কবি ভাইদেরও শ্রমিকের দলেই ধরছি,—আমার মনে এক অভাবনীয় আনন্দের ঢেউ উঠেছে। তাদের মুক্ত জীবনের ছোঁয়া পেয়ে, আমার মধ্যেও কি যেন একটা বাধা স'রে গেল, দরদের ফোয়ারা ছুটলো, কখনো বা চোখে আনন্দের জল ঠেলে উঠলো। তাই দেখতে

---

*মাবাপের ছাড়াছাড়ি হ'লে পঞ্চায়তে ঠিক ক'রে দেয় কোন পক্ষ ছেলেকে কাছে রাখবে, কোন পক্ষকে খরচের কত ভাগ দিতে হবে।

পাবে আমার রুষে তোলা ছবিতে এমন একটা দিল-দরিয়া হাসি ফুটে আছে, দেশের ছবিতে যার লেশও নেই।

"আর ছেলেদের আড্ডায়,—হঠাৎ তাদের একটা চড়ি-ভাতিতে গিয়ে পড়েছিলাম—কি আনন্দের জেল্লা তাদের মুখ আলো ক'রে ছিল। সুস্থ পুষ্ট পরিচ্ছন্ন শরীর, তাদের বিশ্বাস-ভরা অসঙ্কোচ চাউনি যেন নিজের আনন্দের ভেট আমায় দিতে এগিয়ে এল। তাদের ভাষা জানিনে, জানার দরকারও বোধ করি নি। তারা আমায় বন্ধু ব'লে চিনলে, তাতেই আমার মন কেড়ে নিলে, তার উপর কথায় বলার কি থাকতে পারে?

"তরুণ-তরুণীদের মধ্যেও সেই সরল হাসি, সহজ আনন্দ। প্রমোদ উদ্যানে গিয়ে দেখি তারা নানা আমোদে মেতেছে, কিন্তু কী শ্লীলতা, কী সংযম! ইতরতা নেই, ছ্যাবলামি নেই; হাসিতে নিছক ফূর্ত্তি, খোঁচার ভাব, বিদ্রূপের ভাব, কারো মনে কষ্ট হতে পারে এমন কোনো ভাবই নেই। খেলার আয়োজন, ব্যায়ামের আয়োজন, নাচের আয়োজন, এ সবত আছেই, তার উপরে জায়গায় জায়গায় ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞানের বিষয়ে বক্তৃতা ত চলেছে; যারা শুনছে পুরো মন দিয়ে শুনছে, যারা অন্য আমোদ চায়, তারা অশিষ্টতা ক'রে রসভঙ্গ করছে না। সকলের জায়গা যেখানে নাও কুলোচ্ছে সেখানে ঠেলাঠেলি নেই, পালায় পালায় ঢোকার জন্যে প্রসন্ন মনে বাইরে অপেক্ষা করছে। তাই, লোকারণ্য হলেও হট্টগোল নেই। উৎসব থেকে যেন একটা প্রশান্ত আনন্দ উঠে আকাশ ভ'রে রেখেছে।"

একজন ফরাসী বন্ধু টিপ্পনী কেটেছিলেন—"এত অকাল-গাম্ভীর্য কি ভাল? ছেলেমেয়েদের মধ্যে ফ'চ্‌কেমী নেই, টিট্‌কারী নেই, কথা-কাটাকাটি নেই,—বয়স হলে এরা কি স্বাধীন বিচার ক'রতে

পারবে, না ধামাধরার দল তৈরী হবে ?” তার উত্তরে লেখক বলছেন —“এদের অকাল-বার্দ্ধক্য নয় গো—অকাল-যৌবন। যাদিকে তরুণ-তরুণী বলছি তারা যে-বয়সে যৌবনের ফূর্ত্তি টেনে রেখেছে, তাতে আমাদের দেশে বুড়িয়ে ব’সে যেতো।” বাস্তবিকই সত্যিকার গাম্ভীর্য যৌবনানন্দেরই জিনিষ, জরার শিথিলতায় তাকে পাওয়া ত যায় না।

আমাদের আরো মন্তব্য এই—

সমাজ-বৃদ্ধেরা সর্বদা আশঙ্কা করেন, নারীকে নেপথ্য গারদের বাইরে ছাড়া রাখলে, ইচ্ছেমতো চলতে ফিরতে দিলে, সমাজ লণ্ডভণ্ড হ’য়ে যাবে—ইচ্ছেকে তাঁরা কত ভয় করেন “যাচ্ছেতাই” কথাটার দুর্দশা থেকেই মালুম দেয়। কিন্তু কৈ ? USSR-এ তা’ত হ’ল না। হবেই বা কেন ? ননী খাওয়ার মানা না থাকলে ছেলে ত ননী-চোরা হয় না। আমরাও এককালে ছেলেমানুষ ছিলাম, মনে পড়ে, বারণ না থাকলে দুষ্টুমীও বোদা লাগতো।

যারা বন্ধুত্বের তাজা রস চাইলেই পায়, কামের পচা ভোগ তাদের রুচবে কেন ? যারা দুশ্চিন্তা-মুক্ত, সারা দিন হিত কাজে রত, সয়তান হোক শনি হোক, তাদিকে বদ-বুদ্ধি দেবার ফাঁকই পায় না।

এ বর্গের শেষ প্রশ্ন এই—স্বাভাবিক বৃত্তি আশ মিটিয়ে খেলাবার সুবিধে পেয়ে, তাদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণ ঘুচে গেলে, তখন কি USSR-এর নর-নারীর মধ্যে বিদেহী প্রেমের চলা ফেরার পথ পরিষ্কার হবে ;—যে প্রেম গাঢ় হয়ে এলে নারায়ণকে শুদ্ধ টেনে আনবে ?

আমাদের বিবেচনায়, অবস্থা সব রকমে স্বাধীন রাখতে পারলে সে প্রেম লাভ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা,—তবে যদি ইতিমধ্যে বাইরের রাজ-শক্তির আক্রমণে অন্তরের শান্তি ভঙ্গ হয়ে বিপ্লবের তৈরী অনুকূল অবস্থাটাই ওলট-পালট হয়ে যায়,—সে কথা আলাদা।

ন হি কল্যাণ-কৃৎ দুর্গতিং গচ্ছতি

মোক্ষের বিষয়ে শাদা ক'রে ভাবতে গেলে প্রথমেই কথা ওঠে—কোথা হ'তে কিসের মধ্যে মুক্তি ?

যে ক্লান্ত-ক্লিষ্ট আত্মা ভবের পালায় ফাঁকি দিয়ে স'রে প'ড়তে ব্যস্ত, সে হয়ত শূন্যের মধ্যেও আরামের না হোক, বিরামের কামনা করতে পারে ; কিন্তু যে আনন্দ-মনে খেলছে সে খেলার এক ধাপ থেকে পরের ধাপে এগোতে এগোতে খেলার শেষে—হারে নয়, জিতে যে শেষ, তাতে —পৌঁছতে চায়।

খেলাটা তাহ'লে কি রকমের ?

আনন্দ-লোকের আলো থেকে ত খেলুড়েরা নেমে এসেছে, ইহ-লোকের অন্ধকারে ত ডুব মেরেছে ; আবার আলোর আনন্দে ফিরে যাওয়াটাই হ'ল খেলার বাকি পালা। এক কথায় বলতে গেলে, আসার সময় ডুবুরীর মতো এক ঝাঁপে তলানো . ফেরার সময় নিয়ম বজায় রেখে, নানা ভয়-বিপত্তি কাটিয়ে, তবে ওঠা। অন্ধকারে তলিয়ে গিয়ে না উঠতে পারাটা ভয়ঙ্কর হার, মনে করলে গা ছম্‌ছম্ করে ; মাঝের আব-ছায়ায় পথ ভুলে ঘুরে বেড়ানো, সে দুর্ভোগও হারেরই সামিল ; সব বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে আনন্দে ফেরার শিহরণটাই জিত।

মানব-লীলার ভূমিকা (ইংরেজীতে যাকে বলা যায় play ground) সেটা কেমন ?

রামধনুর মধ্যে ক'টি রং ? এর উত্তর নানা রকমে দেওয়া যায়। চুল-চেরা বিচারক বলবে অসংখ্য—পাশাপাশি কোনো দুই রং ঠিক এক

নয় ; য়ুরোপের লোকে যে সময় উত্তর দেয়, তখনকার চলতি নাম-মতো সাত রং বলেছিল ; মোটামুটি তিন রকমের রং-ও বলা যায়,—উপরের দিকে নীল-জাতীয়, নীচের দিকে লাল-জাতীয়, মাঝে হারা-হারা। মানবাত্মার খেলাভূমি সম্বন্ধে তেমনি একভাবে দেখলে অসংখ্য লোক বলা যায়,—এই যে ইহলোক, এর মধ্যেই খেলুড়ে কখনো জড়ের টানে অন্ধকারে ঘুরে মরে, কখনো মেঘের একটি রং, গানের একটি স্বর, মনের একটি স্বভাব, তাকে কোন্ উঁচু চূড়োয় তুলে নিয়ে উপরের আলো দেখিয়ে দেয়। শাস্ত্রে বলে সপ্তলোক। মোটামুটি তিনটি নিয়ে আমাদের কথা চলতে পারবে,—উপরে তেজোময় অমৃতময় আনন্দ-লোক, নীচে অন্ধ তমসাবৃত মৃত্যুলোক, মাঝে আলো-ছায়া মেশানো রং-বেরঙে মনোহর বৈচিত্র্য লোক।

আর যে খেলুড়ে, তারি বা চেহারা কি রকমের ?

সে ত ব্যক্তির উর্দ্দি প'রে খেলায় নেমেছে। সে আবরণের ভিতরেও তার সত্তার তিন স্তর—নীচে জড়তার, যার দরুণ সে এক পত্তন তলিয়েছে ; উপরে আনন্দের তেজ, যার টানে সে আবার স্বস্থানে ফিরতে পারে ; মাঝে বুদ্ধি-বৃত্তির খেলা, যা তাকে তোলপাড় ক'রে ঘুরিয়ে বেড়ায়। ডুব দেবার সময় কিন্তু আদি স্থানের সঙ্গে তার যোগ ঠিক থাকা চাই, সেটা ছেড়ে গেলে আর ওঠার উপায় থাকে না, তলিয়ে হার হ'য়ে যায়।

একটা নক্সার সাহায্যে আমাদের কথাটা আর একটু ফোটাবার চেষ্টা করা যাক।

ছেলেদের খেলার বেলুনের মতো খেলুড়েকে কল্পনা করা যাক। সে বেলুনের চামড়া ইলাষ্টিক, যত গ্যাস পোরা যায় তত বাড়ে, বাড়লে হাল্কা হ'য়ে উপরে উঠতে চায়, গ্যাস ক'মে গেলে চুপ্‌সে মাটিতে পড়ে।

বেলুনে শুধু গ্যাস থাকলে ত সে উড়েই যেতো, তৈরীর সময় কিছু বাজে আবর্জনা থেকে যায় বলে সে ধরায় থাকে। গ্যাসের আধারের সঙ্গে আমাদের এ বেলুনের নল দিয়ে যোগ রাখা আছে, গ্যাসের চাপ বাড়লে কানা যেখানে নলের সঙ্গে আঁটা আছে তার ফাঁক দিয়ে গ্যাস উথলে বেরোয়। বেশী আঁটা থাকলে তা হয় না, কিন্তু তাহলে নতুন গ্যাস পোরাও যায় না। খেলুড়ে এ রকম সজীব বেলুনের মতো এইটুকু মনে রাখলেই আমাদের নক্সার কাজ হবে।

এক পক্ষে খেলুড়ে নিজের বুদ্ধিবৃত্তি খেলিয়ে এমন ভাবে বাড়তে পারে যে আনন্দ-লোকের সঙ্গে যে যোগধারা আছে তাতে শোষণের টান পড়ে। অপর পক্ষে আনন্দ-লোকে এমন ঢেউ উঠতে পারে—সৃষ্টির গোড়ায় একবার তরঙ্গ উঠেছিল, আর ওঠে না, এমন ত নয়—যার প্রেরণায় স্রোত খেলুড়ের ভিতর চ'লে আসতে পারে। যে উপায়েই হোক, খেলুড়ের ভিতরে আনন্দ বেড়ে গেলে সে বড় হয়, উপরে ওঠে। সেই সঙ্গে তার পাওয়া আনন্দধারার ভাগ আশে পাশে উথলে পড়ে।

এ অবস্থায় যে যে ঘটনাগুলি ঘটে, একটি একটি ক'রে বুঝে দেখা যাক।

যে মানুষের উপরে ওঠার অবস্থা হয়েছে সে যদি বেলুনের মুখ ক'ষে বাঁধার মতো নিজের অবস্থা করে, আশপাশের খেলুড়ে থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে, তাহলে তার উপরে ওঠার বাধা না হলেও পথের আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত থাকে। মনে পড়ে সেই ইংরেজকে যে পাহাড়ে-চড়ার গাড়িতে ব'সে, জানলার দিকে পিঠ ঘুরিয়ে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে পথের সময়টা কাটিয়ে, উপরে পৌঁছে একেবারে হোটেলানন্দে বিলীন হ'ল।

শুধু বঞ্চিত হওয়া নয়, এতে ভয়ও আছে। পরমার্থকে একা উপভোগের বাসনা স্বার্থের মতোই দিশাহারা ক'রে দিতে পারে। এ অবস্থার একটি তিব্বতী বর্ণনা আছে। সঙ্ঘত্যাগী সাধক অভীষ্ট লোকের সন্ধানে বেরিয়েছে। পূবদিকে জলাশয়ের চিহ্ন দেখে স্নানের ইচ্ছায় সেদিকে চল্লো; পথে উত্তর দিকে ধোঁয়া দেখে গৃহস্থের আতিথ্যের লোভে সেদিকে ফিরলো; মাঝের জঙ্গলে বিভীষিকা দেখে ভয়ে দক্ষিণে দৌড়লো; পথিকের কাছে পশ্চিমদেশের গুণবর্ণনা শুনে অবশেষে পশ্চিমেই যাত্রা করলো,—এই রকম লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তার ভ্রমণ। আমাদের ধারণা এই, আধা-আলোর জায়গায় এসে খেলুড়ে যদি মনে করে কেল্লা মেরে দিয়েছি, তাতে তার আবেগ মিটে গিয়ে তেজও টানতে পারে না, আর উপরে উঠতেও পারে না, পাঁচরঙা লোকে ঘুরে বেড়াতেই থাকে,—যে অবস্থাকে হারের সামিল বলা হয়েছিল।

আনন্দটানার ক্ষমতা থাকায় যে উঠতে পারে, সে যদি আনন্দ বিল'বার কারণে কনিষ্ঠ সাথীদের স্তরে থেকে যায়, তাহলে মাঝপথে আনন্দ আদান প্রদানের একটা উপরি খেলা চলে। এ রকম খেলুড়ের ভাব বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মতো, যিনি বলেছিলেন—"যতক্ষণ না সবাইকে সঙ্গে নিতে পারবো, ততক্ষণ মোক্ষ পাবার অধিকারী হ'লেও আমি তা নেবো না।"

ঘটনাক্রমে এ রকম জ্যেষ্ঠ যাত্রীর উদ্বৃত্ত আনন্দর সঙ্গে কনিষ্ঠের আনন্দ ধারার যদি যোগ হয়ে পড়ে, তাহলে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ দাঁড়ায়। শিক্ষার আসনে অনেকে বসেন, তাঁদের শিষ্যও জুটে থাকে, কিন্তু আনন্দ আদান-প্রদানের সম্বন্ধ না হ'লে গুরুকে সদ্‌গুরু বা শিষ্যকে সংশিষ্য বলা যায় না।

সংশিষ্যের আগ্রহ আনন্দ-ধারায় দেয় টান, তার আনন্দের খোরাক

যোগাতে হয় গুরুকে। ব্যায়ামের গুণে ক্ষিধে বাড়ার মতো, শিষ্যকে আনন্দ যোগাবার এই প্রয়োজনই গুরুর উপর-থেকে আনন্দশোষণের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। আনন্দ দানই আনন্দ পাবার উপায়, আনন্দ পাওয়া আরো আনন্দ দানের উপায়, গুরুর লাভ হয়, এই চক্রবৃদ্ধি আনন্দ ধারা।

শিষ্যের দিক থেকে দেখলে, তার নিজের ক্ষমতায় যেটুকু সম্ভব হতো, গুরুর কাছ থেকে তার চেয়ে প্রবল স্রোতে আনন্দ পাওয়ায়, শিষ্য বেড়ে ওঠে। শেষে ঐ চক্রবৃদ্ধি স্রোতে পুষ্ট হ'তে হ'তে শিষ্য গুরুর সমান পদবী পেয়ে যায়, তখন গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ঘুচে গিয়ে আসে নিছক মিত্রতা, যার মধ্যে প্রেমের সব চেয়ে বিশুদ্ধ ভাব পাওয়া যায়।

গুরু যতক্ষণ উপর-থেকে তেজ টেনে শিষ্যকে যোগাচ্ছেন ততক্ষণ আনন্দলোকের যিনি অধিপতি, আর তাঁরই আনন্দ বিতরণের উপলক্ষ্য যে গুরু, আনন্দ দাতা আর আনন্দ বাহক, এ দুজনের মধ্যে ভেদজ্ঞান শিষ্যের উপস্থিত-মতো লোপ পেতে চায়। আসলেও কোনো ভেদ থাকতো না যদি সোজাসুজি পাওয়ার, আর গুরুর রঙে রঙিয়ে পাওয়ার প্রভেদটা না থেকে যেতো। কলকাতার নলের জলে আর গঙ্গার জলে যেমন তফাৎ থাকতো না, যদি মাঝে ফলতা জল-কলের পাঁচরকম কেরামতি না এসে পড়তো।

সমান পাত্রের মধ্যে আনন্দ-ধারার যোগ-স্থাপন হ'লে দুজনের আনন্দ চালাচালি নানা রকমে হতে পারে,—এক জনের বেশী দেওয়া, একজনের বেশী পাওয়া, চাকার মতো দেওয়া নেওয়ার ঘোরাফেরা; কিন্তু যতই রকমারি হোক, দুজনের মধ্যে প্রেমের আদানপ্রদান সুরু হলে, মূল উৎস থেকে দু'জনেরই তেজ-টানা বেড়ে যায়, দুজনেরই আনন্দ বেশী বেশী উদ্বৃত্ত হয়, ফলে দুজনেই প্রেমের আলোয় দুনিয়া সুন্দর দেখে, প্রেমের

ভাগ জগৎকে বিলোয়। এর বিপরীত অবস্থা হ'লে সন্দেহ হয়, সত্যিকার প্রেম হয়েছে, না কোনো প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি বা মোহের ঝোঁকে দুজনে কাছাকাছি এসেছে মাত্র।

প্রেম বিদেহী হলেও, দেহের নামরূপটা বাদ রাখা চলে না। শিষ্য বেচারী সদানন্দের খোঁজে বেরিয়ে চিদানন্দের কাছে গিয়ে পড়লে, তাঁর সঙ্গে তার বাঞ্ছিত সম্বন্ধ নাও ঘটতে পারে। তাছাড়া কণ্ঠস্বরের, মুখ-চোখের ভাবের, সাহায্য ছাড়া গুরুর মর্ম্ম সব সময়ে হৃদয়ঙ্গম নাও হতে পারে। আসল কথা, বোঝার সুবিধের জন্যে, স্থূল দেহ, সূক্ষ্মশরীর, প্রাণমন চিত্তবুদ্ধি, আত্মার এ সব ভাবকে আলাদা ক'রে দেখি বটে, কিন্তু সবই ত একের ভিন্ন স্তরে প্রকাশ, কোথায় একটার শেষ অন্যটার আরম্ভ ধরাই যায় না। স্থূল দেহের মধ্যে মাদক ঢোকাও, সূক্ষ্ম বুদ্ধি-বৃত্তি যাবে গুলিয়ে। ওদিকে আত্মার উন্নত অবস্থা শরীরের জেল্লায় প্রকাশ পায়। তবু বলতে হয়, প্রেমের খেলা আধ্যাত্মিক স্তরেই চলে।

নর-নারী ভেদে বিদেহী প্রেমের কিছু রস-ভেদ হয় কি না, সেকথা মাঝে মাঝে ওঠে। নর-নারীর দেহ-যন্ত্র নিয়ে অবশ্য একথা উঠতেই পারে না, তবে সূক্ষ্মস্তরেও নর-নারী ভেদ স্বীকার করতে হয়। বীরাঙ্গনাকে বলা যায়, সে দেহে নারী, মনে পুরুষ। মহাপ্রভুর রাধাভাবে আরাধনা মানে তাঁর আধ্যাত্মিক নারীরূপ নেওয়া। খৃষ্টান সাধকেও বলেন— যিশুকে জীবনের নিয়ন্তারূপে পেতে হ'লে আত্মাকে নারীপদবীতে তুলে তবে সমর্পণ করতে হয়। আমরা এইটুকু বুঝি, প্রেমিকের দেহের অবস্থা যাই হোক, যার আনন্দ-স্রোত বহির্মুখী তার পুরুষভাব, যে অন্তরে গ্রহণ করে তার নারীপ্রকৃতি। এই দেওয়া নেওয়ার পৃথক রসকে কি নিগমানন্দ আর আগমানন্দ বল্লে দোষ হয়? যাই হোক, আলাদা নাম চলতি না থাকলেও রস-ভেদটা অনুভবে ধরা পড়ে।

একটি অবস্থার কথা বাকি। দৈবাৎ কখনো অনেকে মিলে পরস্পরের সঙ্গে আনন্দ-ধারার যোগে বেঁধে প'ড়ে একটা প্রেমচক্র তৈরী হয়। একেই আদর্শ সঙ্ঘ বলা যায়। প্রত্যেকের বহির্মুখী ধারা অপরের অন্তরে প্রবেশ করায় এ রকম চক্রের অসীম শক্তি জন্মায়, যার সমবেত টানটা উর্দ্ধমুখী। ফলে, চক্রের প্রত্যেকে পথের আনন্দও যেমন পুরো আদায় করে, তাদের উপরে ওঠাও তেমনি জোরে এগোয়। এ রকম ঘটনা মনে ক'রে দয়াল দাদু বলে থাকবেন—"জলের ফোঁটা একা চল্লে পথে শুখিয়ে যেতে পারে, অন্যের সঙ্গে মিলে ধারা বাঁধতে পারলে নদী হ'য়ে সমুদ্রে পৌঁছে যায়।" সব সাচ্চার মেকী থাকে, সঙ্ঘ বা চক্রেরও তাই। যার গরজ সে অনায়াসে প্রেমের লক্ষণ দেখে আসল চিনে নিতে পারবে।

প্রেমের লক্ষণ দিয়ে যাচাই করলে অনেক হেঁয়ালীর উত্তর পাওয়া যায়, অনেক সমস্যার মীমাংসা হয়। দু'একটা নমুনা দেখা যাক।

এ ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক যে শিষ্য ত অজ্ঞান অবস্থায় গুরু খোঁজে তখন সদ্‌গুরু চিনবে কি ক'রে। প্রেমানন্দই পথ দেখায়। সেটা পেলে কে না বোঝে? তবে ভুল হওয়ারও কারণ আছে। গুরুবাদ সম্বন্ধে লৌকিক অলৌকিক এত রকম গল্প গুজব চলতি আছে, যারা কান-পাৎলা তাদের অবস্থা সেই বুড়ির মতো হতে পারে, যে ছেলের আলিফ-বে-তে ফারসী বর্ণমালা আওড়ানো শুনে ঠাকুর-দেবতার নাম হচ্ছে মনে ক'রে নয়নজলে বয়ান ভাসালো। অবশ্য মোহের নকল আনন্দ টেঁকসই হয় না, তাই শিষ্যের মেজাজ ক্রমশ রুক্ষ হচ্ছে বা নির্বিচারে মানুষকে মানুষ ব'লে ভালবাসতে পারছে না, দেখলে, বোঝা যায় গুরুকরণে গলতি হয়েছে, পরশ-মণির ছোঁয়া পায় নি।

আমাদের ধারণা অনুসারে গুরুর দেওয়া মন্ত্র ক দিয়ে আরম্ভ, কি হ

দিয়ে আরম্ভ, তাতে কিছু আসে যায় না, কোনো মন্ত্র না দিলেও লোকসান নেই, নিজে প্রেম টানতে পারলেই সদ্‌গুরু শিষ্যকে বাঞ্ছিত ধন দিতে পারবেন।

সাধনা ত রকম বেরকমের হ'য়ে থাকে, কিন্তু আনন্দ পাওয়া দেওয়ার যে প্রেমের অবস্থাকে সিদ্ধি বলা যায়, সে কি আর এক বৈ দুই হতে পারে? গীতার কথা ধ'রলে সে সিদ্ধি যেন সাধনার উপর নির্ভরই করে না। যার যেমন ভাবনা তার সে পর্যন্ত সিদ্ধির দৌড়, আমরা ত এভাবে গীতার উপদেশ বুঝেছি। ভাবনা বলতে মাথা বকানোও নয়, কল্পনা খেলানোও নয়; এখানে "ভাবনা" মানে "হওয়া।" যে যত প্রেমিক হতে পেরেছে তার সিদ্ধি-লাভ ততটাই। বিনা প্রেমে গুরুর পক্ষে নন্দলালকে পাইয়ে দেবার চেষ্টা বৃথা। অপর পক্ষে প্রেম থাকলে সৎ-শিষ্য গুরুকে উপলক্ষ ক'রে নিজের আবেগের জোরে নিজের কাজ হাসিল করতে পারে।

শ্রদ্ধায় যে প্রশ্ন তার মনে জন্মায়, উত্তর তার মধ্যেই নিহিত থাকে, গুরু দর্শনের আনন্দে আপনিই প্রকাশ হয়ে পড়ে। এক রসিক বলেছিল —শিষ্য গুরুকে বলে "মন-তোর-দে," গুরু শিষ্যকে বলেন "মন-তোর-নে।" শিষ্য নিজেরই সাধনের ধন গুরুপ্রেমের আলোয় দেখতে পায়।

আর এক সমস্যা হচ্ছে—সব সদুপদেশেই বলে লোকের হিতে রত থাকতে। মুশকিল এই ত নিজেরই হিতাহিত বুঝে ওঠা দায়, পরের হিত ত দূরের কথা। তাড়াতাড়ি হিত করতে গেলে রোগীর যে-দাঁতে ব্যথা নেই সেটা তুলে দেবার মতো বিপরীত না হয়। এখানেও পথ দেখায় প্রেম। যাকে আনন্দ দিতে পারা গেল, তার হিত করা হ'ল সে বিষয়ে কি সন্দেহ থাকতে পারে? এই প্রথম ধাপে পা দিলে দ্বিতীয় ধাপ তখন আপনিই দেখা দেবে। আনন্দ দিলেই ত আনন্দ পাওয়া যায়।

তার মানে কল্যাণ করতে গিয়ে কল্যাণ লাভ হয়। ঊর্দ্ধগতিই কল্যাণের লক্ষণ, তাই এ বর্গের মাথায় গীতার কথা তুলে দেওয়া হয়েছে—কল্যাণ-কারীর দুর্গতি হতে পারে না।

খেলায় জিতের চেহারাটা কি, এখন কতক বেরিয়ে পড়েছে। পরস্পরের সঙ্গে প্রেমের যোগের আনন্দে ভরপুর হ'য়ে, বড় হতে হতে যখন ব্যক্তিত্বের আবরণ স্বচ্ছ সূক্ষ্ম হয়ে যাবে, তার ভিতরকার আবর্জনার জড়তা খ'সে যাবে, তখন আনন্দলোকে উঠে যাবার আর বাধা থাকবে না, সেখানকার আলো ভিতরে বাইরে সমান প্রকাশ পাবে; তখনকার আবরণ সে বিঘ্ন নয়, —"আমার এই স্বস্থান, এতে ফিরে এসে আনন্দের প্রেম-রূপ লাভ করলাম"—এই চৈতন্য সজাগ রাখার জন্যে যেটুকু ব্যবধান নইলে নয়, তাই খেলার শেষ পর্যন্ত থাকবে।

USSR-এর মোক্ষলাভ সম্বন্ধে অবস্থা আমাদের বিচারের বিষয় ছিল। তাঁদের নিজেদের মধ্যে সদ্ভাবের পরিচয় ত পাওয়া গেছে; সঙ্ঘের ঠাটটাও তাঁরা বেশ গ'ড়ে তুলেছেন। তার মধ্যে বিদেহী প্রেমের সুর উঠেছে কি না, সে খবর কে দিতে পারে?

যে সব পাশ্চাত্য পর্যটকেরা রুষে যাতায়াৎ ক'রে ঝুড়িঝুড়ি মন্তব্য ছড়িয়ে বেড়ায়, তারা ত সব ধন-লোভী, প্রেমের লক্ষণ তারা কি জানে? তারাই ত প্রণয়কে নিজের যথাস্থান থেকে তুলে দিয়ে, নভেলে নাটকে সিনেমায় তাকে মানবজীবনের একমাত্র সম্বল ব'লে ঢাক-পেটানোর চোটে পৃথিবীময় নর-নারীর সহজ সুন্দর সম্বন্ধটা মাটি করবার যোগাড় করে এনেছে। বিদেহী প্রেমের খেলা দেখলেও তাদের পক্ষে চেনা সম্ভব হয় না, মনের মধ্যে আভাস পেলেও প্রকাশের ভাষা জোটে না।

এক যদি এ দেশ থেকে প্রেমধন নিয়ে কোনো সাধক রুষে যান, USSR-এর সমবায়ীদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতান, তিনি তাঁদের মুক্তির

রাস্তায় প্রগতির কথা বলতে পারবেন। সেখানে সমাজের যে ভূমিকা গ'ড়ে উঠেছে, তাতে না করে সহকর্মী নারীকে "কামিনী" জ্ঞান, না করে কাঞ্চনে নিজের জন্যে লোভ,—এমন স্থান সাধক-পছন্দ তীর্থ না হবে কেন?

আমাদের কথা ত ফুরলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিপদও ঘনিয়ে এলো। যুগল-মিলন না ঘটিয়ে কথা শেষ করলে নেহাৎই বেদস্তুর হবে, কথককে শ্রোতারা দুয়ো দেবে। অথচ যতবার ধুয়োয় এসে খোঁজ নেওয়া গেছে,—নারায়ণ বলেন লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা না হ'লে তিনি ধরা দেবেন না; লক্ষ্মী বলেন যেখানে নারায়ণের দর্শন নেই সেখানে তিনি স্থির হ'য়ে থাকতে পারেন না।

এখন উপায়?

কবিরা বিপদ গণলে বাণীকে ডাক দেন; আমরাও তবে ভারতীর শরণাপন্ন হই। তিনি আমাদের ভোঁতা বুদ্ধি-বৃত্তিতে ধার দিয়ে, যে সব গাঁঠ প'ড়ে আমাদের সত্তা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, সেগুলো কেটে ফেলে আস্ত মানুষ হয়ে ওঠবার উপায় করে দিন। তিনি ছাড়া আর কে বুঝিয়ে দিতে পারবে যে, নর-নারী-লক্ষ্মী-নারায়ণ সবই

একমেবাদ্বিতীয়ং।

———

পালান্ত পরিচ্ছেদ

কি হবে ?

যে সব পাশ্চাত্য পর্যটক আজকাল রুষের অবস্থা দেখতে যান, তারা USSR-এর অধীনে শ্রমিকবর্গের সুখস্বচ্ছন্দে থাকার চেহারা অস্বীকার করতে পারেন না ; অথচ তাঁরা যাকে সভ্যতা বলেন তার বিধি-নিষেধ রীতি-নীতি সব উলট-পালট ক'রেও যে, মানুষের ভাল চলতে পারে, সে কথা তাদের মন একদম নিতে চায় না ; তাই ভীমরুলের যেমন ন্যাজে হুল, তাঁদের মন্তব্যের শেষে একটা খোঁচা থেকে যায়—"এ ভাল কি টিঁকবে ?"

নগরকীর্ত্তনে মেতে উঠে নাগরিকেরা কোলাকুলি করে, পরে উচ্ছ্বাস জুড়িয়ে গেলে, যে-দলাদলি সেই দলাদলি। এ স্থলেও, সেই পাশ্চাত্য সমালোচকেরা বলেন, বিপ্লবের ঝাঁজ নরম পড়লে, আবার হবে ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই। সেটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়, আশপাশের হিতৈষী (!)রা পথ চেয়ে ব'সে আছেন, সে কথা অবশ্য থাকে উহ্য।

আমরা এ পথেরও কিছু জানি, ওপথেরও কিছু জানি ; তাছাড়া ম'রে আছি ব'লে মরণদশারও লক্ষণ জানি। সে অবস্থায় USSR-এর ভবিষ্যতের বিষয়ে অন্তত আমাদের ধারণাটুকু না বল্লে শ্রোতারা গোলমাল করতে পারে, ভাববে, কথক ফাঁকি দিয়ে উঠে প'ড়লো। তাই এই উপসংহার।

যিশুখৃষ্ট বলেছেন, তলোয়ার যার জীবিকা, তলোয়ারেই তার বিনাশ। USSR সম্বন্ধে এ কথা খাটে কি না সন্দেহ, কারণ রিপুর বশে তাঁরা

ত অস্ত্র ধরেন নি। দেশের প্রজাবৃন্দের উপর অনেক দিনের অমানুষিক অত্যাচার এড়াবার ভাবনা করতে করতে শ্রমিকদের সমবেত সমিতির যে পরিকল্পনা উদয় হয়েছিল, সেটাই হ'ল আসল জিনিষ—তাকে বাস্তব রূপ দিতে শেষে অস্ত্রের সাহায্য লেগেছিল বটে, তা সত্ত্বেও জীবিকার উপায় করা হ'ল তলোয়ার গলানো লাঙ্গল-ফলায়, তাও চালাবার ভার সমবায়তন্ত্রের, যার ধর্মই হ'ল মিলে মিশে কাজ করা। কাজেই, USSR এমন কোনো রক্তবীজ বুনেছেন যার ঝাড় তাঁদেরই কাল হবে, সে কথা বলা যায় না।

ঘরে বাইরের শত্রুর সঙ্গে অহিংসা-রীতি অনুসারে যুদ্ধ-ব্যাপার না চলায়, আমাদের মহাত্মার মতে হিংসার জড় ভিতরে থেকে গিয়ে শেষে মারমূর্ত্তিতে দেখা দেবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু এ যুদ্ধের আগে পর্যন্ত USSR-এর হিংস্র ভাব কিছু ত প্রকাশ পায় নি। ইরান দেশকে রুষ-সম্রাট প্রায় গিলে ফেলেছিল, USSR তাকে ভাল মনে, প্রতিদানের দাবী না ক'রে, মুক্তি দিয়ে স্বায়ত্ত-শাসনের পথে এগিয়ে দিলেন। সম্রাট আমলের খৃষ্টানধর্ম্ম প্রবল থাকতে ইহুদীদের উপর যে অকথ্য নিষ্ঠুরতা করা হ'ত, ধর্ম্ম-বুলি-বিহীন USSR তাঁদের প্রতি কি রকম মমতা দেখিয়ে সেটা মুছে ফেলার চেষ্টা করলেন। শুধু তাই বা কেন? USSR-এর অন্তর্গত কত আলাদা জাত, আলাদা সম্প্রদায়, নির্বিবাদে এক সঙ্গে আছে, নিজের নিজের আচার-ব্যবহার রুচি-কৃষ্টি অনুসারে জীবন চালাবার বাধা পায় ব'লে শোনা যায় না।

এখনকার যুদ্ধের ভাবটা যে ঠিক কি, সেটা যুদ্ধ শেষ হবার অনেক দিন পর ছাড়া জানতেই পারা যাবে না। হালের বাজে খবরের উপর নির্ভর ক'রে আন্দাজী মন্তব্য প্রকাশ করতে যাওয়ায় কোনো লাভ নেই।

অহিংসার সব অন্ধি-সন্ধি ঠিক-মতো বুঝে-ওঠাই দায়। অন্যায়ের প্রতীকার নানা রকমে চেষ্টা করা যায়,—গায়ের জোরে, বাক্যের জোরে, ব্যবহারের জোরে—অনেক সময় সোজাসুজি মারের চেয়ে বাক্যযন্ত্রণার পীড়া বেশী, আরো কষ্ট দেওয়া হয় সম্পর্ক ছেঁটে ফেল্লে। তাই একা মারাকে হিংসা ব'লে ধরা চলে না। আবার ছোট মার দিয়ে বড় মার থেকে রক্ষে করতে পারলে হিংসার হিসেবে সেটা উল্‌টো দিকে চ'লে আসে। তা ছাড়া, মারাটা যেন হিংসা হ'ল, বিনা-প্রতীকারে অসহায়কে মার খেতে দেওয়া, সেটা কি অহিংসা? প্রাণ রাখ্‌তে সদাই প্রাণান্ত—এ সমস্যার জবাবদিহি প্রকৃতির।

প্রকৃতির হাত ছাড়িয়ে উঠে, মানুষের কোনো দল কোনো দেশে নিজেকে উঁচু পদে তুলতে চেষ্টা করছে, সেটা সারা-দুনিয়ার পক্ষে সুখবর। হিংসার ওষুধ যে প্রেম, এ অবিষ্কার ভারতের, কিন্তু ভারতীয় সমাজকে জাতিভেদ মেনে ব্যক্তিগত স্বার্থের অধীনে চলতে দেওয়ায় সে উপলব্ধি সংসারের কাজে আগেও লাগে নি, আজও লাগতে চাচ্ছে না, রয়ে গেল বচনেই, সে কথা পালার মধ্যেই বলা হয়েছে। সে উপলব্ধির উপযুক্ত নির্লোভ কর্ম-ক্ষেত্র USSR গ'ড়ে তুলছেন বলেই তাদের সঙ্গে লেগেছে লোভ-পন্থী রাক্ষসের দল। তাদের বিরুদ্ধে বিশ্বামিত্রের মতো ক্ষত্রিয়-তেজকে লাগিয়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

ক্ষত্রপদ্ধতি হচ্ছে—"হয় ক্ষান্ত দাও, নয় অন্ত হও!" অত্যাচার সহ্য না ক'রে অক্রোধে প্রাণ দেওয়ার উপদেশ অহিংসা-পন্থীদের অনুমোদিত। তেমনি কি ধর্ম্মরক্ষার্থে অক্রোধে প্রাণনাশও চর্চা করা যায় না, অসহায়ের গায়ে যে ছুরি তুলেছে উভয়ের প্রতি দয়া করে তার হাতে লাঠি মেরে নিরস্ত করার মতো?

এ সব শক্ত সমস্যা মীমাংসা ক'রে USSR-এর ঐহিক-পারত্রিক

পরিণাম সম্বন্ধে রায় দেওয়া 'আমাদের সামর্থ্যে কুলোবে না। এখন মরণ দশার, কোনো লক্ষণ দেখা যায় কি, সেটা অনুসন্ধানের বিষয়। সে লক্ষণগুলি কি রকম ?

কুলক্ষণ

সমবায়ীরা নেতাদের সদুপদেশকে জীবন-যাত্রার পাথেয় না ক'রে, যদি তাদের মূর্ত্তি বা ছবি ফুল' বাতি, ধূপ-ধুনো দিয়ে পূজো করতে সুরু ক'রে, তাঁদের মধ্যে কে বড় তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লাগায়—

পরস্পরের প্রতি আন্তরিক দরদ, পরস্পরের উন্নতির জন্যে সত্যিকার আগ্রহ—এই দিয়ে সমবায় খাড়া না রেখে, অবস্থার পরিবর্তন অনুসারে পদ্ধতির বদল না ক'রে, যদি কোনো একজনের বা এক সময়ের তৈরী নিয়ম-কানুনকে যায়-প্রাণ থাকে-প্রাণ অটুট রাখাই সার ধর্ম ব'লে মানতে আরম্ভ ক'রে, জপে-মোচড়ানো মনের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার পথ রুখে দেয়—

"যা করেছি খুব করেছি আর দরকার নেই!" এই ব'লে যদি সন্তোষ শান্তি দুই রিপু-ভাইদুটির পাল্লায় প'ড়ে উপর থেকে প্রেরণা আসার রাস্তা খোলসা না রাখে; কিম্বা "আমরা যা দেখিয়েছি, পৃথিবীর আর কেও তা পারে নি, পারবে না" এই দম্ভের মোহ আল্‌সে মেরে গিয়ে নতুন বিদ্যে লাভের, নতুন উদ্ভাবনের চেষ্টায় খতম দিয়ে ব'সে থাকে—

এ রকম কুলক্ষণের কোনো একটি প্রকাশ পেলে USSR-এর বাড় ফুরিয়েছে সে নাবী-মুখে এসে পড়েছে, বুঝতে হবে। প্রকৃতির ঠেলা-ঠেলির মধ্যে উপরে উঠতে না থাকলে, নীচে প'ড়ে যেতে হয়, নিশ্চিন্ত হ'য়ে মাঝামাঝি বিরাম লাভের উপায় নেই।

তবে USSR-এর যদি পতন আরম্ভ হ'য়েই থাকে, সেটা বোঝার জন্যে মহা অনুসন্ধানে মাতার কোনো দরকার নেই,—তাতে আমাদের লাভটা কি? আমরা ত আহ্লাদ ক'রে USSR-এর অভ্যুদয়ের কথা বলতে বসেছিলাম, শুনতে তোমাদিকে ডেকেছিলাম,—তাঁদের ভাল দেখে কিছু শিখবো ব'লে, তা নেহাৎ না পারলেও তাঁদের সুগতি দেখে আনন্দ ক'রবো ব'লে। মরণ দশা দেখার জন্যে সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হওয়া লাগবে কেন, দুয়োরের গোড়ায় হিন্দু-জাতের গঙ্গাযাত্রা ত রোজই চলেছে!

ভয় নেই!

তবে শোনো, নাতিনাতনীরা, যারা এতদূর পর্যন্ত ধৈর্য ধরে এ বইটা প'ড়েছ—এখন পালার কথা শেষ হয়েছে, এইবার দাদা-গিরি ফলিয়ে তোমাদের উপর কিছু উপদেশ ঝেড়ে বিদায় করতে চাই। তোমরা যদি মুখ চাওয়াচাওয়ী-করে নিজেদের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করো—"আচ্ছা বুড়োর পাল্লায় পড়েছি, দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মতো থামতে পারে না!" তাহলে মনে করিয়ে দেব তোমাদেরও ছোটোবেলার প্রশ্নের স্রোত অফুরন্ত ছিল, তার ঠেলা ত বুড়োকেই সামলাতে হয়েছে; তাই এখন শোনবার ডাক পড়লে ফোঁস করা চলবে না। তাছাড়া শেষে একটু মুরুব্বিয়ানার ঢং না করলে মা-বাপে তোমাদিকে আমার কাছে আর আসতেই দেবেন না। হাজার হোক, তাঁরা সেকেলে লোক, মনে করেন ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে বকুনি না খেলে ব'কে যাবার ভয় থাকে।

তাই যা বলি, শুনে যাও।

আমাদের দেশের, আমাদের জাতের, গতিক বড় ভাল নয়, পালা ভণতে ভণতে এ ভাবের কথা মাঝে মাঝে বলতে হয়েছে ; সত্যি কথায় কখনো ইষ্ট বৈ অনিষ্ট হয় না তাই বলেছি ; তাতে তোমাদের মন খারাপ হবার কিছু নেই। দেশের, জাতের, সমাজের উত্থান পতন লেগেই আছে, পতনের সময় বিষণ্ণ হলে আবার উত্থানের দেরী হওয়া ছাড়া, লাভ কিছু নেই। সে কথা তোমরা প্রত্যেকে মনে রেখো। প্রত্যেক "তুমি" যা করবে তাই জড়িয়ে "তোমাদের" করা হবে।

তোমার অভিধান থেকে "অসাধ্য" আর "নৈরাশ্য" এই দুটো কথা কেটে দিও। সমস্যা আসে মেটাবার জন্যে ; সঙ্কট আসে পার হবার জন্যে ; দুঃখ আসে শক্তি জাগাবার জন্যে। রাত যত ঘনিয়ে আসে উষা তত এগিয়ে আসে, সে কথা ভুলো না।

অন্তর্যামী ভর্ৎসনাকে যদি ভয় ক'রে চলো, তাহলে জগতে আর কিছুর ভয় থাকবে না,—মৃত্যুরও না ; বিশেষত যদি "আমার" জায়গায় সর্বদা "আমাদের" ভাবনা করা অভ্যেস কর। আমি মরলে আমরা সকলে ত মরবো না। তোমার জীবন-মৃত্যু যদি এমন হয় যে, তাতে তোমাদের সকলের আরো ভালভাবে বাঁচার সুযোগ হবে, তাহলে সেই "সকলের" মধ্যে তুমি অমর হ'য়ে থাকবে।

পূর্ব-জন্মের কর্মফল নিয়ে বৃথা মাথা বকিও না। সে বিষয়ে ঠিক জানারও উপায় নেই, তা নিয়ে তোমার করারও কিছু নেই। প্রতি মুহূর্তেই তোমার নব-জন্ম, সে মুহূর্তে তুমি স্বর্গে থাকবে কি নরকে থাকবে, সেটা তোমার হাতে। পরকাল নিয়েই বা ভাবনা কেন ? ইহকালটা ফুরোলে তবে না পরকাল ? যে কালে আছ, সেই বর্তমান কালটা ভাল ক'রে কাটাতে পারলে, ভাবীকাল আপনিই সামলে যাবে।

ভাল ক'রে কাল কাটানো কাকে বলে? পদে পদে "তোমার" এবং "তোমাদের" আনন্দ-বাড়াবার ব্যবস্থা করা,—অন্য লোকে কবে কি করেছে তাই প'ড়েশুনে নকল ক'রে বাসী ভাবে নয়; নিজের বুদ্ধি-বৃত্তি টাট্‌কা খাটিয়ে,—বুদ্ধি দিয়ে ভেবে, হৃদয় দিয়ে অনুভব ক'রে, কাজে আগ্রহ ক'রে। নিজের সত্তার এমন টলটলে অবস্থা ক'রে তোলো যে যেমন মনে বোঝা, ওমনি বুকে দরদ, তৎক্ষণাৎ চেষ্টায় হাত।

টাট্‌কা কাজ করাই সৃষ্টি করা! শরীর-মন যদি পরিষ্কার রাখো, চিত্ত যদি শুদ্ধ রাখো, তাহলে সেগুলি তোমার নিজের তৈরী জিনিষ হয়ে উঠবে। আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক যা আছে তা আছে, নিজের স্বভাব দিয়ে যেটিকে আরো মিষ্টি ক'রে তুলতে পারবে সেটি তোমার হাতে-গড়া সম্বন্ধ হবে। যেখানে সম্পর্ক থাকার কোনো লৌকিক কারণ নেই, সেখানে সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে সম্বন্ধ পাতিয়ে বসা যায়। কাজে ব্যবহারে কথায় কথায় নিত্যি নতুন সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়। নিজের মন-হৃদয়ের রস দিয়ে জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াকে উৎসব, প্রত্যেক উৎসবকে আনন্দময় ক'রে তোলা যায়। একবার সৃষ্টি করবো ব'লে ব'সলে দেখবে এমন ঘটনা নেই যাকে নিজের ছোঁয়া দিয়ে আপনার না ক'রে নেওয়া যায়। এই সৃষ্টি কাজেই মানুষ মানুষের উপযুক্ত আনন্দ পেতে পারে। এ সৃষ্টি রোজই করা যায়, এবেলা ওবেলা করা যায়, উঠতে বসতে করা যায়; এর জন্যে আলাদা সময় তুলে রাখার আবশ্যক করে না,—প্রতি মুহূর্তেই করা যায়। যে মুহূর্তকে আনন্দময় ক'রে তুলতে পারবে, তাতেই অনন্তের আস্বাদ পাবে।

জিজ্ঞেস করতে পার, যে প্রেমের প্রেরণা সৃষ্টি করায় সে প্রেম পাওয়া যাবে কেমন ক'রে? যিশু বলেছেন ঘা দিলে দরজা খুলে যায়। পতঞ্জলী বলেছেন যত আবেগে চাবে তত বেগে পাবে। তার সোজা

মানে, চাওয়া আর পাওয়া একই কথা। প্রেমের আলো সকলের মধ্যে কিছু না কিছু আছে,—পথ দেখাবার ভারটা সেই আলোর উপর দিলেই মিটে যায়। যে টুকু আলো আছে প্রথম পা বাড়াবার পক্ষে তাই যথেষ্ট; কোনো দলকে যদি বিরোধী মনে করো, তার একজনকে ভালবাসতে পারলে দলের সঙ্গে বিরোধ ভঞ্জন হবে ও এক পা এগোলে পরের পা ফেলার জায়গা তখন দেখা দেবে। মিলে-মিশে চল্লে আলো বাড়ে, তাতে চলা যায় তাড়াতাড়ি। কিন্তু যে রকম করেই চলা হোক, চলার চেয়ে এগোবার সহজ কৌশল কেও বাৎলাতে এলে, তাকে সন্দেহের চোখে দেখো!

যতদিনে তোমরা তোমাদের নাতি-নাতনীদের সঙ্গে খোস-গল্প করতে ব'সবে, তার মধ্যে আমাদের দেশে আশার উষা দেখা দেবার সময় এসে যাবে। অরুণোদয়ের লালে-লাল শোভা সামনে দেখলে তারি কথা নিশ্চয়ই তোমরা বলাবলি করবে। তখন আলোচনার বিষয় হাজার হাজার মাইল দূর থেকে টেনেবুনে আনতে হবে না।

সেই ভরসায় উৎফুল্ল হ'য়ে বুড়ো মানুষের কাঁপা-গলায় আমি জিজ্ঞেস করি—"আমরা কি দ'মে আছি?"

তোমরা সিংহনাদে গর্জাও—না! না!! না!!!

টিপ্পনী

ঋণ-স্বীকার

পালা সাজাবার জন্যে পাঁচ জায়গা থেকে নানা রসের কথা কুড়িয়ে এনে ধ'রে দেওয়া গেছে। যেখানে সবই পরের কাছে পাওয়া— সেখানে বিশেষ ক'রে কার ঋণ স্বীকার করা যায়? যে শ্রোতার যা ভাল লেগে যায়, সে যাতে ইচ্ছে-মতো মূলে গিয়ে তৃপ্তি পেতে পারে, তার উপায় রাখলেই হ'ল।

USSR-এর সমীকরণ যজ্ঞকে উপলক্ষ্য ক'রে, ভব-লীলার আকার প্রকার বোঝা ছিল আমাদের আসল উদ্দেশ্য, যাতে সমজদার হ'য়ে পরের ভাল খেলা তারিফ করতে পারি, খেলায় পটু হ'য়ে নিজেরাও আনন্দ দিতে নিতে অপারক না হই।

খেলার দুটো দিক আছে। এক হ'ল নিয়ম-কানুন,—যা মেনে অন্তত বাঁচিয়ে না চল্লে খেলা দাঁড়ায় হুটোপাটিতে, আমোদ লাগার চেয়ে চোট্ লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকে বেশী। আর হ'ল ভাব, যার লক্ষণ হচ্ছে পরস্পরের সুবিধে-অসুবিধে বুঝে চলা, নিজের ভাল চালে পরের ভাল চালে সমান খুসী হওয়া, মনে রাখা যে সকলে মিল্লে তবেই হয় খেলা, নিজে বাহাদুরী নেবার মোহে না পড়া,—যে ভাবকে ইংরেজীতে বলে sportsmanlike।

ভবলীলারও সে রকম দুইদিক আছে। একপক্ষে খেলুড়েকে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলতে হয়; তবে জীবের মধ্যে মানুষ সৃষ্টি করার ক্ষমতা পেয়েছে ব'লে সে নিয়মকে কতক এড়িয়ে কতক ব'দলে চ'লতে পারে। আর খেলুড়েকে ভাবও ঠিক রাখতে হয়, সাথীদের সঙ্গেও বটে,

খেলানে-ওয়ালার সঙ্গে ত বটেই, নইলে তাঁর সঙ্গে যোগ ছুটে গিয়ে, তলিয়ে বা পথ ভুলে, খেলাটা হারে না শেষ হয়।

প্রথম দিক থেকে বিচার করার সময় প্রত্যক্ষ-দর্শীদের কথা নিয়ে আমরা "আথর" দিয়েছিলাম। পাশ্চাত্য ভাষায় বিজ্ঞানের বা ভ্রমণের বইয়ের অভাব নেই, সেগুলি দরকার-মতো প'ড়তে পাওয়াও শক্ত নয়, তাই বিশেষ স্থল ছাড়া আলাদা ক'রে কোনো বইলেখকের নাম করা হয় নি।

ভাবের কথা আশ মিটিয়ে পেতে হ'লে যেতে হয় বেদ-উপনিষদে, যার মধ্যে আমাদের চির-নমস্য ঋষিদের বাণী ধরা আছে। সেখান থেকেও আমরা দরকার-মতো চুনে নিতে ছাড়িনি, কিন্তু ফী হাতে গ্রন্থের নাম শ্লোকের নম্বর দিলে বিশেষ সুবিধে হ'ত না। এক ত, ঋষিদের বচন পড়া আজকালকার ফেশান নয়, তা ছাড়া বই আনিয়ে খুঁজে পেতে বার করলেও দেখা যাবে, ভাষ্যকারেরা যে-কালের উপযোগী ব্যাখ্যা ক'রে গেছেন, সেকাল থেকে এ কালটা এত তফাং হ'য়ে পড়েছে যে, নিজের নিজের টিপ্পনী না কাটলে মানেটা কানেই থেকে যায়, ভিতরে পৌছয় না।

তাই আমাদের ভাব ঋষিকথায় শ্রোতার মনে পৌছে দিতে হ'লে, নিজের বোঝা মানেটা প্রকাশ ক'রে বলতে হয়। দুএকটা নমুনা দিলেই যথেষ্ট হবে, তাতে যদি শ্রোতার ঋষিবচনের মধ্যে স্বাধীন ভাবে বেড়াবার সখ হয়, সে ত খুব ভাল কথা।

খেলার ভাব

ঋগ্বেদে যে বিষ্ণুমন্ত্র আছে, যা আমাদের সব ক্রিয়ার আরম্ভে আওড়ানো হয়, অনেক সময় মানের দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে, তাতে ভবের খেলার পদে পদে যে ভাব ব'দলে চ'লতে হয়, তার ইসারা পাওয়া যায়। মন্ত্রটি এই—

তদ্‌ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুঃ আততং।

কথার পিঠে কথা দিয়ে শাদা বাংলায় এর মানে দাঁড়ায় এই রকম—

সূরিরা সেই বিষ্ণুর পরম পদ সদাই দেখেন,
চোখ দিয়ে আলোয় মেলা জিনিষের মতো।

চোখের সামনে আলোয় ধ'রে দেওয়া জিনিষের মতো—উপমা ত বেশ পরিষ্কার। কিন্তু সেই বিষ্ণুর পরম পদ কাকে বলে?

ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে বোঝা যায়, সেই বিষ্ণু হচ্ছেন যিনি ঈশা হ'য়ে লোকের মধ্যে যতলোক সব ছেয়ে আছেন। তিনি সৃষ্টির সব স্তরেই বিরাজ করেন, এক এক স্তরে বা লোকে তাঁর এক এক রকমের পদ দেখা যায়, আনন্দ-লোকে তাঁর চরম প্রকাশ। আনন্দ দেওয়া নেওয়াই ত প্রেম, সেই প্রেমের আবেগে নীচের লোক থেকে উপরের লোকে যেমন ওঠা যায়, তাঁর নিম্নপদ উচ্চপদ হ'য়ে দেখা দেয়, অবশেষে পূর্ণ-প্রেমে তাঁর পরম পদের দর্শন লাভ হয়।

ফুল কেজো লোকের হিসেবে ফলের সূচনা, সৌখীনের পক্ষে ঘর-বাগানের সাজ, ভাবুকের চিত্তে তার মহিমা অপার। মুনীব যাকে বলে চাকর, বিজ্ঞানীর সংজ্ঞায় সে নর, প্রেমিকের সে আপনার। ছেলেতে মা দেখেন স্নেহের পুতুল, জন-সেবক দেখেন দেশের আশা, সূরি দেখেন

বিশ্বরূপ। যশোদা-মার প্রেমের আলো যেবার স্নেহের টান ছাড়িয়ে উঠেছিল, তিনিও তাই দেখেছিলেন।

স্থরিদের বলে জ্ঞানী ; তার মানে প্রেমের আলোয় যা দেখা যায়, তাই সত্যি সত্যি জানা যায়। ধ্যানে জানতে হলেও সেই আলো চাই। গায়ত্রী মন্ত্রে বলে সেই সবিতার বরেণ্য তেজ ধ্যান করতে। কোন্ সবিতা? যিনি আনন্দ লোকের অধিপতি। তাঁর তেজ বা প্রকাশকে বরেণ্য ব'লে সেই স্থরি বোঝেন, যাঁকে প্রেম দিয়ে বরণ করা হয়েছে। নীচের আকিঞ্চন আর উপরের প্রেরণা, দ্বি-ধর্মী বৈদ্যুতের মতো পরস্পরের অপেক্ষা করে, পরস্পরকে টানে ; শেষে প্রেমের ঝিলিকে উভয়ের মিলনানন্দের উচ্ছ্বাস। এ মিলন দৈব স্থপ্রসন্ন হ'লে ঘটে, বলাও যা, আর ঘটনাটা রহস্যময় স্বীকার করাও তাই।

যাই হোক, আমরা এইটুকু বুঝেছি, ভবলীলার আরম্ভে, মাঝে, শেষে, সর্বত্র সেই প্রেম। হৃদয়ে প্রীতি নিয়ে আসা হয়, প্রীতি করতে থাকলে প্রেম বেড়ে চলে, প্রেম পূর্ণ হ'লে পাওয়া যায় নন্দলালকে।

খেলার উৎপত্তি

ঈশোপনিষদের এক শ্লোকে উৎপত্তির কথা আমরা যে ভাবে পেয়েছি তাই দেখাই—

স পর্য্যগাৎ—শুক্রং অকায়ং অব্রণং অস্নাবিরং শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং— কবিঃ মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ যাতাতথ্যতঃ অর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

এর মানে আমাদের কাছে এই ভাবে আসে—

তিনি বেরিয়ে এলেন,—সেই নিরাকার নির্বিকার অবস্থা ছেড়ে—এবং যিনি আপনাতে আপনি ভরপুর (স্বয়ম্ভূ) ছিলেন তিনি লোক সকলের অধ্যক্ষ (পরিভূ) হয়ে, কবি-মনীষী-ভাবে (শাশ্বতীর) চিরকালের ও (সমার) কালের পর কালের পক্ষে উপযোগী ব্যবস্থা করলেন।

সর্বব্যাপী রইলেন সর্বব্যাপী, তবে সৃষ্টির কারণে একাকার অবস্থা স্তরে স্তরে লোকে লোকে ভাগ হয়ে গেল, তাতে তিনিও বহু খণ্ডিত হ'য়ে আলো থেকে অন্ধকারে, সূক্ষ্ম হ'তে স্থূলে, পরিযানে (adventure-এ) বেরলেন, ভ্রমণে নয়, রমণ করতে। বেরিয়ে পড়া ত সহজ; পুনর্মিলনে ফেরার, নিজের মহিমায় পুনঃ প্রবেশের পথই বাধা-বিঘ্নে বন্ধুর, পদে পদে সৃষ্টি-ছাড়া মৃত্যু-লোকে পড়ার ভয়ে বিপদ-সঙ্কুল। তাই উপযুক্ত ব্যবস্থা আবশ্যক। কবি-মনীষী ভাবে যে ব্যবস্থা করা হ'য়েছে তার মর্ম বোঝা যায় না, বুদ্ধি (intellect) ও বৃত্তি (emotion)দু'য়ের সমঞ্জস (harmonious) উৎকর্ষ (culture) না হ'লে। ইংরেজী কথাগুলো দিয়ে দেখানো গেল যে ঋষিবাক্য একেলে-ভাবে আলোচনা করার অসুবিধে কিছু নেই।

ভয় ভাবনা, আশা ভরসা

উপনিষদে মাঝে মাঝে যে প্রার্থনা আছে তার দুএকটা দেখলে, আমরা যে-ভাবে মানে করেছি তার সায় পাওয়া যাবে।

অসতো মা সদ্গময়—
তমসো মা জ্যোতিঃগময়, মৃত্যোঃ মা অমৃতংগময়।
অসৎ থেকে সতে নিয়ে চল—
অন্ধকার হ'তে আলোয়, মৃত্যু হতে অমৃতে নিয়ে এস।

সৃষ্টির মধ্যে অসৎ ব'লে কী থাকতে পারে? যা কিছু আছে তাই ত সৎ। অসৎ বলতে হ'লে, সৃষ্টির নিরাকার নিরঞ্জন পূর্ব্বাবস্থা, যার সম্বন্ধে কোনো বাক্যই যখন খাটে না, তখন সৎও বলা যায় না, তাকেই অসৎ বলতে হয়। ওঁ তৎসৎ ব'লে নিজেকে এইটুকু মনে করিয়ে দিতে হয়, আমরা যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সদানন্দ জীবন চালাচ্ছি এটা সেই বাক্য-মন অতীতেরই প্রকাশ। তবে কি না, "এটা নয়" "ওটা নয়" করা ছাড়া যার বর্ণনাই চলে না, সে অসৎ-অবস্থা রমণীয় নয়, তাই খেলার সাধ মেটানোর জন্যে সৃষ্টির প্রার্থনা এই ভাবে উঠলো—

আমাদিকে সেই **neutral** অবস্থা থেকে **positive** সত্তার মধ্যে নিয়ে চলো,—তাতে দেহ ধ'রে মোদনীয়কে নিয়ে খেলা করবো, যে বিপদ আসতে পারে তার রোমা যত পাবো, ভয়-তরার উল্লাস জানবো, শেষে স্থাবর আনন্দের বদলে জঙ্গম প্রেমের শিহরণ লাভ হবে।

প্রার্থনাটা কিন্তু ভয়ে ভয়ে করা,—মোহ-বশে আলোর সঙ্গে যোগ ছুটে যেতে দিলে ত অনন্দালোকে প'ড়ে আত্মহত্যা করা হবে,—তাই পিঠ পিঠ আবদার—

নীচের অন্ধকার থেকে পথ দেখিয়ে আবার আলোয়, মৃত্যু-লোক হ'তে বাঁচিয়ে আবার অমৃতময় লোকে ফিরিয়ে এনো।

এ কথাটাই অন্যঅন্য জায়গায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা আছে—

অবিঃ আবীঃ ম এধি।

তুমিই ত আলো, তোমার সেই আলো আমাদিকে দেখালেই ফিরে যাবার পথ ঠিক পাবো।

রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

মৃত্যু-লোকের রুদ্র-মূর্ত্তি খেলাচ্ছলে চকিতে দেখে নেওয়ার পর, আর সারা রাস্তা তোমার সেই উজ্জ্বল-প্রকাশ দেখিয়ে পথে রেখো।

সত্যাগ্রহ-সঙ্কল্প

শ্রুতিবাক্য শোনানো হ'লে সকলে মিলে শান্তি-পাঠ করা প্রথা। কিন্তু আমরা যে ভাবে বুঝেছি বুঝিয়েছি তাতে সে প্রথা মানা চলে না। এই সবের আগেকার নিষ্ক্রিয় অবস্থা শান্তিময়ই ছিল। তাতে মন উঠলো না বলেই ত খেলতে বেরনো। খেলার শেষে হয়ত আবার শান্তি আসবে, যদি ভূমানন্দের সে নাম দেওয়া অন্যায় না হয়। কিন্তু মাঝ-পথে শান্তি চাওয়া মানে ত বিপদ ডেকে আনা, ঝিম'তে ঝিম'তে আবছায়া লোকে ঘুরে মরা, হারেরই মতো stalemate-এ খেলা শেষ করা।

স্থিত-প্রজ্ঞ না হ'লে ভাল খেলোয়াড় হয় না, তা খুব মানি। যে স্থিত-প্রজ্ঞ সে ভবের ছবি, লীলার নিয়ম, মনে এমনি বসিয়ে নিয়েছে যে, তাকে পথ খোঁজার জন্যে আঁকুবাকু করতে হয় না। উপরের আলোকে সে কখনো চোখের আড়াল হ'তে দেয় না, এগিয়ে না চল্লে পিছ'তে হবে তা সে কখনো ভোলে না। কিন্তু সে চঞ্চল নয় ব'লে মোটেই শান্ত নয়। সে জানে আবেগ শান্ত হলেই সব মাটি, কাজেই শান্তির প্রার্থনা করে না, সে চায় আবেগ, তীব্র আবেগ, যাতে যত শীঘ্র সম্ভব জিতে উঠে যেতে পারে।

অতএব এসো, আমরাও আগ্রহ কামনা করি, আগ্রহের চর্চা করি, সত্যাগ্রহে খেলায় মাতি, তাহলে স্বয়ং লীলাময়, যাঁর নাম সত্য, তিনি নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন—জিত হবেই হবে।

সত্যমেব জয়তে !

— ——